KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication: ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection: KLMLGK	Publisher: সৌরীন্দ্র নাথ দত্ত
Title: অনিমেষের চিঠি	Size: 4.5" x 6.5" 11.43 x 16.51 c.m.
Vol. & Number: ১২/৯-১২ ১৩/১-৫	Year of Publication: বৈশাখ - আশ্বিন, ১৩৪৭ কার্তিক, ১৩৪৭ - চৈত্র, ১৩৪৭
	Condition: Brittle ✓ Good
Editor: সত্যকিরণ দত্ত	Remarks:

CD Roll No. KLMLGK

নিবারের চিঠি।

সজনীকান্ত দাস

১৩৪৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

দ্বিতীয় দৃশ্য—সাধনা

প্রতীক্ষা

একে একে সবে বিদায় দিলেন গুরু,
ভক্তিমতীরে মন্ত্র দিবেন আজি—
মন্ত্রের স্থলে মন্ত্রণা হ'ল সুরু,
আশায় শিহরে বক্ষের রোমরাজি।

* * *

তৃতীয় দৃশ্য—সিদ্ধি

দক্ষিণা

ভক্ত দরশ মাগি ত্রিযামা যামিনী জাগি
হিয়া গাঢ় অনুরাগী, তবু হায় হায় রে—
কপাটে রাখিয়া কর প্রভু করে বার ঘর
নয় দশ পর পর রাত বেজে যায় রে !

অধীর বুকের মাঝে কাহার মুরলী বাজে
কোন্ কুঞ্জে রাধা সাজে, পথপানে চায় রে—
সহে না সহে না ত্বরা, ঘুমায় নিখিল ধরা,
শ্রীমতী কি দিবে ধরা এসে পায় পায় রে !

* * *

ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
লাগে বাঘের পিছনে ফেউ,
আর নদীর পাগল ঢেউ
(কেন) সাগরে আত্মহারা ?
জল দক্ষিণ মুখে ছুটে,
গুরু- দক্ষিণা তাই জুটে—
দই নেপো খায় চেটে পুটে
(ওরা) ভাঁড় ব'য়ে ব'য়ে সারা !
ওরে তোরা কি গো বুঝিবি না,
গাছ বাঁচে না শিকড় বিনা,
তার টানিলেই বাজে বীণা—
(এসব) শুনে নে গুরুর কাছে,
বৃথা সংসারে জাল বোনা,
হেথা গুরুই নিখাদ সোনা—
তাঁর কৃপাতেই দেখা-শোনা
(ভিজা) বিড়ালে এবং মাছে ।

নবতম কথামালার এক অধ্যায়

একদা একজন পথিক কলিকাতা মহানগরীর পথের ফুটপাথ দিয়া চলিতেছিল। ফুটপাথ নূতন প্রস্তরে নির্ম্মিত, মসৃণ ও ধূলিবিহীন। ফুটপাথের উপরে একটি সুপক্ক কদলীর খোসা পড়িয়া ছিল। পথিক অন্যমনস্ক-ভাবে আসিতে আসিতে সহসা সেই খোসার উপর পা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছলাইয়া চারি গজ পরিমাণ দূরে পতিত হইল।

পথিকের অল্পবিস্তর আঘাত লাগিয়াছিল। সে উত্থিত হইয়া ঘূর্ণায়মান নেত্রে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পথ জনশূন্য, সুতরাং তাহার ধরণীতলে হাস্যকরভাবে পতন দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। পথিক খুশি হইয়া পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিল। কদলীর খোসা পথেই পড়িয়া রহিল।

প্রায় অর্দ্ধদণ্ড পরে অপর এক ব্যক্তি সেই পথে চলিতে চলিতে পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকের ন্যায়ই আছাড় খাইল। উত্থান করতঃ সে বলিল, "কোন্ শা—?" কিন্তু পথে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নির্ব্বিবাদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

দণ্ডকাল অতীত হইল। পুনরায় এক পথিক সেই পথে আসিল এবং অপর দুইজনের মতই সশব্দে ধরণীশয্যা গ্রহণ করিল।

কিন্তু অপর দুইজনের মত সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল না; পরন্তু সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "অহো, এই দুরন্ত কদলীফলের খোসায় আমার পরেও কত ব্যক্তিই না আছাড় খাইবে! অতএব ইহাকে নিরাপদ স্থানে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। অপরন্তু আমার এই পরোপকারের ফলে ভবিষ্যতের জন্য খানিকটা পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকিবে, ইহাও কম লাভ নয়।" ইত্যাকার বিবেচনা করিয়া পথিক খোসাটি হস্তে গ্রহণ করিয়া নিকটস্থ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতঃ পুনরায় স্বস্থানে গমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

একটি স্তম্ভের অন্তরালে এক মলিনবাসপরিহিত তৈলসংস্পর্শবিহীনকেশযুক্ত বিরসবদন এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল। এইবার সে গাত্রোত্থান করিয়া পথিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনার পরোপকার-প্রবৃত্তি অতি প্রবল। এই কদলীর খোসায় আপনার পূর্ব্বেও দুই মহোদয় ভূপতিত হইয়া আহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই উহার অপসারণ প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। দেখা যাইতেছে, আপনি সাধারণ অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তিতে মহৎ। অতএব মহাশয়, আমার বিশ্বাস আমি আপনার নিকট দুইটি তাম্রমুদ্রা যাচ্ঞা করিলে আপনি অবশ্যই দিবেন।"

পথিক ক্ষণকাল সেই ব্যক্তির বদনমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ বক্র করিয়া হাসিল। তৎপরে ভূতলে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

মনঃসমীক্ষণ

দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি

(খ) ভুল

যে সমস্ত ভুল কাজ প্রধানত ভুলিয়া যাওয়ার উপর নির্ভর করে না, আমাদের প্রবন্ধে শুধু সেইগুলিকেই আমরা ভুল (mistakes, errors) বলিব। যদিও বিস্মরণ এই ধরনের ভুলের জন্য মূলত দায়ী নহে, তাহা হইলেও ইহার সহিত বিস্মরণের যে কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। কারণ-বিশ্লেষণ করিলে উভয়ের মূলেই একই মানসিক ক্রিয়া, যাহাকে আমরা অবদমন বলিয়াছি, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বিস্মৃতির ন্যায় 'ভুল'ও নানা প্রকারের হইতে পারে। আমরা কয়েক জাতীয় ভুলের দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। **কথার ভুল**—'এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা'—এই ভুলটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত বেশিরকম ঘটিয়া থাকে যে, সাধারণত আমরা সেগুলিকে লক্ষ্যই করি না, এবং লক্ষ্য করিলেও ঐ ভুলের মধ্যে যে কোনরূপ অস্বাভাবিকতা আছে বা উহার কোনও অর্থ আছে, ইহা আমাদের আদৌ মনে হয় না। কিন্তু কোন্ অবস্থায় এবং কিরূপ ক্ষেত্রে এই ভুল সংঘটিত হয়, মনোযোগ সহকারে বুঝিবার চেষ্টা করিলেই অর্থাৎ ভুলগুলি বিশ্লেষণ করিলেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই ভুলেরও বাস্তবিক অর্থ আছে। এই বিশ্লেষণ-কার্য্য যে সর্ব্বদাই একটি দুরূহ ব্যাপার, তাহা নহে। সাধারণত অল্প চেষ্টা করিলেই আপনাদের নিজেদের বা বন্ধুবান্ধবদিগের কথার ভুলের নিহিত অর্থ আপনারা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন।

অষ্ট্রিয়ার পার্লামেণ্টের সভাপতি মহাশয় একবার কিরূপ ভুল করিয়াছিলেন, ফ্রয়েড তাঁহার পুস্তকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভার কার্য্য উদ্বোধন করিবার সময় সভাপতি বলিলেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, প্রয়োজনীয় সভ্যসংখ্যা উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব এইবার সভার কার্য্য বন্ধ করা যাউক।" সেই অধিবেশনে কয়েকটি বিরোধিতামূলক প্রস্তাবের আলোচনা হইবার কথা ছিল। সভ্যদের মধ্যে যে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হইবে, সভাপতি মহাশয় তাহার আশঙ্কা করিতেছিলেন এবং তাহার সম্মুখীন হইতে তাঁহার মন চাহিতেছিল না। এই অনিচ্ছাই তাঁহার 'আরম্ভে'র পরিবর্ত্তে 'বন্ধ' বলার জন্য দায়ী। আমি সেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়ি হইতে আর একজনের সহিত টেলিফোন-যোগে কোন সাংসারিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তিনি ঐ বিষয়ে আরও আলোচনার সুবিধার জন্য আমার বাড়ির টেলিফোনের নম্বর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার নম্বর জানাইয়া আমি তাঁহাকে সোমবার সন্ধ্যাবেলায় কথাবার্ত্তা কহিতে বলিয়াছিলাম। সোমবার দিন কিন্তু ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এবং তিনিও আমায় টেলিফোনে ডাকেন নাই। তাহার পরদিন তিনি সকালবেলা আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন, "কি হে, তোমায় টেলিফোনে কতবার ডাকলাম, প্রত্যেক বারই বললে যে, তোমার নামে কোনও ভদ্রলোক এ বাড়িতে থাকেন না।" আমি কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম, ফোনে কত নম্বর চেয়েছিলেন?" তিনি বলিলেন, "তুমি যা বলেছিলে, আমি তখনই তা লিখে নিয়েছিলাম,—Regent 196 তো? এই দেখ, লেখা রয়েছে।" আমি তখন বলিলাম, "তাই নাকি? Regent 196 তো আমার নম্বর নয়, আমার এক বন্ধুর নম্বর, আমার নম্বর হচ্ছে Regent 675, আমি তা হ'লে ভুল করেছিলাম।" ভদ্রলোক চলিয়া

যাইবার পর আমি এক নম্বর বলিতে আর এক নম্বর কেন বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। গভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হইল না, অল্প চেষ্টাতেই নিজের মনের সহিত যে চাতুরি করিতেছিলাম, তাহা ধরা পড়িয়া গেল। ভদ্রলোকটি যে প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহাতে আমার আদৌ মত ছিল না, অথচ ঘটনাচক্রের এমন সমাবেশ হইয়াছিল যে, সে বিষয়ে সামনাসামনি অমত করিবার উপায় ছিল না। এই অনিচ্ছাই যে ভদ্রলোককে ভুল নম্বর বলিবার ও সোমবার দিন ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবার কারণ, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন। আরও একটু কথা আছে। আমার নম্বর না বলিয়া বন্ধুর ফোন-নম্বর কেন বলিলাম, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম। আমি জানিতাম, যে বন্ধুটির টেলিফোন-নম্বর তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, সেই বন্ধুটি যদি ঘুণাক্ষরেও এই প্রস্তাবের কথা জানিতে পারিত, তাহা হইলে সেই প্রস্তাবটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। কোনক্রমে বন্ধুটির কানে এই প্রস্তাবটি উঠুক, এইরূপ বাসনা আমার নির্জ্ঞানে ছিল। কারণ অপ্রীতিকর অবস্থাটি হইতে বাঁচিতে হইলে আমার উপস্থিত ঐ একটিমাত্র উপায় ছিল।

২। **পড়ার ভুল**—এক কথা বলিতে আর এক কথা বলা যেমন ভুল, এক পড়িতে আর এক পড়াও একই জাতীয় ভুল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সেদিন সন্ধ্যার সময় ঈজি-চেয়ারে শুইয়া আছি। পাশের বাড়ির মাস্টারের কণ্ঠস্বর, আর ছোট ছেলেটি কখনও দ্রুত, কখনও বা শ্লথ গতিতে পড়িতেছে, শুনিতে পাইতেছিলাম। ছেলেটি সুর করিয়া পড়িতেছে, "য়েঁ, কদাচ-অ, কুবাক্য-অ, বলিও-ও না-আ-আ। য়েঁ, খেলিবার সময় খেলিবে, পড়িবার সময় খেলিবে……।" সঙ্গে সঙ্গে শুনিলাম, মাস্টার মহাশয়ের চীৎকার, চপেটাঘাতের শব্দ আর

ছেলেটির ক্রন্দনধ্বনি। ছেলেটির পড়িবার অনিচ্ছাই যে এইরূপ ভুলের কারণ, তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলে। গৌরহরি এক রবিবারে আসিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, "ওহে, কাল একটা মস্তবড় আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলাম, কিন্তু ভাই দুর্ভাগ্য এমন, ধোপে টিকল না, ফসকে গেল।" তাহার কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ক্ষেত্র ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, ব্যাপার কি?" সে বলিল, "আর বল কেন, মহারাজ সেদিন রামকৃষ্ণের একখানা বই হাতে দিয়ে বললেন, 'গৌরহরি, তোমার মনটা বড় চঞ্চল দেখছি, সুবিধামত এই বইটা প'ড়।' বিশেষ পেড়াপীড়িতে রাজি হয়ে বইটা নিলাম। একদিন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় পড়লাম, লেখা রয়েছে—'মানবের নিয়মানুযায়ী ঈশ্বরের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।' আমি প্রথমে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। কারণ রামকৃষ্ণের মত একজন লোক, যাঁকে নিয়ে তোমরা সকলে এত মাতামাতি কর, যুগাবতার ব'লে পূজো কর, তিনিও যে আমার মত ভগবানের চেয়ে মানুষকে বড় করেছেন, তাই জেনে ভারী আনন্দ হ'ল। তখনই মনে করলাম যে, এবার আড্ডায় এসে তোমাদের খুব একচোট শুনিয়ে যাব। বইটা ভাল ক'রে পড়বার দিকে তখন একটু চেষ্টা হ'ল। হায় রে, এই চেষ্টাই হ'ল কাল, মনঃসংযোগ ক'রে পড়তে গিয়ে দেখি, একটা মস্ত ভুল করেছি। 'ঈশ্বরের' জায়গায় 'মানব' আর মানবের জায়গায় 'ঈশ্বর' পড়েছি। তখনই আবার অন্য কথা মনে হ'ল। সেদিন আড্ডায় ঐ যে ঐ মনোবিদ বলছিল, ভুলের সঙ্গে কি ইচ্ছা না অনিচ্ছার যোগাযোগ আছে, কথাটা বোধ হয় ঠিক।"

৩। **লেখার ভুল**—লেখার ভুলও আমাদের প্রায়শই হইয়া থাকে। ছাপার ভুল অবশ্য আমরা ছাপাখানার ভূতের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু আমাদের সাধারণ চিঠিপত্র প্রভৃতি লেখার মধ্যে যে কত ভুল

হইয়া যায়, তাহার খবর আমরা বিশেষ রাখি না। লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, চিঠিপত্রে—বিশেষ করিয়া নূতন বৎসরের প্রথম দিকে যে সকল চিঠিপত্র লেখা হয়, তাহাতে—অনেক সময় বিগত সনটিই উল্লিখিত হয়। এই ভুলের জন্য কি কেবলমাত্র অভ্যাসই দায়ী? অনেক ক্ষেত্রে তাহা হইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে 'একটি বৎসর কাটিয়া গেল' ইহা মানিয়া লইবার অনিচ্ছাই এই ভুলের মূলে থাকে। 'একটি বৎসর কাটিয়া গেল' ইহার অর্থ, বার্দ্ধক্যের দিকে আরও কিছু অগ্রসর হইলাম। বার্দ্ধক্যের এই গতি কল্পনা করিতে মনে একটু দ্বিধার সঞ্চার হয় না কি? কিন্তু আপনারা হয়তো বলিবেন, সকলেই তো আর (লেখকের মত) প্রৌঢ় নন, বসিয়া বসিয়া শেষ জীবনের কথা ভাবিতেছেন না। যখন একজন অল্পবয়স্ক বালক বা কোন স্বাস্থ্যবান যুবক তারিখের এইরূপ ভুল করে, তাহাদের বেলাতে নিশ্চয় এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন হইবে না। ঠিক এই ব্যাখ্যাটি যে তাহাদের পক্ষে সমীচীন নয়, ইহা অবশ্য আমি স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু বালক বা যুবকদের এই ভুল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এই বৎসর কাটিয়া গিয়া নূতন বৎসর আসুক, কোন কারণবশত ইহা তাহাদের আদৌ অভিপ্রেত নহে। যে সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই, তাহারা অনেক সময় ভুল করিয়া তারিখ পিছাইয়া দেয়। এই মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহারা পরীক্ষার তারিখ পিছাইয়া দিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার চেষ্টা করে।

জোন্‌সকে নববিবাহিতা একটি ভদ্রমহিলা একদিন বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি তাঁহার এক পুরানো পুরুষ-বন্ধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়াছেন, যাহার শেষ লাইনে এইরূপ অদ্ভুত কথা লেখা ছিল—"আশা করি, তুমি শারীরিক কুশল এবং মানসিক অশান্তিতে আছ।"

সেই বন্ধুটি এক সময় ভদ্রমহিলাটিকে বিবাহ করিবার আশা করিতেন। ভদ্রমহিলাটি যে আর একজনকে বিবাহ করিয়া শান্তিতে থাকিবেন, এই চিন্তা বন্ধুটির পক্ষে বিরক্তিকর, এবং এই বিরক্তি 'শান্তি'র পরিবর্ত্তে 'অশান্তি' কথাটি লিখিবার জন্য দায়ী।

৪। **ছাপার ভুল**—মুদ্রাযন্ত্র বা টাইপরাইটিং কল হইতে ছাপা লেখায় যে ভুল থাকে, তাহা যে সব সময়ে নিরর্থক—এ কথা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া চলে না। ছাপাখানার ভূত যে অনেক সময় মুদ্রণকার্য্যে ব্যাপৃত লোকদের মনের নির্জ্ঞান স্তরেই বাস করে, ইহার কিছু কিছু আভাস অনেক সময় পাওয়া গেলেও তাহা প্রমাণ করা সব সময় কার্য্যত সম্ভব নহে। 'ললনা'র পরিবর্ত্তে 'ছলনা', 'শান্তি'র জায়গায় 'শান্তি', 'Freud'-এর স্থলে 'Fraud' প্রভৃতি ভুল ছাপাগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইলে, কোন নিহিত বাসনার সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়াই মনে হয়। মনে পড়ে, ছাত্রাবস্থায় আমার দাদামহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার অফিসের এক কেরানিবাবু, 'dearth of officers'-এর পরিবর্ত্তে 'death of officers' টাইপ করিয়া সাহেবের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। গল্পটি শুনিয়া তখন অবশ্য খুব আমোদ অনুভব করিয়াছিলাম ও হাসিয়াছিলাম, এখন কিন্তু ঐ ভুলের মধ্য দিয়া বেচারী কেরানিবাবুর যে অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটি প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার জন্য মনে কিঞ্চিৎ সমবেদনা জাগে।

৫। **দেখার ভুল**—আমাদের বন্ধু প্রতীক্ষাকুমারের চাকুরির একটি ইতিহাস আছে। বর্ত্তমান চাকুরি পাইবার আগে সে অনেক জায়গায় দরখাস্ত করিয়াছিল। একবার সে একখানি চিঠি পাইয়াছিল। খুলিয়া দেখিল, গিলাণ্ডার্স অফিস হইতে আসিয়াছে, তাহার চাকুরি হইয়াছে। কত বেতন, কোন্ তারিখে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে,

তাহাতে সব লেখা ছিল। নির্দ্ধারিত দিনে সে অফিসে গিয়া বড় সাহেবের কামরায় সেলাম ঠুকিল। সাহেব তাহাকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, চাকুরির চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে, আজ তাহার কার্য্য আরম্ভ করিবার দিন। সাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন, "চাকরি তো আর খালি নেই, একটি খালি হয়েছিল, তা দিন পাঁচ ছয় হ'ল ভর্ত্তি হয়ে গেছে।" সাহেবের চিঠিখানা হাতে দিয়া প্রতীক্ষা বলিল, "আপনি তো সার্ আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, চিঠিতে লেখা ছিল ১৭ই মার্চ ১০॥টার সময় আসতে, আমি তাই এসেছি।" সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চিঠিখানি খুলিলেন, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না বাবু, আপনার ভুল হয়েছে, আপনাকে আসতে বলেছিলাম ১১ই মার্চ্চ ১০॥টার সময়, এই তো স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে।" প্রতীক্ষা দেখিল, সত্যই তাহার ভুল, চাকুরি তাহার হইল না। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, কেমন করিয়া তাহার এ ভুল হইল। পরে সবই জানা গেল। চাকুরিটির বেতন ছিল মাসিক তিরিশ টাকা, সে গ্র্যাজুয়েট, এ চাকুরিটি গ্রহণ করিতে মনে মনে তাহার প্রবল অনিচ্ছাই ছিল। এই অনিচ্ছাই তাহার ভুলের কারণ। দেখার ভুল যে কেবল ছাপার অক্ষর সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, অন্য বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধেও হইতে পারে।

আমার দাদা সেদিন ছুটির সময় কর্ম্মস্থল হইতে শেয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া নামিবামাত্র একজন ভদ্রলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কেমন আছ, কোথা থেকে আসা হ'ল?" কিন্তু তিনি দাদার মুখের ভাব দেখিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দাদা তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না, তখন বলিলেন, "তা এখন চিনতে পারবে কেন, এখন তুমি বড়লোক হয়েছ। ইত্যাদি ইত্যাদি।" দাদা বলিলেন, "হ্যাঁ,

বাস্তবিকই আমি আপনাকে চিনতে পারছি না, আপনি আমায় কোথায় দেখেছিলেন বলুন তো?" ভদ্রলোকটি বিস্তারিত বিবরণ দিলে দাদা বলিলেন, "আপনার ভুল হয়েছে, আপনি যাঁকে মনে করেছেন, আমি সে লোক নই।" ভদ্রলোক তখন হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, ঐ লোকটিকে অনেকদিন দেখি নি কিনা!" অপরিচিতকে পরিচিত ভাবিয়া সম্ভাষণ করা বা পরিচিতকে অপরিচিত মনে করিয়া বিনা সম্ভাষণে চলিয়া যাওয়া, সব সময় দৃষ্টিশক্তির গোলমালের উপর নির্ভর করে না। পরিচিত লোককে চিনিতে না পারার মূলে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে না চিনিবার ইচ্ছাই বর্ত্তমান থাকে, ইহা অনুভব করিতে পারা, জোন্‌স সত্যই বলিয়াছেন, নারীজাতির একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা।

৬। **শোনার ভুল**—যখন উৎকণ্ঠিতভাবে বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করি, তখন শব্দমাত্রকেই বন্ধুর জুতার আওয়াজ বলিয়া মনে হয়। এ অভিজ্ঞতা খুবই সাধারণ। বর্দ্ধমান জেলার যে লোকটি আমার বাড়িতে চাকুরি করে, তামাক খাইবার প্রবণতা তাহার কিছু অধিক মাত্রায় আছে। আড্ডার জন্য যত হিসাব করিয়া তামাক আনাই না কেন, দুই দিন অন্তর মাথা চুলকাইয়া সে বলিবেই, "বাবু, তামাক ফুরিয়ে গেছে।" মনে মনে ব্যাপারটি বুঝি, বকুনিও দিই, কিন্তু অনেক দিনের পুরানো চাকর, বিশেষ কিছু আর বলি না। সেদিন বাড়িতে জনকতক অতিথি সমাগমের কথা ছিল। চাকরটিকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলাম, "আজ সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন, তাঁদের ভাল ক'রে অভ্যর্থনা করতে হবে, বাইরে কোথাও যাস নি, এখানেই থাকবি, বুঝলি? আর হ্যাঁ, শোন, কিছু ফুল এনে রাখিস তো।" অতিথিগণ চলিয়া যাইবার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ রে, ফুল কি হ'ল? আনিস

নি বুঝি?" সে সপ্রতিভভাবে উত্তর করিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছিলাম তো, ঐ গুল দিয়েই তো তামাক সাজলাম।" আমি বলিলাম, "তোকে গুল আনতে বলেছিল কে?" 'ফুল' শুনিতে 'গুল' সে কেন শুনিয়াছিল, আশা করি, আপনারাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, তাহার এই ভুল শোনার দরুন অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই বলিয়া চাকরটিকে কিছু আর বলিলাম না, বরং মনে মনে একটু আমোদই উপভোগ করিলাম।

৭। **কাজের ভুল**—যেমন কথা-সংক্রান্ত নানা রকম ভুল আমাদের হয়, সেই রকম কাজ করিতে গিয়াও নানারূপ ভুল আমরা করিয়া থাকি। এক কাজ করিতে গিয়া আর এক কাজ করিয়া বসা, জিনিস এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় রাখা, মুদ্রাদোষ, নানাবিধ আপাত-অর্থহীন অভ্যাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর ভুল। পূর্ব্ব-আলোচিত ভুলগুলি ব্যাখ্যা করিবার সময় যে উপায় এবং সূত্রের সাহায্য লইয়াছিলাম, এই সকল ভুলগুলিও যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনুরূপ উপায় এবং সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এই সকল ভুলের সহিতও অবদমিত ইচ্ছার যোগাযোগ আছে। সুরেন সেদিন বলিল, "আজ কি ভুলই একটা করেছি। অফিস থেকে ঠিক চারটের সময় পার্কসার্কাসে গিয়ে অমুকের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। আমি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে শ্যামবাজারের ট্রাম থেকে নেমে, পার্কসার্কাসের ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ট্রাম আর আসে না, কি করি, খবরের কাগজের একখানা special issue কিনলাম। এমন সময় ট্রাম এসে গেল। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করলাম। কিছুক্ষণ বাদে বাস-কণ্ডাক্টারের চীৎকার কানে আসিল, 'শেয়ালদা-যানেওয়ালা উতার যাইয়ে।' চমকে উঠে

কাগজ থেকে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে দেখি, শেয়ালদায় এসে পড়েছি। ঘড়িতে দেখি, চারটে বাজতে ঠিক পাঁচ মিনিট বাকি আছে। ট্রাম থেকে তো নেমে পড়লাম। হিসেব ক'রে দেখলাম, চারটের মধ্যে কোনক্রমেই পার্কসার্কাস পৌছতে পারা যায় না।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করলে?" সে বলিল, "কি আর করব, সটান বাড়ি চ'লে গেলাম, কালকে যা হয় একটা explanation দেওয়া যাবে।" কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল যে, পার্কসার্কাসে সেই লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুরেনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

কোন ঠাকুরবাড়ির বা মন্দিরের নিকট দিয়া যখন ট্রাম যায়, তখন লক্ষ্য করিলে আরোহীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার আচরণ দেখিতে পাইবেন। দেখিবেন, কেহ বা হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন, কাহারও মুখ তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল, কেহ নাক ঘাড় বা মাথাটি চুলকাইয়া লইলেন, কেহ বা অল্প উসখুস করিয়া নড়িয়া বসিলেন, এবং কাহারও বা কোন ভাবান্তরই হইল না। ঠিক মন্দিরের নিকটে আসিয়াই নিয়মিতভাবে নাক কিংবা ঘাড় বা মাথাটি চুলকাইয়া উঠে কেন, বা নড়িয়া চড়িয়া উসখুস করিয়া বসিবার প্রয়োজন হয় কেন, বলিতে পারেন? আমি যদি বলি, ঠাকুর নমস্কারের আন্তরিক ইচ্ছা এবং আশপাশের লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে না করে এই ইচ্ছা, এই দুইটি মনোভাব প্রকাশের দ্বন্দ্বের ফলেই এইরূপ আচরণের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটি কি নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে?

মুদ্রাদোষ কাহাকে বলে, আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কৌতুকপ্রদ সামান্য অঙ্গভঙ্গি (যেমন নাসিকাকুঞ্চন, চোখ-পিটপিট করা ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া জটিলতাপূর্ণ কষ্টকর কার্য্য-সমষ্টি পর্য্যন্ত, মুদ্রাদোষ নানা প্রকারের হইতে পারে। অনেক মুদ্রাদোষের মূলেই

পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই ইচ্ছাগুলি নির্জ্ঞানের গভীর স্তরে থাকে বলিয়া সহজে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি আমাদের আপাত-অনিচ্ছানুসারে করিয়া থাকি, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি এবং তাহাদের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। মনঃসমীক্ষকদের মতে এই ভুলগুলি নিরর্থক নহে। যে কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছি বা যে কথা বলিতে যাইতেছি, সেই কথা বলিবার বা সেই কার্য্য করিবার গোপন অনিচ্ছার বা ঐ সংক্রান্ত কোন অবরুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ এই ধরনের ভুলের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে। ভুলগুলি যে অর্থহীন নহে, এ কথা মানিতে আপনারা হয়তো বিশেষ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যে ভাবে ভুলগুলি ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি, তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লইতে, আমার মনে হয়, আপনারা অনেকেই কুণ্ঠিত হইবেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রথম—সাধারণত যত প্রকারে ভুলগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা যায়, আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাহাদের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়াছি। দ্বিতীয়—কোন একটি তথ্যের সত্যতা কি করিয়া প্রমাণ করা যায়? যদি বহু স্থানে বহু গবেষক অনুসন্ধানের ফলে একই তথ্যে উপনীত হন, তাহা হইলে সেই তথ্যটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ সত্য, ইহা প্রমাণ হয় না কি? এ দিক দিয়া বিচার করিলে মনঃসমীক্ষকদের ব্যাখ্যা-প্রণালী যে উপযুক্ত, ও তথ্য যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ হয় না। কারণ বহু অনুসন্ধিৎসু—সকলেই যে মনঃসমীক্ষক, তাহা নহে—এই তথ্যের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনারা নিজেরাও যদি এখন হইতে নিজেদের অথবা বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের যে সমস্ত ভুলভ্রান্তি

আপনাদের নজরে পড়িবে, সেগুলির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, অবশেষে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবেন। তৃতীয়ত—যদি ভুলভ্রান্তি ব্যতীত মানসিক অন্যান্য ব্যাপার আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা এই সমস্ত তথ্যেরই সন্ধান পাই, তাহা হইলে তথ্যের মূল্য স্বতই বৃদ্ধি পাইবে না কি? স্বপ্নবালী, নানাবিধ মনের রোগ, শিল্পকলার সৃষ্টি প্রভৃতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অধ্যয়ন করিলে আমরা পুনরায় এই সূত্রসমূহেরই সন্ধান পাই। সুতরাং এই সূত্রগুলি মানিয়া লইবার পক্ষে যুক্তি প্রবলতর হয়। চতুর্থত—যদি অন্য সমস্ত তথ্য অপেক্ষা কোন একটি বিশেষ তথ্য কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ দ্বারা মনের নানাবিধ ঘটনার বিষয় বুঝিবার পক্ষে অধিকতর সাহায্য করে, তবে সে বিশেষ তথ্যটি না মানিবার তো কোন কারণই থাকে না। সর্ব্বশেষে এ কথা বলা যায়, ফ্রয়েড-প্রণোদিত এই ধরনের ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে সকলেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, এবং আপনারাও করিয়া থাকেন। নিমন্ত্রিতদিগের তালিকা হইতে ভুলক্রমে আপনার নাম বাদ পড়িয়াছে শুনিলে আপনি ক্ষুণ্ণ হইয়াই থাকেন এবং বাদ পড়ার মূলে একটু অবহেলার (তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিলাম না) অস্তিত্বের অনুমান স্বতই করিয়া লন। আরও একটি কথা এইখানে বলিয়া রাখি। আপনি নিজে যখন অন্যের তালিকা হইতে বাদ পড়েন, তখন এই ব্যাখ্যা আপনার নিকট খুবই সমীচীন বোধ হইবে, কিন্তু যদি আপনি অন্য কাহাকেও বাদ দেন, তখন হয়তো আবার সন্দেহের সৃষ্টি হইবে, আপনি ব্যাখ্যা মানিতে চাহিবেন না। ইহার একমাত্র উপায়, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার আন্তরিক চেষ্টা করা। এই চেষ্টার ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বাদ দিবার কারণ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাইবেন। "আত্মানং বিদ্ধি"—"Know thyself", ইহাই তো হইল সকল জ্ঞানের ভিত্তি। এই 'আপনাকে

জানিবার' একটি উপায় মাত্র ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন। "If thou art true to thyself thou can'st not be false to any man"—এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু শুধু সংজ্ঞান মনের স্তরে আবদ্ধ থাকিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যায় না। নিজেদের ভুলের পশ্চাতে যে একটি ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে, ইহা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহি। নিজের ভুলের অর্থ যেমন নিজের কাছে চাপা দিয়া রাখি, পরের ভুলকেও সেই রকম নিরর্থক বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি। এইজন্যই ভুলভ্রান্তিগুলি যে নিরর্থক, সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভুল সম্বন্ধে মনঃসমীক্ষকদিগের ব্যাখ্যা মানিয়া লইলে, মনের স্বভাব, আমাদের সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল প্রশ্নের উদয় হয়। পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই সকল সমস্যার আলোচনা করিব।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

MEIN KAMPF

এখনও অনেক বাকি, দীর্ঘ পথ হয় নাই শেষ,
বোমারু বিমানে চড়ি দিনমান চলেছি যদিও—
ছুঁড়েছি ধাতুর ঢেলা, ছারখার হ'ল বহু দেশ,
Mein Kampf-এর ভাষা ঠেকে হেথা শূন্য বায়বীয়।
নামিল শীতল-সন্ধ্যা একাকার জল আর মাটি,
তফাৎ বুঝি না কিছু গীর্জ্জা আর জুয়ার আড্ডায়;
অগ্নি-উদ্গারণ করি আমাদের বোমা যায় ফাটি,
ক্ষণিকের খেলা সে যে, স্থনিবিড় তিমির ঘনায়।
অন্ধকারে লুপ্ত সব, স্বদেশ এবং ফুহ্রেয়ার—
দানব-যন্ত্রের ধ্বনি ঢাকা কানে গর্জ্জে অবিশ্রাম,
এখনও চলিতে হবে ফুরায় নি তেলের সম্ভার;
মনে জাগে ক্ষণে ক্ষণে এ সংগ্রাম কাহার সংগ্রাম!
আর যারই হোক, আমি শূন্য পথে ছুটিয়াছি একা,
এখনও কি আছে বাকি *My Struggle*-এর শেষ দেখা?

মহাভারত-পরিক্রমা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চলিয়াছি পূর্ব্বমুখে, মরুপথে খর রৌদ্রতাপে
জ্বলিতেছে দগ্ধ মাটি, বাতাস তাহারি স্পর্শে কাঁপে।
অনুচ্চ কণ্টকগুল্মে মৃগযূথ ছায়া খুঁজি ফিরে।
কত মরু গিরিবন একে একে প্রসাদ-সমীরে
পার হয়ে আসিলাম মালবের পথে পথ চিনি।
শীর্ণা শিপ্রা হয়ে পার, পার হয়ে দীনা উজ্জয়িনী
আজিকার চলিলাম ধীরে ধীরে দক্ষিণের পথে।
রাজরাজেন্দ্রাণী ছিল একদিন যে তব জগতে,
কেমনে দেখিব চোখে আজি তার ভিখারিণী-বেশ ?
তাই আঁখি মুদে ছিনু, ঘুচে যায় পাছে স্বপ্নলেশ।
মালবের গ্রামবৃদ্ধ রূপবতী-উপাখ্যানকথা
আজো বলে ঘরে ঘরে ; শত চক্ষে অশ্রু ঝরে তথা
গোয়ালিয়রের দুর্গে লক্ষ্মীবাই-সমাধি-মন্দিরে।
সেথায় দু ফোঁটা অশ্রু অর্ঘ্যরূপে রেখে যাব ধীরে,
যেথায় ঘুমায়ে আছে পতিহারা রাজ্যহারা রাণী ;
স্বদেশের মুক্তি মাগি, অত্যাচারে খর খড়্গ হানি
যোদ্ধবেশে টলাল যে অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিরাজে।
ইন্দোরে করুণাময়ী অহল্যার স্মৃতিসৌধ রাজে,—
মহীয়সী যে নারীর পুণ্যকীর্ত্তি আছে মূর্ত্তি ধরি
পান্থাবাসে, রাজপথে, দেবগৃহে এ ভারত ভরি।

ক্ষুধিত আতুর দীন যারে স্মরি ফেলে দীর্ঘশ্বাস
আজো এ দুর্ভাগা দেশে, হেরিব তাঁহার পুণ্যাবাস।
মালবের মালভূমে কমলার কুঞ্জ হয়ে পার,
পার হয়ে বিন্ধ্যারণ্য, কলস্বনা তন্বী নর্ম্মদার
জলধারা হয়ে পার,—লঙ্ঘি সাতপুর-শৈলরাজি,—
নিবিড় অরণ্যে যেথা নির্ঝর-কল্লোল উঠে বাজি
উত্তরিব মহারাষ্ট্রে। গিরিসানু ঘিরে যথা মেঘে,
সমতলে শ্যামক্ষেত্রে তুষার-শুভ্রতা উঠে জেগে
কার্পাসের অজস্র ফসলে। কূপ হতে তুলে বারি,
করে সুকঠিন শ্রম অকুণ্ঠিতা জনপদ-নারী
সেথা পুরুষের সাথে ; গুণ্ঠনবিহীনা দলে দলে
পথে ফিরে নাগরিকা পুষ্পমালা সাজায়ে কুন্তলে
লাবণ্যললামভূতা মূর্ত্তিমতী যেন পবিত্রতা।
উপলব্যথিত গতি তাপহরা তাপ্তীতীরে তথা
অতীতের দস্যুদল হাস্যমুখে রত কৃষিকাজে।
ইন্দ্রিয়াদ্রি-পাদমূলে অজন্তার গুহাগর্ভে রাজে
সেথায় ভাস্কর্য্যে চিত্রে রূপসৃষ্টি অনির্ব্বচনীয়া।
যেথায় অমর শিল্পী বন্দী করি দিয়েছে আনিয়া
তোমার সৌন্দর্য্যস্বপ্ন হে কবি, আমার দিবালোকে,—
সেথায় সে শিল্পতীর্থে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ চোখে
ফিরিতে চাবে না মন, ইহারো দক্ষিণে তবু মোরে
যেতে হবে আর কিছু দূর, দেখিবারে আঁখি ভ'রে
মানুষের মহত্ত্বের মৃত্যুহীন রূপ-নিদর্শন
এলোরা গুহায়। সেথা গিরিগর্ভ করিয়া তক্ষণ

ভাস্কর রচিয়া গেছে মর্ত্ত্যলোকে নূতন কৈলাস—
নূতন অমরাবতী। মূর্ত্তি ধরি করে সেথা বাস
দলে দলে দেবদেবী। কোনখানে বসে ইন্দ্রসভা ;
তাণ্ডবে নাচেন রুদ্র ; কোনখানে মুনি-মনোলোভা
অপ্সরারা নর্ম্মরতা ; হেথা গঙ্গা মকর-আসনা,
হোথায় যমুনা রাজে কূর্ম্মপৃষ্ঠে। কোথা সিংহাসনা
দনুজদলনী দুর্গা, গজপৃষ্ঠে কোথাও ইন্দ্রাণী।
কোথাও রাবণ টানে আঁকড়িয়া মেলি বিংশ পাণি
শিবের কৈলাস ; সেথা সঘন-কম্পিত শৃঙ্গ 'পরে
চকিতা শঙ্কিতা উমা মহেশ্বরে জড়াইয়া ধরে।
কোনখানে শিষ্যসনে নির্ব্বাণের আলোচনারত
পদ্মাসনে সমাসীন ভগবান বুদ্ধ তথাগত।
দেখিতে দেখিতে ছবি, কবি, যদি আপনা বিস্মরি,
স্মরণ করায়ে দিও মেঘমন্দ্রে। এও পরিহরি
আমারে ফিরিতে হবে। পার হয়ে গিরিদরিবন,
ছাড়িয়া খান্দেশ, হেরি নাগপুরে ক্ষেত্র অগণন
কমলার পুষ্পে ভরা ; রামগিরি ছাড়িয়া উত্তরে—
ক্রীড়ামত্ত গজপ্রায় মেঘ যেথা আজো খেলা করে
সানুদেশে, কলস্বনা উচ্ছলা রেবার ধারা বাহি
প্রবেশিব মহারণ্যে। দিগ্বিদিক সেথা ভেদ নাহি,
নাই মানুষের চিহ্ন। শ্যামল-অরণ্য-সুনিবিড়
বিন্ধ্যের সহস্র শীর্ষ আকাশে তুলেছে সেথা শির
দিক হতে দিগন্তরে স্তরে স্তরে। সেথা বনতলে
দিবালোকে ঘনায় তিমির। শম্বরেরা দলে দলে

নদীতীরে জল খেতে নামে। শার্দ্দূল শিকার ধরে
অতর্কিতে লম্ফ দিয়া। বনপথে নির্ভয় অন্তরে
ভল্লুকদম্পতী ফিরে। গিরিশীর্ষে অমরকণ্টকে—
নর্ম্মদার জন্মগেহে মেঘ পানে চাহি অপলকে
সেথা শত শত শিখী নাচিবে বিচিত্র বর্হ মেলি।
শ্বাপদগর্জ্জনক্ষুব্ধ মহাটবী ক্রমে পিছে ফেলি
পশিব দশার্ণদেশে ; ভ্রূবিলাস-অনভিজ্ঞা নারী
বসনে বাঁধিয়া বক্ষ, কক্ষে ল'য়ে ঘটপূর্ণ বারি
দাঁড়াইবে ঊর্দ্ধমুখে শিশুর সারল্য ভরি চোখে।
কোল-ওঁরাওয়ের রাজ্য ছাড়ি ক্রমে প্রদোষ-আলোকে,
মগধের মহাতীর্থে প্রণমিয়া বিষ্ণুর মন্দিরে,
অশোকের দেবগৃহে নমি বুদ্ধে ভক্তিনত শিরে,
রাজগৃহে স্নান করি ব্রহ্মকুণ্ডে—উষ্ণধারা-জলে,
হেরি সৌম্য গৃধ্রকূট, পথপার্শ্বে হেরি দলে দলে
অপরূপ দেবমূর্ত্তি নালন্দার ধ্বংস-অবশেষে,—
নমিয়া পরেশনাথে তীর্থঙ্কর জিনের উদ্দেশে,
উত্তরিব বঙ্গপ্রান্তে ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গমসম—
মেঘমগ্ন ঊষালোকে মহানন্দে নীড় খুঁজি মম।

কোথায় প্রাণের বাসা ? গোধূলিরে করি পরিহাস
ধরণী করিয়া রাঙা আদিগন্ত জেলেছে পলাশ
যেথা রক্তরূপশিখা ? চক্রচূড়-যন্ত্রে উঠে জল
যেথা কয়লার খাদে ; রাত্রিদিবা শ্রমিকের দল

মাটির বক্ষের ধন লুঠি আনে সুড়ঙ্গের পথে
অতল পাতালে নামি ? দুঃখ যেথা সঙ্গীতের স্রোতে
ভেসে যায় ; জ্যোৎস্নালোকে সারারাত বন্য নারী নাচে
সঘন দুন্দুভিরবে ? ফুটে ফুল মহুয়ার গাছে,
শাল পিয়ালের বনে ; অথবা যেথায় রাঙা মাটি
দিগ্বিদিকে তরঙ্গিত—হেথা হোথা তারি বক্ষ কাটি
ধারাজল ছুটে চলে ; তীরে তীরে কুঞ্জে কেতকীর
ফুল ফোটে ; জেগে থাকে বক্ষতলে তালী-বনানীর
প্রফুল্ল কমলবন উচ্চতট দীর্ঘিকায় যথা,—
তথায় কি গৃহ মোর নীপচ্ছায়ে ? দিবা তন্দ্রারতা,
অনিন্দ্য নিকষকান্তি বন্য যুবা বাজাইয়া বাঁশী
বিহরে প্রান্তর-মাঝে ; পথিকেরে করিয়া উদাসী
রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে ঘুঘুর করুণ কণ্ঠস্বরে
কেঁপে ওঠে বনবীথি ; মালতীর গন্ধে যেথা ভরে
ছায়াচ্ছন্ন পল্লীপথ ; সুশ্যামল ধান্যক্ষেত্র-মাঝে
গুন্ঠিত কুটীররাজি যেথা গ্রামবধূসম রাজে
কুন্ঠিত নিভৃত গ্রামে ? যেথা ক্ষীণা কোপবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবন নর্ম্মভরে ঝুলে,
শুনে তার কলগীতি ? মুক্তা-পাণ্ডু যেথা বালুতটে
উদ্দাম অজয় ছুটে আপিঙ্গল ; তীরে মহাবটে
অযুত বিহঙ্গ রহে ; তারি তলে বাজে একতারা
বাউলের ; মধুকণ্ঠ বৈষ্ণবীর গীতসুধাধারা
ভাসায় নরের মর্ম্ম ; মেলা বসে ভক্তের সম্মানে,—
সুদূরের যাত্রী আসে কেন্দুবিল্বে—যেথা দেবস্থানে

বিকায় সহস্র পণ্য, কোলাহল উঠে গ্রাম জুড়ে ?
অথবা প্রান্তরপ্রান্তে কবিতীর্থে নিভৃত নাম্নুরে ?
সেথা তরুছায়াস্নিগ্ধ বাপীতটে শুনিব কি আর—
'পীরিতি করিয়া মরে যে জন—সফল জন্ম তার' ?
যেথা দীন পল্লীগৃহে মহাপ্রাণ গিয়েছিল গাহি—
'সবার উপরে সত্য মানুষ, তাহার উর্দ্ধে নাহি' ;
যেথা মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমে কলঙ্কেরে করি কণ্ঠহার
মৃত্যুঞ্জয়ী চণ্ডীদাস রজকিনী রামীরে তাহার
অমর করিয়া গেল ; বাশুলী-মন্দির-ছায়ে তথা
মিলিবে কি গৃহ মোর, মিটিবে প্রাণের ব্যাকুলতা ?
কোথা যাব ? মরুবক্ষে স্নিগ্ধ-শ্যাম কুঞ্জবীথি-তলে
আজিকার মহাকবি যেথায় মিলাল মন্ত্রবলে
বিমুগ্ধ বিশ্বের চিত্ত ? রসাল-বকুল-বনচ্ছায়
ছাত্রদল লয় পাঠ গুরুপাশে ; শালবীথিকায়
গাহে বৈতালিক গীতি শুচিস্মিতা আশ্রমকন্যকা
উদাত্ত কোমল কণ্ঠে সুপ্ত রাত্রে ?—তোমার অলকা
ওগো অতীতের কবি, এর চেয়ে মনোহর সে কি ?
মিনতি না করিতেই পূজা দিবে যেথা মেঘ দেখি
নরনারী মহানন্দে বিচিত্র উৎসব-বেশে সাজি,—
উঠিবে মৃদঙ্গরবে বেণু বীণা সঙ্গে যেথা বাজি
বর্ষামঙ্গলের গীতি,—তব মেঘ সেই পুরী ছাড়ি
দূর হিমাচল-পারে আজ বন্ধু, কেন দিবে পাড়ি ?
মুখরিত যার গানে এ বসুধা সাগর-মেখলা,
বসি তার পদতলে আমি যদি মুগ্ধ গৃহভোলা—

জীবন কাটায়ে দিই, মেঘরথ কি করিবে তবে ?
গৃহের সন্ধান মোর কোথা হবে, কেমনে বা হবে ?

হেথাও দিবে না ছুটি ? যেতে হবে এও ফেলে পিছে—
ইহারো দক্ষিণে যেথা নারিকেল-পল্লবে কাঁপিছে
প্রসন্ন প্রভাতরশ্মি ? ধারাসিক্ত কৃষ্ণ মৃত্তিকায়
যেথায় সুগন্ধ ছুটে ; পুষ্পিত তিন্তিড়ী-বীথিকায়
সুরভি-মন্থর বায়ু ? দিগন্তবিস্তৃত ক্ষেত্ররাজি
বর্ষার সলিলমগ্ন ; তারি মাঝে ফুটিয়াছে আজি
কুমুদ কহ্লার পদ্ম ; গ্রামগুলি তারি মাঝে মাঝে
রম্ভাবন-বিখচিত যেথা সিন্ধু-দ্বীপসম রাজে ?
গঙ্গা কূলে কূলে ভরা, তরুশ্যাম তীরে তীরে তার
সহস্র নগর পল্লী,—শত লক্ষ প্রীতি-মমতার
সুখনীড় ? নদীতীরে পাটকলে শ্রমিকেরা খাটে,
চিমনিতে উড়ে ধোঁয়া ? যেথা সুপ্রাচীন জীর্ণ ঘাটে
অশ্বত্থ-বটের ভিড় ? সেথা বধূ স্নান করি নীরে,
সিক্তবাসে ঘটকক্ষে সরমজড়িত পদে ফিরে—
চকিত চাহনি হানি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে।
সেথায় গোধূলিলগ্নে গৃহলক্ষ্মী সন্ধ্যাদীপ জ্বালে
গৃহে গৃহে—শঙ্খরবে সর্ব্ব অকল্যাণ করি দূর।
শিশু রূপকথা শুনি মার কোলে ঘুমায় মধুর
ঘুমপাড়ানিয়া গানে। হাসে চাঁদ বেণুবনশিরে।
রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে আসে সজল সমীরে।

আম-কাঁঠালের বনে 'বৌ কথা কও' পাখী ডাকে।
কবি, যেথা ম্লান করি আষাঢ়-মেঘের মহিমাকে
উদার ধানের ক্ষেতে যতদূর যায় দৃষ্টিসীমা,
নিত্য তরঙ্গিয়া উঠে দীপ্ত মরকত-শ্যামলিমা—
এই সে শ্যামাঙ্গী বঙ্গ—শিল্পী, কবি, ভাবুকের দেশ।
রাজ্য যাক, অর্থ যাক,—বাঙালীর চোখে স্বপ্নাবেশ—
এ দেশে কেমনে যাবে ?

দেখে যাব ভাগীরথী-তীরে
শক্তিপীঠ সুন্দরী নগরী কলিকাতা ; ভারতীরে
লক্ষ্মী যেথা ভগ্নী-স্নেহে করে আলিঙ্গন ; বাঙ্গালার
সৌধময়ী রাজধানী। বিদেশীর সে পণ্যশালার
প্রাণকেন্দ্রে দেখে যাব নিজ বাসভূমে পরবাসী
বাঙালীরে ; দেখে যাব ঐশ্বর্য্যের মাঝে উপবাসী
বিদগ্ধের কল্পনাবিলাস। রঙ্গালয়, ছবিঘর,
সহস্র বিলাসে পূর্ণ নপুংসক নটের নগর
পার হয়ে যাব চলি সবুজ প্রান্তরে পুনরায় ;
পাটল পাটের ক্ষেতে, পানের বরোজে,—যেথা যায়
কল্যাণী কৃষকবধূ দ্বিপ্রহরে অন্নপাত্র বহি
মিটাতে কান্তের ক্ষুধা। পূর্ব্ববায়ে আসে রহি রহি
কদম্ব-কেতকী-গন্ধ। পল্বলের আবক্ষ সলিলে
কোকিলবরণা মেয়ে মাছ ধরে, লুব্ধ শঙ্খচিলে
দেখে বসি। হাঁটুজলে বাহিয়া তালের ডোঙা যায়
বালক-বালিকা। যেথা গোসাপেরা ভাসিয়া বেড়ায়

মরাগাঙে বাড়াইয়া গলা। পাঠশালা-পলাতক
ছিপ ফেলে ব'সে থাকে গ্রামপ্রান্তে দুরন্ত বালক
স্থির ছবিটির মত ; মাছরাঙা ছোঁ মারিয়া পড়ে
বর্ণের বিদ্যুৎ হানি কালো জলে ; নিস্তব্ধ প্রহরে
ঝিঁঝি ডাকে ছায়াঘন পথে। ঘাটে এসে নিতে জল
যেথায় প্রাণের কথা প্রাণ খুলে বলে অনর্গল
চিরন্তনী বঙ্গনারী অপরাহ্ণে সখীজনপাশে।
ডুবায়ে কাশের বন,—বালুচর ডুবায়ে দুপাশে
উত্তাল তরঙ্গ তুলি দামোদর চলে অট্টহাসি—
মিশিতে জাহ্নবীবক্ষে। ঝ'রে পড়ে শেফালিকারাশি
তরুমূল শুভ্র করি নিভৃত গ্রামের মর্ম্মতলে ;
উষালোকে ব্রতার্থিনী বালিকা মিলিয়া দলে দলে
অঞ্চল ভরিয়া লয়। দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে
গুলঞ্চ বিছায়ে রয় ; গ্রামবধূ ভক্তিপূর্ণ মনে
স্নানশেষে ঘটকক্ষে নিঃশব্দে করিয়া যায় নতি
সিক্তবাসে। গ্রামপথে কৃষক চলিতে মন্দগতি
হলস্কন্ধে গাহে গান ; যূথীগন্ধে আমোদিত দিক।
ওরে স্বর্গসুখান্বেষী পথভ্রান্ত উন্মনা পথিক,
কোথায় ফিরিতেছিলি এতদিন কাহার দুয়ারে
ভিক্ষা মাগি অবিরত ? দেশে দেশে খুঁজেছিস যারে
এই সেই কল্পলোক। মেঘ হতে নামি ধরাতলে
মৃণ্ময় কুটীরে আয়। শিশুদল হর্ষকোলাহলে
সাগ্রহে ঘিরিবে তোরে। পুরন্ধ্রীরা পুছিবে কুশল ;
জননী দাঁড়াবে আসি দ্বারপ্রান্তে চক্ষে ল'য়ে জল,

করুণ কোমল হাসি। ভগিনীরা অপূর্ব্ব পুলকে
ভৃঙ্গারে ধোয়াবে পদ, ব্যজন করিবে আসি তোকে
তালের ব্যজনী আনি, মাদুর বিছায়ে স্নেহভরে
শয়ন রচিয়া দিবে মুক্তদ্বার দক্ষিণের ঘরে
সযতনে। বক্ষে লবে শুভ্রশ্মশ্রু ঋষিমূর্ত্তি পিতা—
দাঁড়ালে প্রণাম করি। গৃহধেনু পুলকবিস্মিতা
আসিয়া দাঁড়াবে কাছে ছাড়ি নিজ শৈবাল-শয়নে
প্রবাসী বন্ধুরে হেরি, চেয়ে রবে বিশাল নয়নে
ভরিয়া স্বাগত দৃষ্টি। ওরে মূঢ়, এই তোর ঘর!
এইখানে শাক-অন্নে কেটে যাবে জন্ম-জন্মান্তর
ভগিনীর সমাদরে, জননীর অন্তহীন স্নেহে।
যায় ফিরে যাক মেঘ তুষ্ট তোরে প্রিয়াহীন গেহে
অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করি ; এ সংবাদ শুনি মুখে তার
অতীতের মহাকবি দিক তোরে সহস্র ধিক্কার,—
লজ্জারুণ যক্ষপুরী স্মৃতি হতে যাক তোর মুছি,—
তবু এই তোর স্বর্গ! এইখানে শ্রান্তি যাবে ঘুচি,—
এইখানে তৃপ্তি পাবি আজি তুই। স্নিগ্ধ অন্ধকারে
হেথা দিবে কিনা দেখা আর কেহ কে বলিতে পারে
এর পর কোনদিন! বৃষ্টিক্ষান্ত গোধূলি-বেলায়
শানাই বাজিবে কিনা দুয়ারে মধুর মূর্চ্ছনায়!

কবি, মোরে ক্ষমা ক'র, এতদিন ভুল বুঝিয়াছি।
বিরহীর তীর্থপথে তুমি যে দুলালে মালাগাছি

পথ চিনাবার তরে,—আমি সেথা পথশেষ ভাবি
বসিয়া পড়িয়াছিনু। ভুল ক'রে করেছিনু দাবি
অক্ষম তোমার কাছে সর্ব্বমানবের কল্পলোক ;
বঞ্চিত হয়েছি তাই। আজি মোর আর নাই শোক।
অতীতের প্রেমস্বপ্ন বর্ত্তমান করুক সুন্দর ;
মুগ্ধচক্ষে দেখি ব'সে। এমনি আষাঢ়ে কবিবর,
মানবের অন্তর্গূঢ় বেদনারে দিতে গিয়ে ভাষা
তুমি স্পর্দ্ধা কর নাই ; তুমি শুধু করিয়াছ আশা।
প্রিয়ার দেউল-পথে স্তূপরাজি সাজায়ে দুধারে
প্রকৃতিরে পূজিয়াছ, ব'লে গেছ পূজা দিতে তারে
অনাগত ভবিষ্যতে। বিরহীর বন্ধু আছ জেগে
অনন্ত-কালের লাগি আষাঢ়ের নব ঘন মেঘে।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন

কাল্‌চারে আর কুল্‌টুরে,
বাধল লড়াই ছড়ায় আগুন দশ বারোটা দেশ জুড়ে।
মাটির ধূলায় হেলেনিজ্‌ম কেঁদে কেঁদেই করল পাঁক,
সবুজ তৃণ ঢাকল কখন মিশর-বাবিলনের জাঁক।
চীনকে চেনা যায় কি আর ?
জিন্না গাঁধী আগলে আছেন সেই ভারতের দুর্গদ্বার !
পাহাড়-বনে সাঁওতাল আর কোল-ভীলেরা ছুঁড়ছে তীর,
তারই ঘায়ে প্যারিস দেখ, ইফেল চূড়ায় ধরল চিড় !
থাকবে না ক দুঃখ ভাই—
জ্বললে আগুন নিববে তাহা, নিবলে শুধু থাকবে ছাই।
জ্বলছে আগুন জ্বলতে দাও—
দেখলে অনেক, দেখবে অনেক, বল—আজ কি বাজার ভাও !

দোলা

অনেকদিন পরে অমিদাদাকে দেখিয়া এত খুশি হইয়া উঠিলাম—কতদিন পরে দেখা, প্রায় বারো বছর, যেন এক যুগ। তিনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন, তাঁকে যে আমি কি ভালবাসিতাম! তিনিই এত কাছে আসিয়াছেন, সেই আত্ম-সমাহিত মানুষটি, সেই পড়াশোনা লইয়া থাকা। এখনও বিবাহ করেন নাই, সঙ্গে দূরসম্পর্কের ভাই নরেন আর তাঁর স্ত্রী।

আমি বলিলাম, অমিদাদা, একদিন আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিব।

তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই। আমি এখনই বউমাকে নিমন্ত্রণ করিতে চলিলাম।—বলিয়া চটিজুতাতে পা দিলেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, নিমন্ত্রণ প্রয়োজন হইবে না, তিনি আপনিই আসিবেন। ও কাজটা তাঁদেরই।

বাহিরে আমাদের পায়ের শব্দে অমিদাদা হাসিমুখে ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। একি! সংহতির দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাঁর চোখে আলো ফুটিয়া উঠিল। আশ্চর্য, এ আলো তো আমার অজানা নয় ; কতদিন সংহতির মুখে চাহিয়া চাহিয়া আমার চোখেই এই আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা ঘোর লাগিয়া গেল, ঘোরটা কাটিয়া গেলে দেখি, সংহতি নীচু হইয়া অমিদাদাকে প্রণাম করিতেছে আর অমিদাদা তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিতেছেন, সংহতি, ভাল আছ তো? সংহতি খুব আস্তে বলিতেছে, হাঁ। আমার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিবার প্রয়োজনই হইল না।

অমিদাদা এই উত্তরে যেন খুব খুশি হইয়া উঠিলেন, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, এস এস, ঘরে এস।

ঘরে ঢুকিতেই নরেনবাবু চমকিয়া উঠিলেন। আমার দিকে চাহিয়া তাঁর দুই চোখ যেন রাগে জ্বলিতে লাগিল, তাঁর ভাবখানা দেখিয়া মনে হইল, কত যুগ যুগ ধরিয়া আমি তাঁর সর্বনাশ করিয়া আসিতেছি, অথচ ভদ্রলোককে ইতিপূর্বে কস্মিন্‌কালেও দেখি নাই। তারপরে সংহতির মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে তাঁর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। চাহিয়া দেখি, সংহতি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিলাম। পথে সংহতি কোন কথাই বলিল না, আমিও কোন চেষ্টা করিয়া তাকে বিরক্ত করিলাম না। কি যে হইল, ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিলাম না।

বাড়ি ফিরিয়া সংহতি একটা মোড়া টানিয়া বসিল।

আমি বলিলাম, কি হইল, সংহতি?

সংহতি এইবারে তার নীরবতাকে ভাঙিয়া আস্তে কথা কহিল, যেন কোন স্মরণ-বিস্মরণের যুগে চলিয়া গিয়াছে; যেন এই যে এই সন্ধ্যার রক্তরাগের আলোতে স্নান করিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া আছে, ঠিক সেইখানটিতেই নাই।

আমি তোমাকে কিছু বলিতে চাই। তার গলার স্বরে একটা বেদনার ইঙ্গিতের আভাস ছিল, তাহাই অনুভব করিয়া, ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, না না, সংহতি, থাক এখন, এখন দরকার নাই।

সে তার চোখ পুরাপুরি করিয়া আমায় মুখে মেলিয়া ধরিল, বলিল, আমাকে বলিতে দাও। যে কথাটা এতদিন বলা হয় নাই, সেটা যে তোমাকে ফাঁকি দিবার জন্য, এমন কথা মনে করিও না। সব কথা বলিবার অবসর সকল সময় মেলে না।—এই বলিয়া সে সুরু করিল,

আমার মামা ছিলেন মেয়েদের পুরাপুরি বাহিরে আনিবার পক্ষপাতী, কেবলমাত্র ঘোমটার আবরণ খসাইবার বা টেনিস-ব্যাড্‌মিন্টনের কোর্টকে সুদৃশ্য করিবার নয়। তাই ছেলেবেলা হইতেই নানা ভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম এমনই যে, কোথাও বাধিত না। সাধারণত বাঙালীর মেয়ে একটা বিশেষ বয়সে যখন বাহির হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ঘরে আসিয়া পড়ে, তখনও না। সেই বয়সেও সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতাম। এই লইয়া আমার মামীমার অনুযোগ-অভিযোগের অন্ত ছিল না। তিনি বলিতেন, এ কি করিতেছ?

মামা বলিতেন, মানুষটাকে মানুষ হইবার সুযোগ দিতেছি।

মামীমা রাগ করিতেন, মানুষ হইতে গিয়া অমানুষ হইয়া বসিবে।

তাহা হইলে আমাকে দোষ দিও না, যে বিধাতা অমানুষ হইবার ক্ষমতা দিয়াছেন, তাঁহাকেই দোষী করিও।

এমনই কথার পরে আর রাগ করা চলে না। মামীমা বলিতেন, তুমি কি বল, কিছুই নষ্ট হইবে না, কিছুই ভাঙচুর হইয়া যাইবে না?

সে তো হইবেই, তাই বলিয়া আগাগোড়াটাকে অকেজো করিয়া রাখিতে হইবে, এমনই দুর্ভাগ্য ঘটিবে কেন? চলিতে গেলে কিছু খসিবেই।

মামীমা তবু শেষ বারের মত চেষ্টা করিতেন, আচ্ছা, তোমার ঘরের মেয়েকে তুমি যথেষ্ট শিক্ষা দিও, স্বাধীন করিও, শুধু ছেলেদের সঙ্গে অমন করিয়া মিশিতে দিও না।

মামা তখন এমনই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেন যে, মনে হইত, ফাটিয়া পড়িবেন। হাসির বেগ থামিলে বলিতেন, তোমার দামী শাড়ি নষ্ট হইয়া যাইবার ভয়ে তাহাকে বাক্সবন্দী করিয়া রাখার মত কথাটা হইল। সে যদি তোমার অঙ্গেই না উঠিল তো দোকান দোষ করিল

কি? যাক না তার ভাঁজ কিছু ভাঙিয়া, কিছু ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়াও যাক, তবু সে যেন তোমার ব্যবহারে লাগে।

তাই বলিয়া যদি সবটা নষ্ট হইয়া যায়?

দামী হইলে যাইবে না। যদি যায়ও, তবু আগে হইতেই এমনই ভাবনা করিয়া মরিও না, বলিও, ওর আয়ু অল্প ছিল।

তাহা হইলে ঐ যে তোমার শান্তমণি—তাহাকে কিছুদিন লইয়া পড়িয়াই হাল ছাড়িয়া দিলে কেন? সেও তো মানুষ।

শান্তমণি আমার এক সম্পর্কীয় বোন্‌ঝি, বড় হইয়া মামার কাছে আসিয়াছিল। মামা বলিতেন, মানুষ বলিয়াই তো। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, যে পরিবারে বড় হইয়াছে, তারই দাগ লাগিয়া আছে, তাই বাহিরের আলোতে ওর আপনাকে মেলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, ওর সমস্ত পৃথিবীটা ঐ রান্নাঘর আর তার চারপাশে। তাই যদি হয়, তাকে জোর করিয়া বাহিরে আনিবার আমি কে?

এমনই করিয়া তিনি মানুষের মূল্য দিতেন।

আসল কথা, মামার মনে একটা এই বিশ্বাস ছিল যে, মানুষকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিলে যাহা পাওয়া যায়, সন্দেহ-সংশয়ের মধ্য দিয়া তার সিকিও মেলে না।

এমনই আবহাওয়ার মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছিলাম। ফলে, আমি একটু পৃথক হইয়া গড়িয়া উঠিতেছিলাম। যে বয়সে চারিদিক হইতে রুদ্ধ থাকায় যাকে তাকে একটু ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিলেই মনে রঙ ধরিয়া যায়, যে বয়সের মেয়েকে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিবার সঙ্গতির সঙ্গে একটু আদর-যত্ন করিবার মত সুপাত্রের সহিত নিশ্চিন্তে বিবাহ চুকাইয়া বাপ-মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারেন, সে বয়সে আমার তেমন

কিছুই হইল না। আমি যেন একটা বিশেষ কিছুর জন্য তৈয়ারি হইতেছিলাম।

এমন সময় আসিলেন অমিতাভ। বুদ্ধির দীপ্তিতে জলিয়া আলো হইয়া থাকিত তাঁর কালো রঙ; বড় চোখে, টিকালো নাকে, চওড়া কপালে ঝলমল করিত আভা। তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর চলা—সমস্তর মধ্যে একটা অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে একটি স্তব্ধ মহিমা—ঠিক ইহাকেই বলা চলিতে পারে সংহত।

মনে মনে আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কি হইল, তিনিও যেন আমাকে একটু বিশেষ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলেন।

এমনই করিয়া কিছুদিন কাটিয়া গেল—সে আমার এক আশ্চর্য বিস্ময়ের দিন।

এইখানে সংহতির গলা একটু কাঁপিয়া গেল, একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিয়া বসিলাম; আমার দিকে চাহিয়া তাঁর চোখে যে আলো জলিয়া উঠে, সে কেবলমাত্র দৃষ্টি নয়—সে শিখা।

এইবারে আমার নিজেকে লইয়া ভাবনা ধরিয়া গেল। কি আশ্চর্য, আমার মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে? অকারণে আপনাকে মূল্যবান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে মনে বেশ বুঝিলাম, আমার চতুর্দিকে একটি আলো জ্বালাইবার সম্ভাবনা প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছি।

অথচ ইতিপূর্বে আমার মুখে যে কোন দৃষ্টিই পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু দৃষ্টিমাত্রই তো আলো নয় এবং তা লইয়া ভাবনা করিবারও দরকার করে না।

কিন্তু এমনই আশ্চর্য তাঁর ব্যবহার যে, আলো জ্বালাইয়া তুলিলেন, তবু কাছে টানিলেন না—শুধু আমার মনখানাকে মেলিবার অবসর দিলেন।

নরেন অমিতাভের এক দূরসম্পর্কীয় মামাতো ভাই। অমিতাভের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, প্রায় আমার বয়সী। একেবারে অমিতাভের উল্টা। অজস্র কথা অনর্গল বকিয়া চলিতেছে, হাসিতে একেবারে ফাটিয়া পড়িবার মত, খুশিতে দুই চোখ চঞ্চল। মাঝে মাঝে আসিয়া আমার সামনে বসিয়া বকিয়া বকিয়া চলিয়া যাইত। যথেষ্ট আবদারও করিত।

একদিন একটা ছেলে আমারই সামনে বলিয়া বসিল, মেয়েদের যতই বড় করিতে চাও না কেন, ওদের চিরকালটার সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সেইজন্যেই তো ওদের জন্য রান্নাঘর।

ছেলেরা আমার সামনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহিত না। আমি যে মেয়ে—এই কথাটা সব সময় ওদের মনে জাগিয়া থাকুক, এটা আমিও চাহিতাম না। কিন্তু তবুও একটা ভদ্রজনোচিত আবহাওয়া আছে, এই অভদ্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করার পূর্বেই নরেন বলিয়া উঠিল, বাক্যবাগীশ, থাম। মানুষ বলিতে বোঝ কি? তোমার তর্কশাস্ত্রে মানুষের সৃষ্টি হয় না। পুরুষের ব্রেন কত বড়, তার পরিধি কতখানি, তারই সঙ্গে মাপ করিয়া মেয়েদের বিচার করিতে চাও। কিন্তু তোমাদের বাটখারায় যে মেয়েদের মাপিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? বুদ্ধি লইয়া রাজ্য চলিতে পারে, জীবন চলে না। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় বাবা আমাকে অনেক শিখাইয়াছিলেন, তবু আমি আমার মাকে যেমন ভালোবাসিতাম তেমন আর কাহাকেও নহে।

আমার মা যখন মারা গেলেন, তখন মনে হইল, বিশ্বসংসারের সমস্ত আলো নিবিয়া গিয়াছে।—বলিতে বলিতে নরেনের দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

এইখানে নরেন আমাকে স্পর্শ করিল। ওর মধ্যকার যে কাঙাল মাতৃহীন শিশুটা আমার কাছে আবদার করিয়া ফিরিত, তাহাকে ভাল লাগিল। আমি ইহা খুব সত্য বলিয়া মনে করিলাম।

একদিন বিকালে দুইজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। মাঠের মাঝখানটা সূর্যের শেষ আলোয় রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, নরেন হঠাৎ বলিল, সংহতি, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি।

তার গলার সুরে আর তার মুখের দিকে চাহিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম।

আমার স্তব্ধ তটে যখন একটা ঢেউ লাগিয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তখন আর একটা ঢেউ আসিয়া দোলা লাগাইয়া দিল।

আমার ভাবনা ধরিল, ঠিক কি চাই! কিন্তু কি বলিব! মেয়েদের অন্তরের যে মানুষটা বলিষ্ঠ ক্ষমতার পাশে আশ্রয় চায়, সেই মানুষটাই আবার আশ্রয় দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—এ যে কত বড় সত্য, তাহা আমি কেমন করিয়া জানাইব!

সত্য বলিতে কি এই দুইজনেই আমাকে দোলা লাগাইল। কিন্তু বুঝিবার পক্ষে ইহা যতখানি সহজ, ঠিক ততখানিই কঠিন। দুইজনকে তো এক করিয়া পাওয়া চলে না।

দিনের আলোতে এ ভাবনা আমার ভাল করিয়া ধরিতে পারি না, বুঝিয়া উঠিতে পারি না, এত ভাবনা করিবার এতে আছে কি! লজ্জাই বা কি থাকিতে পারে!

অন্ধকার রাতে যখন সব স্তব্ধ হইয়া আসে, যখন বুদ্ধির বিচার চলে

না, তখন মনটা ভার হইয়া উঠে। বুকের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা কান্নার ঢেউ খেলিয়া যায়।

এমনই করিয়া কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর ঠিক করিলাম, এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। সেজন্য একটা চাকুরিও ঠিক করিলাম।

তারপরে যাবার দিন।

অমিতাভের ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বেশ স্থির হইয়া লিখিয়া চলিয়াছেন, খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়া মুখে পড়িয়াছে। যাবার খবরটা তাহা হইলে পান নাই। কিন্তু আমার সে ভুল ভাঙিয়া গেল, তিনি চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, সংহতি, এই গাড়িতেই যাইতেছ? বেশ ভাল চাকরি তো?

তাঁর এই কল্যাণ-কণ্ঠে আমার একটা কান্নার বেগ আসিল, প্রাণপণে তাহা সম্বরণ করিয়া শুধু বলিলাম, হাঁ।

একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে চাহিলাম, কোথাও কিছু খসিয়া যাইবার রেখা ফোটে নাই কি! হয়তো ফুটিয়াছে, কিন্তু সে এত সংযত যে, ধরা পড়িল না।

অমিতাভের দুই পায়ে মাথা রাখিয়া আপন মনেই বারবার বলিলাম, তুমি আমার আকাশ, তুমি আমার আকাশ।

অমিতাভ বলিলেন, সংহতি, তুমি আমাকে যত বড় করিয়া সৃষ্টি করিতেছ, আমি কোনমতেই তত বড় নহি। তোমার মনের মধ্যকার রসিক মানুষটা বসিয়া বসিয়া কল্পনার সমস্ত আলো মুখে ফেলিয়া আমাকে এমনই করিয়া বানাইতেছে। এ তারই কীর্তি। আমি কি এই প্রণামের যোগ্য?

আমি আরও একবার চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, আন্তরিকতার যদি কোনও শক্তি থাকে, তবে আমি বলিতেছি, সংহতি, তুমি যাহা চাহিতেছ, যেন তাহাই পাও, যেন শান্ত হইতে পার।

আমি যে কি চাহিতেছিলাম, তাহা তিনি এত সহজেই বুঝিয়াছিলেন। আর এমনই করিয়া তিনি আমাকে মুক্তি দিলেন।

নরেনের ঘরে গিয়া দেখি, সে ম্লান হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াও না দেখার ভান করিতে বলিলাম, নরেন, আমি চলিয়া যাইতেছি।

জানি। সেই কথা জানাইতে আসিয়াছ?

হাঁ। তোমাদের সঙ্গে কিছুকাল ছিলাম, সকলের সঙ্গে দেখাটা সারিয়া লইতে চাই।

নরেন তীব্র বিদ্রূপের স্বরে কহিল, অমিদাদার সঙ্গে দেখাটা নিশ্চয়ই সারা হইয়া গিয়াছে!

আমি তার খোঁচাটা নির্বিকার ভাবে সহিয়া বলিলাম, এইমাত্র তাঁর ঘর হইতে আসিতেছি।

নরেন কান্নায় যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, সংহতি, এ কিছুতেই হইতে পারে না, তুমি কোথায় যাইবে? একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি।—এই বলিয়া সে আমার মুখের কাছে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল, তার দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিতেছে।

সংহতি এই পর্যন্ত বলিয়া চুপ করিল। তারপরে একটু ম্লান হাসিল, বলিল, আমরা মেয়েরা এক জায়গায় বড় দুর্বল, সে এই কান্নার কাছে। অত্যন্ত সহজে এই কান্নার হাত হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারি, এমনই একটা অহংকার আমাদের অগোচরে রক্তে মিশিয়া আছে।

আমি কোনও কথা না কহিয়া নরেনের কপালে গালে আমার ডান হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম, আর নরেন আমার হাতে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। ডাকিলাম, নরেন!

কি?

সময় হইল আমার।

না।—বলিয়া সে জোর করিয়া আমার হাত ধরিল, যাইতে পাইবে না তুমি।

কিন্তু যাইতে তো হইবেই।

নরেনের দুই চোখ যেন জ্বলিতে লাগিল, যদি না দিই, যদি জোর করি।

আমি হাসিলাম, বলিলাম, কিছু না, কিন্তু এই জোর করিয়া তুমি কি পাইবে? একদিন তোমাকেই স্বীকার করিতে হইবে, শক্তির প্রচণ্ডতা ছাড়া ইহাতে আর আছে কি!

নরেন যেন কেমন হইয়া উঠিল, বলিল, বলিতে পার, মানুষ মানুষকে বাঁধিয়া রাখে কি করিয়া?

সে শুধু বাঁধা থাকে বলিয়া।

আমি ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মরিয়া হইয়া বলিল, তুমি যাইবেই? তবে তাহার আগে কিছু দিয়া যাও, কৃপণতা করিও না।

এই বলিয়া সে তার মুখ আমার মুখের এত কাছে তুলিয়া ধরিল যে, আমার মুখে তার উষ্ণ নিশ্বাস আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এ তুমি কি বলিতেছ নরেন?

কিছুই না, শুধু তুমি কৃপণতা করিও না।

মুহূর্তখানেক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, এ হইতে পারে না।

নরেন যেন দপ করিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল, বুঝিয়াছি, এ সমস্তই আগাগোড়া তোমার বানানো। আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তুমি অমিদাদাকে ধরিতে চাও।

নরেন, নিজেকে এত ছোট করিও না। তোমাদের অমিদাদাকে

বাঁধিবার কোনও দরকার করে না। সব বাঁধন তাঁর আপনিই খসিয়া আছে।

কথা বলিতে গিয়া আমার গলা একটু কাঁপিয়া গেল।

নরেন তাহা খেয়াল করিয়াও করিল না। বলিল, ভাল, তাঁর কিছুই দরকার করে না। শুধু মনে রাখিও, আমি অমিদাদা নই।

এই বলিয়া জোর করিয়া সে দুই হাত দিয়া আমার মুখ তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল—সে মুহূর্তেকের জন্য।

ক্ষোভে দুঃখে আমার গলায় বিদ্রূপের তিক্ততা আসিয়া জমিল, বলিলাম, এইবারে নিশ্চয়ই আমাকে ছাড়িয়া দিতে পার।

নরেন কথা কহিল না, শুধু আমার দিকে চাহিয়া অল্প একটু হাসিল। দেখিলাম, তার চোখের পাতায় আবার জল আসিয়া জমিতেছে।

ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

এত সহজে এমনই করিয়া এতটুকু না রাখিয়া সমস্ত বাঁধন খসাইয়া ফেলা আর এমনই জোর করিয়া আদায় করা—এই দুইটাতেই আমাকে সমান পীড়া দিতে লাগিল।

তারপরে চলিয়া আসিলাম। দুই এক জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি যাহা না চাহিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম, তাহাই পাইলাম। আমার আকাশ আর ঘর এইখানে এক জায়গায় আসিয়া মিলিল।

তারপরে যা হইল, তার সবই তো তুমি জান।

এই বলিয়া সে নীরব হইল।

আমার ভিতরে ভিতরে একটা দোলা লাগিয়া গেল। সেটা যে কি—আমার মধ্যে সংহতির বচনীয়-অনির্ব্বচনীয়কে মিলাইয়া পাইবার আনন্দ, যাহা এই দুইজনের মধ্যে পায় নাই, অথবা—আমি কেহই নই—আমি শুধু এই দুইজনকে মিলাইয়া দিলাম মাত্র—এই কিছু না হইবার বেদনা, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

কোনও কথা না বলিয়া নির্বাক অন্ধকার রাত্রির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলাম।

শ্রীনমিতা মজুমদার

মধ্যাহ্নের স্বপ্ন

জাল ফেলে আর তোলে নিজের পুকুরে
একা এক জেলে, তাই নিয়ে করে খেলা।—
কোথাও নাহি তো কেউ, নিস্তব্ধ দুপুরে,
জালে ওঠে হিজিবিজি কত তৃণ ঢেলা।

কত রঙ-বেরঙের শামুক ঝিনুক
ওঠে জালে, জেলে তাই নিয়ে করে খেলা,
কিবা তার যায় আসে, কেহ তা কিনুক
না কিনুক, তার কাটে জাল টেনে বেলা।

জাল ফেলে আর তোলে নিজের পুকুরে
একা এক জেলে, জাগে মুহূর্তের প্রাণ—
মুহূর্তে মুহূর্তে, স্বপ্নবিভল দুপুরে
নির্জ্জনেরে করে পূর্ণ মধ্যাহ্নের গান।

নিস্তব্ধ দুপুর, জলে ঢেউ-ঢেউ খেলা
জালে ওঠে কত কি যে! কেটে যায় বেলা।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ডাস্টবিন

গ্রীষ্মকাল, অপ্রশস্ত পিচের রাস্তা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসিয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে ফুটন্ত গুড়ের মত পিচ গলিয়া বুদ্বুদ বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জনহীন পথ। ল্যাম্প-পোস্টের উপর কেবল একটা দাঁড়কাক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিতেছিল। চলিতে চলিতে আমিও ঝলসিয়া উঠিয়াছিলাম, পাশের একতলা বাড়ির শূন্য রোয়াকটা আমাকে আকর্ষণ করিল। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইলাম।

সারা সকালটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কলের জল ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমি একজন চিত্রশিল্পী, একদিন আমার খ্যাতি ছিল, কিন্তু যুগের রুচিতে আজ আমি বাতিল হইয়া গিয়াছি। ছবি লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়াছি, বিক্রয়ের দিক দিয়া অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে। ছবি কিনিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। অনেকে এক ঘণ্টা ছবি দেখিয়া অবশেষে ছবির ভুল ধরাইয়া দিয়াছেন, কোথাও এই বিলাসিতার ব্যবসা ছাড়িয়া দিবার উপদেশ পাইয়াছি। ভুল যাঁহারা ধরাইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার না মানিয়া উপায় ছিল না, ধন্যবাদও দিতে হইয়াছে। আবার পিঠে ছবি ঝুলাইয়া ফিরি করিতে বাহির হইয়াছি। অবশেষে কাকের আহ্বানে এই রোয়াকের সন্ধান পাইলাম। রোয়াকটি বেশ পরিষ্কার, বুঝিলাম, চলতি পথে আরামভোগীদের মধ্যে আমিই প্রথম ভাগ্যবান। জানালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, সব বন্ধ; সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল, হঠাৎ বাড়ির কর্ত্তা উঠিয়া অবিলম্বে চলিয়া যাইতে আদেশ করিতে পারেন।

ছবির বোঝা রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিতেই পায়ের তলায় জ্বালা অনুভব করিলাম। জুতা খুলিয়া দেখি, জুতার তলার ছিদ্রস্থানটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা পিচবোর্ড দিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা দীর্ঘকাল ঘর্ষণের ফলে নিঃশেষিত হইয়াছে, শততালিযুক্ত পাদুকা পুরা ষোলো মাস ধরিয়া মালিকের পদসেবা করিয়া আসিতেছে। আর নূতন তালি লাগাইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। ভাবিলাম, এ দুইটাকে ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিলে কি হয়? মুচিরা পর্য্যন্ত জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। তাকাইয়া দেখে, কিন্তু মেরামত বা পালিশের জন্য ডাকে না; পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু পিচের দগ্ধ আকৃতি দেখিয়া এবং পথপার্শ্বের জুতার দোকানদারের ভয়ে বিরত হইলাম। আর একটা পিচবোর্ড সংগ্রহ না করিতে পারিলে চলে না।

ধীরে ধীরে তন্দ্রার আবেশ আসিতেছিল, দেওয়ালে মাথা রাখিয়া একটু জিরাইয়া লইব ঠিক করিতেছি, এমন সময় দুইটি কুকুরের চীৎকারে আবেশ কাটিয়া গেল। উভয়ে খাদ্য ভাবিয়া এক পাটি জুতা লইয়া টানাটানি লাগাইয়াছে। সবল প্রবলবিক্রমে দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিল। জুতাটা তখন মাটিতে লুটাইতেছে। দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম, জুতার পাটিটা আমার নয়, ডাস্টবিন হইতে এটাকে উহারা বাহির করিয়াছে। জুতাটায় একটিও তালি পড়ে নাই—কেবল ডগাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সুতার ছিন্ন অংশগুলি হিংস্র জন্তুর দাঁতের মত মনে হইতেছে, মনে হইল, অভিজাতকুলোদ্ভব অপমানে জর্জ্জরিত হইয়াই হিংস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কোন সময় সাহেবী দোকানে তাহার জন্ম হইয়াছিল। এখন রূপের জলুস নাই, সামান্য ছেঁড়াতেই মালিকের নিকট অব্যবহার্য্য হইয়াছে। ভাবিলাম, কুকুর দুইটাকে তাড়াইয়া দামী জুতার চামড়াটা নিজের কাজে লাগাই।

মুচিকে চামড়ার দাম দিতে হইবে না—এমন লোভনীয় চামড়া পাইলে হয়তো মজুরিটাও ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু মনকে প্রস্তুত করিবার আগেই জয়লব্ধ জুতাটি লইয়া বলবান বেগে বড় রাস্তার দিকে ছুটিল। কামড় খাইয়া দুর্ব্বল কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। বেচারার সমস্ত শরীরে লোমের চিহ্নমাত্র নাই, কঙ্কালময় দেহ গলিত চামড়ায় আবৃত, পিঠের ঘায়ে মাছি ভনভন করিতেছে, লেজটা কে মুচড়াইয়া দিয়াছে। পিছনের একটি পা কাটা, কোন অসংযমী চালক তাহার উপর চাকা চালাইয়া থাকিবে। দেহটাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া কোন প্রকারে ডাস্টবিনের নিকট আনিল। তাহার পর ঝিমানো অবস্থায় সামনের দুইটি পায়ের উপর মুখ রাখিয়া উদাসভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার সমস্ত উদ্যম নিঃশেষিত হইয়াছে—হয়তো আর উঠিবে না। না উঠুক, আমার তাহাতে কি, আমিও কতদিন অনাহারে থাকিয়াছি—আজও আহার জুটে নাই, জুটিবে কি না স্থিরতাও নাই। মনে মনে হাসিলাম, আমি কেন দয়ার কথা ভাবিতেছি—আমার উচিত ঐ বলবান কুকুরটার মত হওয়া, কিন্তু শক্তি পাইব কোথা হইতে! অকারণ অতীতের স্মৃতি একের পর এক চলচ্ছবির ন্যায় স্বপ্নের মত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কে বিশ্বাস করিবে যে, কোন সময় আমার সন্তুষ্টির জন্য দাস-দাসী সব সময় তটস্থ হইয়া থাকিত? চাটুকার গুণব্যাখ্যার জন্য নিত্য নব বিশেষণ আবিষ্কার করিত? ইচ্ছার সামান্য আভাসে দুষ্প্রাপ্য বস্তু কত সহজলভ্য ছিল? এখন অর্থ নাই, জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন চিত্রাঙ্কনবিদ্যা।

এক সময় আমার ছবির মালিকানা-স্বত্ব জাহির করিবার জন্য রাজায় রাজায় মূল্য-বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত হইয়াছে। তখন শিল্প-সমালোচকেরা আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে

করিতেন। কিন্তু আজ আমি মরিয়াছি। কারণ নূতন ফ্যাশনে, হালের রুচিতে আমি বাতিল, পুরাতন। সাহেব-বাড়ির ঐ পুরাতন পাদুকাটার মতই আজ পছন্দ হইলেও দুই চার টাকার বিনিময়ে আমার ছবি কেহ কিনিতে চায় না, পাছে অতি-আধুনিক কেহ বলিয়া বসে, এ তো ব্যাক-ডেটেড আর্টিস্ট!

ক্রমশ সব জড়াইয়া পাকাইয়া যাইতেছে, ঘুম গাঢ় হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেহটাই ভারী বোধ হইল, প্রসারিত করিয়া দেহ এলাইয়া দিবার প্রবল বাসনা হইল।

কিন্তু ছবির পোঁটলাটাকে বালিশ করিয়া শুইতে গিয়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল।

সেদিনও এমনই গৃহস্থের রোয়াকে সবেমাত্র বসিয়াছি, এমন সময় পিছনের খোলা জানালা দিয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও থালা-ধোওয়া জল একেবারে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

শুইবার আগে ভাল করিয়া দেখিলাম, জানালাটা বন্ধই আছে। কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

সহসা বুকের উপর আঘাত পাইয়া উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বুকের উপর একটা ভিজা বিঁড়া, অদূরে খড় ও দড়ির বিঁড়ায় সজ্জিত হইয়া একটি পাগল দাঁড়াইয়া আছে। একটি হাত দিয়া ডাস্টবিন হাতড়াইতেছে, অপরটি আমার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া নিক্ষিপ্ত বিঁড়া দেখাইতেছে। আমার পাঞ্জাবির উপর-অংশ ভিজিয়া চপচপে হইয়া গেল। লক্ষ্যের অব্যর্থ সন্ধানে পাগলের কি উৎকট হাসি!

প্রথমটা রাগিয়াই উঠিয়াছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লোকটার মুখ দেখিয়া হাসি আসিল; লোকটাকে পরম সুখী মনে হইল। ইতিমধ্যে পাগল আমাকে ছাড়িয়া রত্নসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছে। ছেঁড়া

নেকড়া, ভাঙা কলসী, শতছিন্ন মাদুর একের পর এক ডাস্টবিন হইতে তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। পাগলের পিঠের মেরুদণ্ড রৌদ্রের ঝলকে রেলের লাইনের মত চকচক করিতেছে, প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। কত রকমের শুকনা ফুল, নীল লাল কাগজ মাথার বিঁড়াকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। হাতে পায়ে কোমরে সর্ব্বত্রই বিঁড়ার অলঙ্কার। পাগলের সৌন্দর্য্যবোধ বিঁড়ার বাহিরে আসিতে পারে নাই। পাগলকে কে বুঝাইবে, এখন বিঁড়ার ফ্যাশন প্রচলন হয় নাই। মেয়েরা সবে এখন মাথার দুই পাশে খোঁপার বিঁড়া বাঁধিতে সুরু করিয়াছে মাত্র। যাক, সমস্ত দেহে বিঁড়া পরিবার চলন যখন আসিবে, তখন এই ফ্যাশনের স্রষ্টা পাগলকে মহাপুরুষ বলিয়া লোকে স্মরণ করিবে।

ইতিমধ্যে দুইটি চলন্ত নরকঙ্কাল ডাস্টবিনের সামনে আসিয়া উপস্থিত। একটি পুরুষ, অপরটি স্ত্রী—মেয়েটির কোলে কঙ্কালসার একটি শিশু। মেয়েটির পরনে গুনচট; পুরুষটি প্রায় দিগম্বর, একটা ছেঁড়া নেকড়ার কৌপীন মাত্র সম্বল। মেয়েটি মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া মাথা চুলকাইতেছিল—হয়তো উকুনের উৎপাত হইবে। ডাস্টবিনে ভাগীদার পাগলের পছন্দ হইল না। মেয়েটাকে সে মুখ ভেংচাইল; ফলে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মারিতে উদ্যত হইল। দুইজনের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করিতে পাগল বোধ হয় সাহস পাইল না। সে দখল ছাড়িয়া দিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নিষ্কণ্টক আধিপত্যের অধিকারী হইয়া ঐ পাগলের মতই পুরুষটি যাহা হাতের সামনে পাইল, তাহাই মাটিতে ফেলিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে রাশীকৃত অবর্ণনীয় ও অস্পৃশ্য বস্তু গৃহস্থের বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল।

সহসা পুরুষটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ডাস্টবিনের ভিতরে

সে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া সন্তর্পণে বাহির করিয়া আনিল একটা হাঁড়ি। তারপর হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিল একটা মোচড়ানো কলাপাতার ঠোঙা। অতি সন্তর্পণে ঠোঙাটা খুলিতেই অভ্যন্তরস্থিত বস্তু প্রকাশিত হইল—সামান্য উচ্ছিষ্ট খাদ্য, প্রাচুর্য্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ। কবে কে ফেলিয়াছে, নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। সমস্ত পাতাটায় পোকা কিলবিল করিতেছে, আমার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠিল।

মেয়েটি বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোলের ছেলেটি এক ফোঁটা দুধের জন্য মায়ের শুষ্ক স্তন আকর্ষণ করিয়া কিছু না পাইয়া অবশেষে কাঁদিয়া উঠিল—প্রত্যেকটি চীৎকারে গলার শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবারও তাহার শক্তি নাই—গলা ধরিয়া যাইতেছে। মায়ের সেদিকে লক্ষ্য নাই, সে লোলুপ দৃষ্টিতে ডাস্টবিনের দিকে আগাইয়া গেল। সন্ধানের ফলাফল তখনও জানা যায় নাই, ইহার উপর শিশুর অত্যাচার তাহার সহ্য হইল না, সজোরে সে ছেলেটার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল, ছেলেটা এবার ককাইয়া উঠিল—শব্দ বাহির হইল আধ মিনিট পরে, এবার আর কান্না নয়—কেবল একটা অনুনাসিক ঘড়ঘড় শব্দ মাত্র। তাহার পর মাতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিঝুমের মত পড়িয়া রহিল। ভাবিলাম, কিছু হইয়া গেল না তো?

বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হইবার পর লোকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর স্ত্রীর বক্ষস্থলের নেকড়াটা ছিনাইয়া লইল, আবার ভিতরে বসিল। আবার অল্পক্ষণ পরেই ডাস্টবিনের বাহিরে আসিল, হাতের নেকড়াটা তখন পোঁটলার আকার ধারণ করিয়াছে। সঙ্কেতে স্ত্রীকে নিকটে আসিতে বলিয়া সে মাটিতে পোঁটলাটা বিছাইয়া

ফেলিল, দূর হইতেই দেখিলাম, খানিকটা ভাত ও তরকারি তাল পাকাইয়া আছে। উভয়ের মিলিত চেষ্টায় ভাত ও তরকারি যথাসম্ভব পৃথক হইলে পুরুষটি খাদ্য ভাগ করিতে বসিল, স্ত্রীকে তৃতীয়াংশের এক অংশ দিয়া দুই অংশ নিজে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

আকাশ হইতে তখন আগুন ঝরিতেছে। রাস্তার পিচ গলিয়া প্রায় তরল হইয়া উঠিয়াছে। শহরের বুকে অশোভনীয় নিস্তব্ধতা, সমস্ত শহরটাকে যেন একটা বিরাট গোরস্থানের মত মনে হইল। অকস্মাৎ শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল—ক্ষুধাগ্নি তাহার পেট পুড়াইয়া দিতেছে, কাহারও শাসন সে আর মানিতে প্রস্তুত নয়। মেয়েটি অথবা পুরুষটিও তাহাতে বিচলিত হইল না। আপন আপন অংশের ভাত ও তরকারি মাখিয়া তাহারা মুখের ভিতর পুরিয়াই চলিয়াছে। এমন সময় গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে শাসনবাক্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সচকিত হইয়া তাহারা উপর দিকে তাকাইল—পিছনে কর্পোরেশনের চাপরাসী; ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়া স্তূপীকৃত জঞ্জাল ও বুভুক্ষুর দিকে তাকাইয়া আছে। চাপরাসীর ধারণা জন্মিয়াছে, ডাস্টবিন হইতে ময়লা বাহিরে আনার জন্য দায়ী ক্ষুধায় প্রপীড়িত ওই পুরুষটি। চাপরাসীর এদিক দিয়া অভিজ্ঞতা পুরাতন, সুতরাং ধারণার পিছনেই নিশ্চয়তা দৃঢ় হইয়াছিল। অন্তত একটা লাঠির খোঁচা মারিতে পারিলে কর্ত্তব্যের দিকটা ফাঁকি পড়ে না। চিন্তা ও কার্য্যের সমাধান একই সঙ্গে হইল।

খোঁচা খাইয়াও বাড়া ভাত ফেলিয়া উঠিতে পুরুষের মন সায় দিতেছিল না। তাড়াতাড়ি বাঁধিতে যাইবে এমন সময় পায়ের উপর গুরু আঘাত পাইয়া ডাস্টবিন হইতে খানিকটা সরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, লাঠি যখন ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন ক্রোধের উপশম হইতে দেরি হইবে না; মার খাইয়া আহার সংগ্রহ করা তাহার নূতন নয়—ইহা একরকম

দৈনিক ঘটনা বলিলেই চলে। কিন্তু সব চাপরাসীর কর্ত্তব্যবোধ যে এক রকমের হইতে পারে না, তাহা সে তলাইয়া ভাবে নাই।

দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চাপরাসী তাড়া করিল। শেষ পর্য্যন্ত পুরুষ পলাইয়া স্ত্রীর সহিত যোগ দিল।

চাপরাসীটা লাঠির ডগা দিয়া সংগৃহীত আহার্য্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কুকুরটাও চাপরাসীকে দেখিয়া যথাসময়ে সরিয়া পড়িয়াছিল। লাঠি ও লাঠিধারীর অন্তর্দ্ধানে কুকুরটা ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের দিকে অগ্রসর হইল। এক পা দুই পা চলে, আবার পিছন ফিরিয়া তাকায়। আতঙ্ক তাহার স্বভাবদোষে দাঁড়াইয়াছে। কে বলিতে পারে, ডাস্টবিনের একছত্রপতি মহাশক্তিমান চাপরাসীর পুনরাবির্ভাব হইবে কি না! ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া লোলুপ গ্রাসে খাদ্যের উপর যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িল। এক গ্রাস খাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে ছুট দিল। পলাইবার এত শক্তি সে পাইল কোথা হইতে? ব্যাপার কি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া তাহার বসিবার স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম, একটি প্রকাণ্ড তেঁতুলে বিছে, গায়ে মোটা মোটা আঁশ, বয়সে প্রাচীন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় ডাস্টবিন হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। পথে কুকুরের সহিত সাক্ষাৎ, বিষ যখন আছে, তখন তাহার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। বৃশ্চিক স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া গৃহস্থের বাড়ির দিকে চলিতে লাগিল, শত পা একসঙ্গে চলিয়াছে, যেন একটা সৈন্যের বাহিনী—যেখানে বাধা পাইবে, সেইখানেই সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। খাড়াই নর্দ্দমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া একটা ঝাঁঝরির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ঘুম ছাড়িয়া গিয়াছে, আবার উঠিবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু পায়ের ফোস্কা টাকার আকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় এক টুকরা পিচবোর্ড খুঁজিয়া বাহির না করিতে পারিলেই নয়। অথচ ডাস্টবিন খুঁজিবার উপায় নাই। চেনা মুখ দেখিলেই হয়তো—! অদূরে একটা পাহারাওয়ালার লাল-পাগড়িযুক্ত মাথাটা দেখা যাইতেছে, স্বর্গদূত বিড়ি ফুঁকিতেছেন।

কিন্তু পায়ের তলার ফোস্কায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, অগ্ন্যুত্তপ্ত লোহার পাতের মত পিচের রাস্তাটার উপর পা দিতেই সমস্ত শরীরের স্নায়ুশিরা ঝনঝন করিয়া উঠিতেছে। এতটা পথ ফিরিব কি করিয়া? এক টুকরা পিচবোর্ড না হইলে উপায় নাই, জুতার সোলের ছিদ্রে দিতে হইবে। একমাত্র ভরসা ওই ডাস্টবিন, ডাস্টবিনে অবশ্যই মিলিবে।

স্বর্গদূত বিড়ি ফুঁকিতেছেন, হয়তো দেখিয়া ফেলিবেন। তা ফেলুন, আমার উপায় নাই। ডাস্টবিনের দিকে আগাইয়া চলিলাম। লজ্জা করিয়াই বা ফল কি? কিছুদিন পরেই হয়তো পাগলটার মত বিঁড়া পরিয়া ডাস্টবিনে রত্ন সন্ধান করিয়া ফিরিব, অথবা ওই পুরুষটার মত—কল্পনা করিতেও সমস্ত শরীরটা ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিলাম, মৃতের কবরে আপত্তির মতই আমার এ ঘৃণা অর্থহীন। আমি তো আজ মরিয়াছি। এই তো মৃত্যু। নহিলে সমস্ত দেশ আমাকে বাতিল করিয়া দিল কেন? জীবন থাকিলে সে জীবনকে বর্জ্জন করে এমন সাধ্য কাহার? আমি মরিয়াছি—আমার ভিতরের চিত্রশিল্পী মরিয়াছে। আমার স্থান ওই ডাস্টবিনে। মুহূর্ত্তে আমার মর্য্যাদা-বোধ, রুচি, লজ্জা, ভয় সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। সঙ্কল্প করিলাম, ছবির বোঝাটা এই ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লইব;—শান্তি পাইব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। গলিত শব বুকে জড়াইয়া আর থাকিব না। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এক টুকরা পিচবোর্ড চাই। ছবিগুলির সঙ্গে চিত্রশিল্পীকে কবরস্থ করিয়া তখন আর পিচবোর্ডের সন্ধান করা সম্ভবপর হইবে না; মুখাগ্নি করিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতে নাই। ডাস্টবিনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম।

ছেঁড়া মাদুর, তরকারির খোসা, মাছের কাঁটা আঁশ, ভাঙা শিশি,

রঙিন কাপড়ের টুকরা, কয়লা ছাই, গলিত খবরের কাগজ, ভাঙা কুজার মুখ, ময়লা আবর্জ্জনা ;—কেবল এক টুকরা পিচবোর্ডেরই কি এই বিচিত্র রাজ্যে অভাব ঘটিল—আমার ভাগ্যফলে ?

আবার ঘাঁটিতে লাগিলাম। একটা ভাঙা পাখা, এক টুকরা লোহা, আবার এক প্রস্ত গলিত কাগজ। এটা কি ? একখানা আর্টপেপার ! একখানা ছবি ! কোন শিল্পী আমার মতই মরিয়াছে। কি ছবি ? সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

পৃথিবীর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধতম আকাশলোকে উঠিতেছেন দিব্যজ্যোতির্ম্ময়দেহ ক্রাইস্ট ! করুণাপূর্ণ নেত্রে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছেন।

'Resurrection of Christ.'

ক্রাইস্টের পুনরুত্থান ! কবর ভেদ করিয়া আকাশের ঊর্দ্ধতম লোকে চলিয়াছেন। কল্পনা নয়—সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, ডাস্টবিন হইতে ক্রাইস্ট উঠিয়াছেন, আমার চোখের সম্মুখে। শুধু ক্রাইস্টই নয়, এই ছবির স্রষ্টা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী—তিনিও উঠিতেছেন ডাস্টবিন হইতে।

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্থান কাল সব বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, পৃথিবীর রূপ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; দেখিলাম পৃথিবীর জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

পাহারাওয়ালাটা আগাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না, বিস্ময়ে অভিভূতের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আশ্চর্য্য, তাহাকে দেখিয়া আমারও ভয় হইল না, লজ্জা হইল না, ঘৃণা হইল না ; কোন কথাও তাহাকে বলিলাম না। আকাশলোকে ক্ষণেকের জন্য প্রতীক্ষমান ক্রাইস্টের চরণে মাথা ঠেকাইয়া ছবিখানি সযত্নে পকেটে পুরিলাম। তারপর ছবিগুলি তুলিয়া লইয়া জ্যোতির্লোক-উদ্ভাসিত পৃথিবীর পথে অগ্রসর হইলাম। খালি পায়েই চলিয়াছি, ফোস্কার বেদনাও আর অনুভব করিতেছি না।

চলিতে চলিতে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইলাম, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাস্টবিনকে প্রণাম করিলাম।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

নামজাদা

জল ত ধরিতে ঘটি বাটি পারে,
জলধর নাম মেঘেরি সাজে।
পদাঘাত এক ভৃগুই করেছে,
আর পদাঘাত বিফল বাজে।

পঙ্ক হইতে জনমে অনেকই
কে কহে কে ভাবে তাদের কথা ?
জল আলো করা পদ্মই আনে
পঙ্কজ নামে সার্থকতা।

কেশর ত আছে ঘেঁটুপুষ্পেরও,
সিংহকে তবু কেশরী জানি।
বীণা ত এখন অনেকে বাজায়,
শুধু বাগ্দেবী সে বীণাপাণি।

কর প্রতিদিন বেড়েই চলেছে,
করী হ'ল কিনা বনের হাতী ?
গিরি এনে, হনু হনুই রহিল,
গিরিধারী হ'ল জগন্নাথই !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুধার প্রেম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

মনোজ যাইবার পর সুধার বড় একা একা মনে হইতে লাগিল। যে সংসারের সহিত যুক্ত থাকিয়া সে এতদিন বাড়িয়া উঠিয়াছে, বেঙাচির লেজের মত কখন সেই সংসার তাহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এখন সেই সংসারের সহিত পুনরায় যুক্ত হইবার তাহার ইচ্ছা নাই এবং ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই। তাই সংসারের প্রাত্যহিক কাজগুলিতে পূর্ব্বের মত তাহার মন আশ্রয় পাইল না, আনন্দও পাইল না। যে রাজকর্ম্মচারীর স্থানান্তরিত হইবার আদেশ আসিয়াছে, নবাগত ব্যক্তিকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সে যেমন যন্ত্রের মত নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত ভাবে কাজ করিয়া যায়, অথচ তাহার মন আগামী কর্ম্মস্থানের দিকে নিবদ্ধ থাকে, সুধাও তেমনই তাহার প্রাক্তন জীবনযাত্রার মধ্যে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ত্রুটিহীনভাবে তাহার কাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা ভাবী জীবনের দিকে নির্নিমেষে তাকাইয়া রহিল।

মনোজের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে সুধার জীবন সরল ছিল, সহজ ছিল। বাবার সেবা করিত; পড়াশুনা করিত; সংসারের কাজ-কর্ম্ম করিত; বিশুর সহিত খুনসুড়ি করিত; বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করিত ও খেলা করিত; এবং রাত্রি নটা বাজিতে না বাজিতে ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িত। আর এখন জীবনে জটিলতা আসিয়াছে; যেখানে মাত্র বীচিবিভঙ্গ হইত, সেখানে ঘূর্ণির সৃষ্টি হইয়াছে। দিনের

বেলায় পড়াশুনা করিতে ভাল লাগে না, বসিয়া বসিয়া দিবাস্বপ্ন দেখে। রাত্রে ঘুম আসিতে চাহে না, কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া চিন্তার জাল বুনিতে বুনিতে রাত্রি শেষ হইয়া যায়।

সুধার মানসিক বিপর্য্যয় রাঘববাবু বুঝিতে পারেন না। বুঝিতে পারিবেনই বা কি করিয়া? সারা দিন রাত বিছানায় পড়িয়া ঝিমাইতে থাকেন। দিন দিন তাঁহার দেহের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতেছে। আজকাল নিজে উঠিতে বসিতে পর্য্যন্ত পারেন না। সুধাই বিছানা হইতে উঠায়, মুখ ধোওয়াইয়া দেয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, খাওয়ায়, স্নান করায়, মালিশ করে ও সেক দেয়। তাহার কোন কাজে কিছুমাত্র ত্রুটি থাকে না। তবে হয়তো কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া যায়, এক কথার জবাব অন্যভাবে দিয়া বসে। কিন্তু ইহার যে কোন গুরুতর কারণ আছে, তাহা রাঘববাবু ভাবিতে পারেন না। ভাবিতে পারেন না যে, যে সুধা সাত বৎসর বয়স হইতে সতরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শুদ্ধ তাঁহারই হৃদয়ের রসে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে আজ হঠাৎ তাঁহাকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ত্যাগ করিয়া জীবনী-রস আহরণ করিবার জন্য হৃদয়ান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মনোজকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, কয়েক দিন দেখেন নাই বলিয়া খুঁত খুঁত করিয়াছেন, হয়তো মনে মনে কোন দিন তাহাকে তাঁহার কন্যার স্বামী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সে যে তাঁহার কন্যার জীবনে এত গভীরভাবে শিকড় চালাইয়াছে যে, তাহাকে টানিয়াও ছাড়ানো যাইবে না, যাইলেও কন্যার জীবন ভাঙিয়া খান খান হইয়া যাইবে, তাহা তিনি বুঝিবেন কি করিয়া?

আজকাল ভূষণ প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হাজির হয় এবং রাঘববাবুর সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করিতে করিতে ঘন ঘন দরজার দিকে তাকাইতে

থাকে। সুধা মাঝে মাঝে আসিয়া হাজির হয়, কখনও তামাক সাজিয়া দিয়া যায়, কখনও আসিয়া বাবার পিঠের বালিশটা ঠিক করিয়া দিয়া যায়, আবার কোন দিন নিঃশব্দে বসিয়া রাঘববাবুর পায়ে মালিশ করিতে করিতে তাহাদের আলোচনা শোনে। সেদিন ভূষণের উৎসাহের সীমা থাকে না; সেদিন শুধু মুখ দিয়া নহে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সে কথা বলিতে থাকে। হাত নাড়িয়া, চোখ বড় করিয়া, নাক ফাঁপাইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, ভুঁড়ি দোলাইয়া, কথা যেন আর শেষ হইতে চাহে না—নিজের বিষয়-বৈভবের কথা, বংশগৌরবের কথা। কামারপুরের সমস্ত জমিদারিটাই এখন তাহার। অন্যান্য শরিকানী স্বত্ব সব সে নিজে কিনিয়া লইয়াছে। জমিদারির মধ্যে কতকগুলা কয়লাখাদ বাহির হইয়াছে, সাহেব কোম্পানিকে মোটা সেলামি ও রয়ালটিতে সেগুলা সে ইজারা দিয়াছে। এখানে সে এমন নিরীহটির মত বসিয়া গল্প করিতেছে বটে, কিন্তু জমিদারিতে তাহার প্রতাপে ব্যাঘ্র ও বলদ, খাদক ও খাদ্য হইয়াও নাকে নাক ঠেকাইয়া এক ঘাটে জল পান করে। এখানে ভাড়াটে বাড়িতে বাস করিলে কি হইবে, দেশে তাহার চকমিলানো বাড়ি দেখিলে চার দণ্ড চাহিয়া থাকিতে হইবে। শুধু কি দেশেই বাড়ি, কোথায় বাড়ি নাই তাহার? দেওঘর, গিরিডি, ঝাঁঝা, মধুপুর, শিমুলতলা—সব জায়গাতেই এক একখানা বাড়ি। আর যেমন তেমন বাড়ি নয়, ভাল ভাল বাড়ি, মাসে মাসে মোটা বাড়ি-ভাড়া পায়। পুরীতেও একখানা বাড়ি করিবে সে, টাকা মজুত, মনটা একটু মজবুত হইয়া উঠিলেই হয়। রাঘববাবু কোন দিন ঝাঁঝা গিয়াছেন? বেতো রোগীদের সুইজারল্যাণ্ড? দুই দিন সেখানের জল খাইলেই আর হাওয়া টানিলেই বাতে পঙ্গু রোগীও দৌড়-ঝাঁপ করিতে সুরু করে।

রাঘববাবু বিস্ময়াহত কণ্ঠে বলেন, সত্যি নাকি?

সুধাও কৌতূহলাক্রান্ত নয়নে চাহিয়া থাকে, বাবাকে বলে, চল না বাবা।

রাঘববাবু সক্ষোভে হাসিয়া বলেন, কোথায় পাব মা, এত টাকা?

ভূষণ বলে, যাবেন আপনি? টাকার জন্যে ভাববেন না। আমার নিজের বাড়ি, একটি পয়সা ভাড়া লাগবে না, তা ছাড়া খরচপত্র? ওঃ, সে ব্যবস্থা হবে এখন।

ভূষণ সুধার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্পষ্ট জানাইয়া দেয়, রাঘববাবুকে তাহার পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হয়, রাঘববাবুও যেন তাহাকে পর মনে না করেন। তাহা ছাড়া ঝাঁঝা যখন এত কাছে, এবং রাঘব-বাবুর যখন এত বাত, তখন মনে করাও উচিত নয়।

রাঘববাবু অপ্রতিভভাবে বলেন, আপনাকে—

ভূষণ বাধা দিয়া সবিক্রমে বলিয়া উঠে, আমাকে 'আপনাকে' নয়, তোমাকে, বয়সে আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট যে।

রাঘববাবু অপরাধীর মত বলেন, তা বটে, তা বটে। তোমাকে—তোমাকেও আমার আপনার লোক ব'লেই মনে হয়। তবে সেজন্যে নয়, মানে, এই শরীরে কেই বা সব ব্যবস্থা করবে, কেই বা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে?

ভূষণের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে, কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সবটাই প্রবলভাবে আন্দোলিত করিয়া কহে, আমি, আমি সব ব্যবস্থা করব, নিয়ে যাব, কিছু ভয় করতে হবে না আপনাকে। কবে যাবেন বলুন?—বলিয়া এমনই ভাব দেখায়, যেন বলিবামাত্র রাঘববাবুকে কাঁধে তুলিয়া এখনই হাওড়া স্টেশনে হাজির করিয়া দিবে।

রাঘববাবু চিন্তিত মুখে বলেন, আমি একটু ভেবে বলব এখন।

ভূষণ যেন মুষড়াইয়া যায়, সহজ গলায় বলে, ও, ভাববেন! তা

ভাবুন, মোট কথা, তাড়াতাড়ি জানাবেন। পূজোর মরসুম কিনা, ভাড়াটেদের ভারী ভিড়।

সুধা রাঘবকে বলে, বাবা, তোমার পেন্‌শনটা—

কয়েক মাস মনোজই রাঘববাবুর পেন্‌শন আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ভূষণ শুনিতে পাইয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে, কি ?

রাঘববাবু কাঁচুমাচু হইয়া বলেন, কিছু না, পেন্‌শনটা আনবার ব্যবস্থা করতে হবে, কি ক'রে যে যাই, এই শরীর—

ভূষণ সক্ষোভে কহে, ও, এই আমাকে আপনার মনে করেন! আমি রয়েছি কি জন্যে ? আমি ব্যবস্থা করব।

রাঘববাবু কৃতজ্ঞতার হাসি হাসিয়া কহেন, ভারী উপকার করা হবে তা হ'লে, আমার যে শরীর—

ভূষণ বাধা দিয়া বলে, আপনাকে ও কথা বলতে হবে কেন ? সব দেখতে পাচ্ছি যে! কানা তো নই, কি বলেন ?—বলিয়া সুধার দিকে তাকাইতেই সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানায়, না।

ভূষণ কহে, তবে ? কিছু ভাবনা নেই আপনাদের। আমি যখন আছি আর আপনাদের সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছে, তখন সব ব্যবস্থা করব আমি।—বলিয়া ডান হাতটা বুকে ঠুকিয়া যুগপৎ কন্যা ও পিতার দিকে তাকাইতে থাকে।

পূজা আসিয়া পড়িল। রাঘববাবুর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ভূষণ তাঁহাদের সমস্ত পূজার খরচ বহন করিল। কহিল, আপনার নিজের ছেলে থাকলে কি করত ? আমাকেও তাইই মনে করুন না।

সুধা বাবার কাছে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল, কহিল, ভূষণবাবুর ভারী

অন্যায়! আমার জন্যে এত ভাল শাড়ি কেনবার কি দরকার ? আমি এ পরতে পারব না বাবা।

রাঘববাবু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, ছিঃ মা, তা ক'র না। স্নেহ ক'রে দিয়েছে, তার অপমান ক'র না। তোমাকে নিজের বোনের মত মনে করে হয়তো।

সকলের চেয়ে ফূর্ত্তি হইল বিশুর। পুরা মাপের ফরাসডাঙ্গা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, চটিজুতা, জীবনে পরিয়াছে কিনা সন্দেহ। তাই দিবারাত্র অঙ্গ হইতে তাহাদের নামাইতে চাহিল না এবং সারাদিন চটিজুতার শব্দে ও ভূষণের প্রশংসায় বাড়িসুদ্ধ সকলকে অস্থির করিয়া তুলিল।

একদিন মনোজের একটি চিঠি আসিল। চিঠির সার মর্ম্ম এই—সুধার জন্য মনোজের অত্যন্ত মন কেমন করিতেছে। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। সুধা বোধ হয় বেশ মনের আনন্দে দিন কাটাইতেছে! মেয়েদের মন জলের মত, যে কোন পাত্রে অবলীলাক্রমে আশ্রয় লইতে পারে, পুরাতন পাত্রের কথা একবারও মনে পড়ে না। পুরুষের তথা মনোজের মন লোহার মত, যে ছাঁচের ছাপ একবার পড়ে, তাহা সহজে মুছিতে চায় না। সুধাকে ছাড়া মনোজের চলিবে না, এ কথা সুধা যেন সর্ব্বদা মনে রাখে। সন্ধ্যার পর সুধা কি আজকাল ছাদে যায় ? মনোজও সন্ধ্যার পর ছাদে গিয়া সুধাদের বাড়ির দিকে তাকাইয়া থাকে (অবশ্য আন্দাজে); বাতাসে সুধার চুলের গন্ধ ও তারায় সুধার চক্ষের দীপ্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে। সুধা হয়তো জলের ট্যাঙ্কটার পাশে গালে হাত দিয়া বসিয়া কণ্বতনয়া শকুন্তলার মত চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকে। কিন্তু কাহার চিন্তায় ? মনোজের, না অন্য কাহারও ? ভূষণবাবু কি আজকাল প্রতিদিন সন্ধ্যায় আসে ? তাহার সহিত সুধা যেন বেশি অন্তরঙ্গতা না করে।

দোহাই! সুধা যেন আর দিন কয়েক কষ্ট করিয়া মনোজকে মনে রাখে। মনোজ শীঘ্রই সুধার উপর ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া হাজির হইবে।

মনোজের চিঠি পড়িয়া সুধা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক, ঠিক। আমার ঐ রকমই হইয়াছে। প্রেমরোগের বোধ হয় ঐ লক্ষণ—দিবারাত্র চিন্তা, মন খারাপ, বন্ধু-বান্ধব বিষবৎ। বাবার ডাক্তারী শাস্ত্র খুলিলে বোধ হয় ইহার ঔষধ মিলিতে পারে। কিন্তু সে ঔষধ সুধা কিছুতেই খাইবে না। কারণ এ রোগের যন্ত্রণা থাকিলেও রোগ সারাইতে ইচ্ছা করে না। সুধার মনে পড়ে, যখন নূতন কান ফুটাইয়া ফুল পরিয়াছিল, কানে খুব লাগিত। তবু তো সুধা ফুল দোলাইতে ছাড়ে নাই। মনোজ বাতাসে তাহার চুলের গন্ধ পায়। তাহার চুলের গন্ধ বুঝি এতদূর যাইতে পারে! পাগল! নিশ্চয় পাশের বাড়ির কোন মেয়ে সর্ব্বাঙ্গে এসেন্স ঢালিয়া মনোজের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে। মনোজকে সাবধান করিয়া দিতে হইবে। মনোজের সন্দেহ দেখিয়া সুধার হাসি পায়, ভালও লাগে। তাহার জন্য একজন দিবারাত্র চিন্তা করিতেছে, তাহাকে না দেখিয়া একজনের জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিতেছে, পাছে তাহাকে হারাইতে হয়, এই ভয়ে একজনের উৎকণ্ঠার অন্ত নাই—ভারী ভাল লাগে ইহা ভাবিতে। প্রেমের দেবতা অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি, হঠাৎ একজনের মূল্য আর একজনের কাছে কত অসম্ভবরূপে বাড়াইয়া দেয়।

অনেকদিন পরে সুধা সেদিন বিকালবেলায় ছাদে উঠিল। দেখিল, ভূষণবাবুর তেতলার ঘর আবার খোলা হইয়াছে। বউটির মৃত্যুর পর অনেকদিন বন্ধ ছিল। একজন বৃদ্ধা সেই ঘরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। সুধা শুনিয়াছে, ভূষণবাবুর মা, কাশীতে পুণ্যসঞ্চয় দিন কয়েকের জন্য স্থগিত রাখিয়া, বিপত্নীক পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছেন। বৃদ্ধার

বয়স হইলেও শরীর বেশ শক্ত ও পোক্ত, লম্বা দোহারা গঠন, মাথার চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া ছাঁটা, কোমর হইতে দেহের উপরের ভাগটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া আছে, একটুখানি খোঁড়াইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা, ঢেঁকিতে পা দিবার ভঙ্গিতে, আলিসার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমিই রাঘববাবুর মেয়ে, ভূষণ তোমাদের নাম করে।

সুধা নমস্কার করিয়া কহিল, আপনি বুঝি ভূষণবাবুর মা? কবে এলেন?

এসেছি দিন কয়েক, বিপদের খবর পেয়ে আসতে হ'ল, ছেলে অনেক ক'রে চিঠি লিখেছিল। না হ'লে বাবা বিশ্বেশ্বরের ছিচরণ ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না।—বলিয়া বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, ছেলেটার অদেষ্ট! এই বয়েসে দু-দুটো সোনার চাঁদের মত বউ গেল। তাও বলি, হতভাগীদেরও পোড়া কপাল! এমন সোয়ামী, এমন সোনার সংসার দুদিন ভোগ করতে পেলে না!

সুধা বলিয়া ফেলিল, দেখে শুনে আর একটি বউ আনুন।

বৃদ্ধা মৃদু হাস্য করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তার জন্যেই তো এসেছি মা। ভূষণের কিই বা বয়েস! যেটের কোলে চল্লিশে পা দিয়েছে কি দেয় নি, তা ছাড়া ছেলে তো হয় নি, সবগুনোই মেয়ে, রাজত্বি কে ভোগ করবে মা? তবে মা, রূপসী মেয়েতে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে—বড় ঠুনকো, বড় আবদারী। এবার আর রূপ দেখব না, বেশ শক্ত-পোক্ত মাঝারি গোছের মেয়ে আনব, যে সংসার আর সোয়ামী দুই ঘাড়ে তুলে নিতে পারবে।—বলিয়া সুধার দিকে তাকাইয়া বোধ হয় মনে মনে মাপ-জোপ করিতে লাগিলেন।

সুধা মুখ ফিরাইয়া লইয়া মনে মনে কহিল, এ পরের জিনিসে নজর

দিয়ে কি হবে মা? তা ছাড়া তোমাদের সংসার কত বড় জানি না, কিন্তু শুধু ঐ স্বামীকেই ঘাড়ে বইবার মত শক্ত-পোক্ত মেয়ে বাংলা দেশে মিলবে কি?

কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, তোমার মা নাই, না?

সুধা ম্লান মুখে ঘাড় নাড়িল।

বৃদ্ধা কহিলেন, তাই এখনও বাপের কাছটিতে আছ। না হ'লে বয়েস তো তোমার কম হয় নি মা। বোধ হয়—

সুধা কহিল, সতরো।

বৃদ্ধা কহিলেন, তাই কম কি মা! আমাদের কালে বারো বছর পেরোলেই বাপ-মায়ের অন্নজল উঠে যেত, আজকাল চব্বিশেও চাড় পড়ে না। তা মা, তোমাকে আমার ভারী ভাল লাগছে। তোমার মত যদি একটি মেয়ে পেতাম!

সুধা কথা উল্টাইয়া দিয়া কহিল, ভূষণবাবুর ছোট ছেলেটিকে কে দেখছে?

একজন ঝি। বউমা বেঁচে থাকতেই এই ব্যবস্থা ছিল। নিজের রোগ নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা প'ড়ে থাকত তো, ছেলেপিলে দেখবে কখন?

সুধা কহিল, সত্যি, বেচারী ভারী ভুগত, ভূষণবাবু খুব সেবা করতেন।

বৃদ্ধা প্রবলভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, সেদিকে আমার ভূষণের ত্রুটি পাবে না মা। বউদের ভারী আদর! এ কি বুড়ী মা যে, ম'রে গেলেও মনে পড়বে না।—বলিয়া সক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, শুধু সেবা! কত টাকা খরচ করেছে! আজ পুরী, কাল ভুবনেশ্বর, তার ওপর এই কলকাতা শহরে মাসে মাসে তিন চারশো টাকা খরচ ক'রে আজ এক বছর ধ'রে ব'সে আছে।

সুধা কহিল, তা আপনারা তো খুব বড়লোক শুনেছি।

আত্মপ্রসাদ ও গর্ব্বের আভায় বৃদ্ধার খাঁজ-কাটা মুখও কিঞ্চিৎ মসৃণ হইয়া উঠিল। কহিল, ঠিকই শুনেছ মা। যদি যাও তো নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কর্ত্তারা যা রেখে গেছেন, ভূষণ অমন সাতটা বউয়ের চিকিচ্ছে করালেও কিছু হবে না, তবু দেখাশুনা করতে হবে মা। ভূষণ যে ম্যানেজার-গোমস্তার হাতে সব ছেড়ে চুপচাপ ব'সে আছে।

সুধা কহিল, তা এখন তো গেলেই পারেন।

বৃদ্ধা হাসিয়া কহিলেন, যাবে মা। তবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যেতে ছেলের মন সরছে না। একটি তোমার মত লক্ষ্মী—

সুধা বাধা দিয়া কহিল, দেরী হয়ে গেছে, নীচে যাই, বাবা অনেকক্ষণ একা আছেন।

বৃদ্ধা সস্নেহে কহিলেন, যাও মা। দুপুরবেলা সময় পাও তো আমাদের বাড়িতে এস না কাল।

সুধা নীরস কণ্ঠে কহিল, আমার তো সময় হয় না।

বৃদ্ধা কহিলেন, বেশ, আমিই না হয় যাব মা।

তার পরদিন বিকালবেলায় বৃদ্ধা বেড়াইতে আসিলেন। বিশু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আগেই খবর দিল, ভূষণবাবুর মা আসছেন। খুব বড়লোক, বেশ ক'রে খাতির ক'র।

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল, এলেই বা। বড়লোক ব'লে সাষ্টাঙ্গে প'ড়ে থাকতে হবে নাকি? যা করবার আমি করব, তুমি নীচে যাও।

বিশু কাঁচুমাচু মুখে কহিল, যাচ্ছি, মানে ভূষণবাবু খুব বড়লোক কিনা, দোয়ানিবাবুর মত কিপটে নয়, একটা টাকা দিয়েছে আমাকে।

সুধা আগাইয়া আসিয়া বৃদ্ধাকে অভ্যর্থনা করিল এবং নিজের ঘরে লইয়া গিয়া কহিল, বসুন।

বৃদ্ধা চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন, বসছি মা। এসেছি যখন, বসতে হবে বইকি। কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত নয় কি?

দেখা করবেন? আচ্ছা, আসুন।—বলিয়া সুধা বৃদ্ধাকে লইয়া রাঘব-বাবুর ঘরে প্রবেশ করিল।

রাঘববাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া গড়গড়া টানিতেছিলেন। সুধা মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, বাবা!

রাঘববাবু চোখ না খুলিয়াই জবাব দিলেন, কি মা?

ভূষণবাবুর মা এসেছেন।

রাঘববাবু সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, আপনি এসেছেন! বসুন। ওরে সুধা, একটা বসতে কিছু দে মা। ভূষণবাবুর মুখে শুনেছিলাম—ভারী অনুগ্রহ আপনার। ক্ষোভের সহিত কহিলেন, নড়তে পর্য্যন্ত পারি না—না হ'লে আমারই উচিত দেখা করা, খোঁজ-খবর করা। কি করব, ভগবান মেরেছেন।—বলিয়া মুখটি করুণ করিয়া তুলিলেন।

বৃদ্ধা স্ত্রী-জনোচিত মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, ভূষণের মুখে আপনার প্রশংসা আর ধরে না—বলে, খুব স্নেহ করেন আমাকে—ঠিক বাপের মত।—বলিয়া মনে মনে বোধ করি জিব কাটিলেন।

রাঘববাবু ঘাড়টি ঈষৎ নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, আমি আর বেশি কি করি! ভূষণের মত ছেলে যার কাছে যাবে, সেই স্নেহ করবে, ও রকম সৎ ছেলে আজকাল দেখা যায় না।

রাঘববাবুর মুখে ভূষণের প্রশংসা শুনিয়া সুধা বিরক্ত হইল। মনে মনে বলিল, বাবার আজকাল শুধু ভূষণ আর ভূষণ, মনোজের নাম পর্য্যন্ত করেন না।

বৃদ্ধা একবার সুধার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া কণ্ঠস্বর একটু

উচ্চগ্রামে চড়াইয়া কহিলেন, বেশ তো। আসুন, বদলাবদলি করি। রাঘববাবু বিস্মিত নয়নে তাকাইলেন। বৃদ্ধা হাসিয়া কহিলেন, আপনারা তো আমাদের পালটা ঘর, আমার ছেলেটিকে আপনি নিন, আপনার মেয়েটিকে আমায় দিন।

এতক্ষণে বৃদ্ধার বক্তব্য বুঝিতে পারিয়া রাঘববাবুর সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল ও চোখ দুইটি কৃতজ্ঞতায় সজল হইয়া উঠিল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, গরিবের ওপর এ যে অসম্ভব দয়া! পুলকিত কণ্ঠে বৃদ্ধা কহিলেন, দয়া নয়, বোস মশাই। আপনার মেয়েটিকে আমার বড় ভাল লেগেছে, ছাড়তে ইচ্ছে করছে না আর।

সুধা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, মনে হইল, প্রতিবাদ করে; কিন্তু স্ত্রীলোকের চিরন্তন লজ্জা তাহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিল।

সেই রাত্রে সুধা মনোজকে তাড়া দিয়া চিঠি দিল।

দিন দুই পরে—হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া রাঘববাবুর জ্বর আসিল। সামান্য সর্দ্দিজ্বর ভাবিয়া রাঘববাবু নিজেই হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া খাইতে লাগিলেন। কিন্তু জ্বর দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং বুকের সর্দ্দি জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাঘববাবু সুধাকে কহিলেন, নিমোনিয়া। আর বাঁচব না মা। সুধা ভূষণকে ডাকাইয়া হাতের কয়েকগাছি চুড়ি তাহাকে দিয়া কহিল, এগুলো বিক্রি ক'রে দিতে পারেন?

ভূষণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

বাবার চিকিৎসা করাতে হবে—হোমিওপ্যাথিতে হবে না।

ভূষণ চুড়িগুলা ফিরাইয়া দিয়া তিরস্কারের স্বরে কহিল, ছিঃ সুধা! তোমার বাবার চিকিৎসা করানো কি শুধু তোমারই দায়িত্ব, আমার নয়?

সুধা নীরস স্বরে কহিল, না না ভূষণবাবু, ওসব কথা ছেড়ে দিন,

আমার বাবার দায়িত্ব আমার ওপরেই থাক, আর কারও ভাগ নিয়ে কাজ নেই।

ভূষণ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ কথা! সব ঠিকঠাক, এখন বলছ, ভাগ নিয়ে কাজ নেই! দুদিন পরে তো সবটাই নিতে হবে। যাকগে, এখন ও নিয়ে গোলমাল ক'রে লাভ নেই, তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে ব'স, আমি ডাক্তার আনছি।—বলিয়া প্রতিবাদের অবসর না দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুধাও অসুস্থ হইয়া পড়িল। সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে, কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না। হঠাৎ একদিন দুপুরে ভাত খাইতে বসিয়া বমি করিয়া ফেলিল। ঝি মোক্ষদা তাড়াতাড়ি ধরিল ও মুখ ধোওয়াইয়া, বিছানায় শোওয়াইয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, দিদিমণি, একটা কথা বলব? সুধা তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিল। ঝি একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, তোমার রোগ আমি ধরেছি। সুধা জবাব দিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। মোক্ষদা ফোকলা মুখে ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার খোকা হবে। সুধা বিস্ময় ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, তাই নাকি? মোক্ষদা কহিল, হ্যাঁ, আমি এ রকম অনেক দেখেছি—ঠিক বলছি আমি। বিবর্ণ মুখে সুধা কহিল, কি হবে মোক্ষদা?

এক মুহূর্ত্তে মোক্ষদা দাসীত্বের নীচু ধাপ হইতে সখিত্বের সমপর্য্যায়ে উঠিয়া আসিল; আশ্বাস দিয়া কহিল, কি আবার হবে? দাদাবাবুকে আসতে লিখে দাও। বিয়ে হয়ে গেলে আবার কিসের ভাবনা!

সেই রাত্রেই ভূষণের মা রাঘববাবুকে দেখিতে আসিলেন, সঙ্গে ভূষণ।

রাঘববাবু চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

রাঘব ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত কণ্ঠে কহিলেন, ভাল নয়, বার্দ্ধক্যের বন্ধু না নিয়ে যাবে না বোধ হয়।

বৃদ্ধা আন্দাজে কথাটা বুঝিয়া কহিলেন, এত শিগগির গেলে চলবে কেন? মেয়ের বিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

রাঘববাবু কপালে হাত দিয়া কহিলেন, অদৃষ্টে থাকলে হবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, সুধারও শরীর ভাল নেই।

ভূষণ শতরঞ্চির উপর বসিয়া ছিল, একেবারে ফুটবলের মত লাফাইয়া উঠিয়া হুঙ্কার দিল, ভাল নেই মানে?

রাঘববাবু কহিলেন, কি জানি! সারাদিন কিছু খায় নি, এমনই শুয়ে আছে।

আচ্ছা, দেখছি আমি।—বলিয়া ভূষণ সুধার কক্ষে চলিল।

ভূষণ যাইতেই বৃদ্ধা কহিলেন, আমার মনে হয়, আশীর্ব্বাদটা হয়ে যাওয়াই ভাল, দিন চার পরে ভাল দিন আছে, ভূষণ পাঁজি-দেখেছে।

রাঘববাবু কহিলেন, বেশ তো।

বৃদ্ধা কহিলেন, কার্ত্তিক মাসে তো বিয়ে হবে না, অঘ্রাণের গোড়াতেই হবে। তা করতে করতে আপনিও সেরে উঠবেন।

দুপুর হইতে সুধা তাহার ঘরটিতে নির্জ্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া ছিল। ঘুমায় নাই, ঘুমাইতে পারে নাই। ক্রমাগত চিন্তার বুদ্বুদ উঠিয়া তাহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছে,—একবারও স্থির হইতে দেয় নাই। মোক্ষদার রোগনির্ণয় শুনিয়া প্রথমটা সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর মোক্ষদার প্রবোধ-বাক্যে তাহার মন সায় দিয়া সান্ত্বনা মানিয়াছিল। সত্যই তো! ভাবনার কারণ কি! তাহাদের তো সত্যকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে—শুধু গোটা কয়েক মামুলী মন্ত্র পড়া বাকি। দেহ ও মনের একান্ত মিলনই তো বিবাহ। সেদিক

দিয়া তাহাদের কোন ত্রুটি আছে নাকি? তবে আর লজ্জা কিসের? হাঁ, ভয় আছে বটে—যদি মনোজ না আসে, যদি তাহাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করে? কিন্তু মনোজ কি তাহা করিবে? মনোজের মুখের হাসি, চোখের দীপ্তি, আলিঙ্গনের আকুলতা এবং চুম্বনের প্রগাঢ়তা সমস্বরে আশ্বাস দেয়—মনোজ আবার আসিবে। তাহা ছাড়া সেদিন তো সে চিঠিতে লিখিয়াছে যে, যদি তাহার বাবা ও মার মত না হয়, তাহা হইলেও সে সুধাকে বিবাহ করিবে, সুধা যেন নিশ্চিন্ত থাকে। সুধা তো নিশ্চিন্তই আছে, কিন্তু আর বেশি দেরি করা উচিত হইতেছে না।

সুধা মনোজকে চিঠি লিখিল—বাবার ভারী অসুখ, আমারও অসুখ, পত্র পাঠ চ'লে এস।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে মোক্ষদা খবর লইতে আসিল। মোক্ষদাকে দেখিয়া তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—সে যেন তাহার জীবনের একটি অতি গোপন রহস্য জানিয়া ফেলিয়াছে। মোক্ষদা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কেমন আছ গো দিদিমণি? সুধা গম্ভীর মুখে কহিল, ভাল আছি। তারপর চিঠিটি তাহার হাতে দিয়া কহিল, এই চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দিও তো। জান তো, কেমন ক'রে ফেলতে হয়? মোক্ষদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া, ঘাড় কাত করিয়া কহিল, সব জানি দিদিমণি। দাদাবাবুকে নিখলে বুঝি? দাদাবাবু চিঠি পেয়েই চ'লে আসবে, তুমি কিছু ভেব নি। মোক্ষদাকে বিদায় দিয়া সুধা আবার ভাবিতে সুরু করিল। মনোজ আসিয়া কি বলিবে, কে জানে! যা দুষ্টু মানুষ, কত কি ঠাট্টা করিবে! এবারে সে স্পষ্ট বলিবে, আর দেরি নয় বাপু। বাবা-মার মত হোক আর না হোক, বিয়েটা হয়ে যাক। না হ'লে লোকে কি বলবে? বাবা-মাকে এত ভয় কিসের মনোজের? মনোজ যদি আপত্তি করে তো সুধা শুনিবে না, চোখের জল টানিয়া বাহির করিবে। তাহা হইলেই মনোজ জব্দ হইবে। একবার সে মুখভার করিয়াছিল বলিয়া মনোজের অস্থিরতার কথা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে মনোজ সব করিতে পারে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা এ বাড়িতে থাকিবে না, অন্য একটা ভাল বাড়ি ভাড়া করিবে। সেখানে কাহারও কর্তৃত্ব চলিবে না, এমন কি মনোজেরও না। একটি কথা

বলিতে আসিলে সে এমন ধমক দিবে যে, মনোজ মুখটি চুন করিয়া থাকিবে। তারপর খোকা আসিবে—মনোজের মত সুন্দর, অমনই চঞ্চল, অমনই দুষ্টু। তখন আর মনোজের দিকে মন দেওয়ার সময় থাকিবে না, খোকাই সমস্ত দখল করিয়া বসিবে, খোকারই খবরদারি করিবার জন্য তাহার দিবারাত্র নিশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিবে না। এমনই চিন্তা করিতে করিতে কখন দিনের আলো নিবিয়া আসিল, সুধা তাহা বুঝিতেও পারিল না। মোক্ষদা আসিয়া তাগিদ দিল, ও দিদিমণি! ওঠ গো, গা হাত ধোও।

আজ আর ভাল লাগছে না।—বলিয়া সুধা শুইয়াই রহিল। সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দময় সুরটি এতক্ষণ মনের মধ্যে বাজিতেছিল, তাহা থামিয়া গিয়া একটি হতাশাময় সুর বাজিতে লাগিল। যদি মনোজ আর না ফিরিয়া আসে? যদি তাহার হৃদয়ের সমস্ত মধু লুণ্ঠন করিয়া মধুকর পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়, তবে? যাহারা এতক্ষণ তাহাকে সরবে আশ্বাস দিতেছিল, তাহাদের মুখের পানে তাকাইতেই, তাহারা ম্লান ও নত মুখে নীরব হইয়া রহিল। মনোজ হয়তো আসিবে না। মনোজ না আসিলে সে কি করিবে? ভূষণবাবুকে বিবাহ করিবে? ছিঃ ছিঃ! এতবড় অন্যায়, এতবড় অবিচার সে করিতে পারিবে না। বাবা যাহাই বলুন। কিন্তু তাহার পর? বাবা যদি সারিয়া না উঠেন, তবে? পৃথিবীতে কেহ আপনার বলিতে থাকিবে না। সমাজের দুর্য্যোধনের দল যখন তাহার শেষ লজ্জাবস্ত্রটুকু পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইবার জন্য টানাটানি করিবে, তখন সকলে নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়া দেখিবে, অথবা তারিফ করিবে, তারপর যেদিন বিষাক্ত ক্ষতের মত সে সমাজের বুকের উপর দগদগ করিতে থাকিবে, তখন ঘৃণায় ধিক্কার দিবে।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

জল

[একটি প্রকাণ্ড কাচ-পাত্রের অভ্যন্তর। পাত্রটি ফ্লাস্ক-জাতীয় এবং এত বড় যে, তাহার সমস্তটা দেখা যাইতেছে না। যতটুকু দেখা যাইতেছে, তাহা বহুগুণ বৃহদীকৃত অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। দৃশ্যমান অংশের দুই পার্শ্বে দুইটি মোটা সাদা কীলকের মত বস্তু দেখা যাইতেছে, এ দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্‌ট্রিক নোড। কাচপাত্রটির ভিতরে কোটি কোটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদের সকলকে দেখা যাইতেছে না। বৃহদীকৃত অংশটুকুর মধ্যে যখন যাহারা আসিতেছে, তাহাদেরই কেবল দেখা যাইতেছে। নাটকীয় প্রয়োজনে পরমাণুগুলিকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করা হইল। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিভিন্নতাও তাহাদের পরিচ্ছদের বর্ণ-বিভিন্নতা দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদ শ্বেত এবং অক্সিজেনদের পরিচ্ছদ গৈরিক বর্ণের। হাইড্রোজেনদের পরিচ্ছদে হাইড্রোজেনের প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনসমন্বিত রাসায়নিক রূপটি লাল সুতা দিয়া অঙ্কিত থাকিবে; তাহাদের পতাকাও এই চিহ্ন বহন করিবে। অক্সিজেনদেরও তদ্রূপ।]

কয়েকটি হাইড্রোজেন-পরমাণু তর্ক করিতে করিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

১ হা। আমাদের ধর্ম্মই আলাদা, সে কথা বললে চলবে কেন?

২ হা। ধর্ম্ম আলাদা সে কথা কে অস্বীকার করছে, কিন্তু আমরা, যে কারণেই হোক, এক জায়গায় এসে জুটেছি যখন—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সে তো ঠিকই! বলতে বাধল না তোমার কথাটা, গলায় আটকে গেল না? ছি ছি ছি ছি!

৩ হা একটু কাচুমাচু হইয়া গেলেন

২ হা। [১ হা-কে] আহা, তুমি কথাটা বুঝছ না তলিয়ে। আমাদের সঙ্গে অক্সিজেনদের অনেক বিষয়ে অমিল আছে তা ঠিক, ও ব্যাটারা পাজির পা-ঝাড়া তাও ঠিক; কিন্তু এটাও তো ঠিক কথা, আমরা, যে কারণেই হোক, একসঙ্গে এসে জুটেছি এবং একসঙ্গে বসবাসও করতে হচ্ছে। কথাটা বুঝে দেখ তলিয়ে।

১ হা। [উষ্মাভরে] আমি বুঝতে চাই না। [৪ হা-কে] তুমি চাও?

৪ হা। না।

১ হা। [৫ হা-কে] তুমি চাও?

৫ হা। আমি! আমি বাবা সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না, যে কদিন বাঁচব, যেখানেই থাকি চুপচাপ থাকব।

১ হা [চটিয়া] তার মানে? ভিদভিদে স্বার্থপর পাজি তুমি।

৫ হাসিভরা দৃষ্টিতে ৩ হা-র দিকে চাহিলেন

৩ হা। [১ হা-কে] আরে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি তোমার পক্ষে আছি। ল'ড়ে যাও ব্যাটাদের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে। কি করতে চাও তুমি?

১ হা। মীটিং।

২ হা। মীটিং! আমি ভাবছিলাম, বুঝি ঘোরতর কিছু করবে। মীটিং করতে আমিও রাজি আছি। ওরাও করছে।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। সবাই রাজি আছ তা হ'লে?

৭ হা এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, গলা-খাঁকারি দিয়া আগাইয়া আসিলেন

৭ হা। [১ হা-কে] আজ হঠাৎ তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন বল তো?

২ হা। আসল কথাটা খুলে বল দিকি ভাই?

৬ হা। যাই কারণ হোক, তোমার স্বপক্ষে আমি আছি, বল তুমি খুলে—আজ ক্ষেপবার কারণটা কি?

৫ হা। আমারও কৌতূহল হচ্ছে, যদিও আমি কারও সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

১ হা চক্ষু পাকাইয়া নিরুত্তর রহিলেন

৪ হা। মীটিং করবার আগে কারণটা শোনা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৭ হা। কারণটা বল, সবাই বুঝে দেখি। ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! এতদিন তুমি কিছু বল নি, আজ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলে, এর মানেটা কি! ধাঁ ক'রে একটা মীটিং করলেই হ'ল না তো! [অর্থভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন]

২ হা। আমার মতে মীটিং জিনিসটাই ধাঁ ক'রে করা যায়। আর কিছু ধাঁ ক'রে করা শক্ত আমাদের পক্ষে।

৭ হা। কি নিয়ে মীটিং করবে, কেন মীটিং করবে, আজই বা হঠাৎ কেন মীটিং করবে, এর কথাতেই বা কেন মীটিং করবে—এ সব-গুলি পরিষ্কার না হ'লে—

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা এইবার কথা কহিলেন

১ হা। মীটিং করতে চাই নিজের জন্যে নয়, ধর্ম্মের জন্যে। আমাদের ধর্ম্ম আজ বিপন্ন।

২ হা। [সবিস্ময়ে] তাই নাকি!

১ হা। [৪ হা-কে] ধর্ম্ম বিপন্ন নয়?

৪ হা। নিশ্চয়।

১ হা। কে না জানে, আজ আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন! কে না জানে, ধর্ম্মকে বিপন্ন হতে দিয়েছি ব'লেই আমরাও আজ বিপন্ন, আমরাও আজ লাঞ্ছিত, আমরাও আজ অপমানিত! কে না জানে, এই ধর্ম্মকে যতদিন আমরা আমাদের জীবনে তার সম্মানিত সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে না পারব, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই! কে না জানে, আমাদের অপমানিত আত্মা যে বন্ধ কারাগৃহের রুদ্ধ দ্বারে

মাথা কুটে মরছে, সে কারাগৃহকে ধূলিসাৎ করতে পারে কেবল আমাদের ধর্ম্মবল! কে না জানে, যে মর্ম্মন্তুদ বেদনার কুশাঙ্কুর অহরহ আমাদের নগ্ন চরণতলকে ক্ষতবিক্ষত করছে, তার একমাত্র—

সবেগে অষ্টম হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রবেশ

৮ হা। সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অনেকেই। কি? কি?

৮ হা। [বুক চাপড়াইয়া] হায় হায়, আমার ষোল বছরের জোয়ান মেয়েকে কতকগুলো অক্সিজেন-গুণ্ডা এসে ধ'রে নিয়ে চ'লে গেল। হায় হায় হায় হায়!

বুক চাপড়াইতে লাগিল

৫ হা। থানায় খবর দিয়েছ?

৮ হা। সেখানেই যাচ্ছি, কিন্তু দারোগাও যে অক্সিজেন।

৪ হা। তবু যাও, থানায় খবর দেওয়াটা দরকার।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

৮ হা চলিয়া গেল

১ হা। বন্ধুগণ, এখনও কি সন্দেহ আছে যে, আমাদের ধর্ম্ম বিপন্ন?

২ হা। দুটি বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

১ হা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ২ হা-র পানে চাহিলেন

১ হা। কি কি?

২ হা। আমার প্রথম সন্দেহ, তুমি এই যে আজ হঠাৎ 'ধর্ম্ম ধর্ম্ম' ব'লে চেঁচিয়ে একটা হৈ চৈ বাধাবার চেষ্টায় আছ, এর মূল কারণ ধর্ম্ম নয়, এর মূল কারণ তোমার ছেলে চাকরি পায় নি, একটি অক্সিজেন-যুবক পেয়েছে। আমার দ্বিতীয় সন্দেহ, এই যে হাইড্রোজেন-কুমারীটি অক্সিজেন-গুণ্ডা কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে, এর মূল কারণ ওর বাপটি অপদার্থ। খুব সম্ভবত ওই মেয়েটির কাছ থেকে ওই গুণ্ডার

দল প্রণয়ঘটিত কোনরূপ ইসারাও পেয়েছিল, তা না হ'লে দিনে দুপুরে—

১ হা। তুমি পাষণ্ড।

২ হা। সম্ভবত। কিন্তু আমার যা সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে, অকপটে আমি তা বলতে বাধ্য এবং এখানকার লোকাল-বোর্ডের চেয়ার্‌ম্যান হিসেবে ধর্ম্ম নিয়ে দলাদলি করবার পক্ষপাতীও আমি নই।

৩ হা। সে তো ঠিকই।

১ হা। আবার বলছি, তুমি পাষণ্ড। আমাদের ভোটের জোরে আজ তুমি লোকাল-বোর্ডের চেয়ার্‌ম্যান হয়ে অক্সিজেনদের চাকরি দিচ্ছ, লজ্জা করে না তোমার?

৫ হা। [৬ হা-কে জনান্তিকে] কোণ-ঠাসা করেছে।

৬ হা। [চুপি চুপি] করবে না, অতি পাজি লোক যে! কিছুতেই কন্ট্রাক্টটা আমায় দিলে না হে।

২ হা। চুপি চুপি বললেও তোমার কথাটা শুনতে পেয়েছি। দেখ, লোকাল-বোর্ডের চেয়ার্‌ম্যান হিসেবে আমি ন্যায়বিচার করিতে বাধ্য। আমায় সব দিক ভেবে তবে তো—

৭ হা। [হাসিয়া] কিন্তু ভায়া, স্বজাতির উপকার করা কি ন্যায়ধর্ম্মের বাইরের জিনিস? এই যে আমরা না খেয়ে না দেয়ে তোমার ভোটের জন্যে চতুর্দ্দিক তোলপাড় ক'রে বেড়ালাম, এইটেই কি তার প্রতিদান?

২ হা। আমায় কি করতে বল তোমরা। সমস্ত অক্সিজেনদের আপিস থেকে তাড়িয়ে দোব?

১ হা। নিশ্চয়, পত্রপাঠ—

৭ হা। না গো, না, সবাইকে তাড়িয়ে দিতে যাবে কেন, তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখো, এই আর কি।

২ হা। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আমি—

১ হা। কিছুই করছ না তুমি। তুমি ভেবেছ, অক্সিজেনদের খোশামোদ ক'রে হাতে রাখতে পারলে আগামী ইলেক্‌শনে তোমার সুবিধে হবে। মনেও স্থান দিও না তা, ওরা সাপের জাত, সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে।

৬ হা। নিঃসন্দেহে।

২ হা। কিন্তু আমাদের মধ্যেই বা একতা কই, আমাদের মধ্যে খুব বড় একটা দল অক্সিজেনদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করে। তারা বিশ্বপ্রেমিক।

১ হা। তারা স্বার্থপর। তারা দুদলেরই সুবিধেটা পুরোমাত্রায় ভোগ করতে চায় এতটুকু স্বার্থত্যাগ না ক'রে। তারা সুবিধেবাদী, তারা পাঁঠার মাংসটি খেতে চায়, কিন্তু পাঁঠা কাটা দেখতে পারে না, আড়ালে পাঁঠাটি অপরকে দিয়ে কাটিয়ে নিতে চায়।

৬ হা। [১ হা-কে] অত কথায় দরকার কি, তুমি মীটিং করতে চাও, কর না হে, আমি তোমার স্বপক্ষে আছি। [৪ হা-কে] তুমি নেই?

৪ হা। নিশ্চয়।

৭ হা। আমার কিন্তু মনে হয়, ভেবে দেখা উচিত। ধাঁ ক'রে কিছু একটা—

২ হা। মীটিং করতে আমার আপত্তি নেই। সময়ে খবর পেলে আসব, এখন আমি চলি। এস হে।

২ হা ও ৩ হা চলিয়া গেলেন

৬ হা। [২ হা-র গমনপথের দিকে চাহিয়া] অতিশয় দাম্ভিক লোক। মোসায়েবটিও জুটেছে বেশ।

৭ হা। [উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া] গোড়ায় গোড়ায় বলি নি আমি! গরিবের কথা বাসী হ'লে মিষ্টি লাগে ভায়া।

৫ হা। [সবিস্ময়ে] আপনিই তো মশাই, ওকে ভোট দেবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন, এখন আবার বলছেন—

৭ হা। আহা, সে আগেই বলেছিলাম আমি, ইলেক্‌শনের আগে—অনেক আগে—[১ হা-কে দেখাইয়া] ও সব জানে।

৫ হা। এইবার ব্যাপারটা খুলে বল।

১ হা। এর পরের ইলেক্‌শনে আমি দাঁড়াব।

৪ হা। নিশ্চয়।

৬ হা। আগে মীটিংটা ক'রে ফেল।

৭ হা। তুমি দাঁড়ালে তো বাঁচি আমরা। তাই তো আমি গোড়ায় জানতে চাইছিলাম, কি নিয়ে মীটিং করবে, কেন মীটিং করবে, এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। তা ছাড়া, ও লোকটার সামনে খোলাখুলি-ভাবে তোমার কথায় সায় দিতেও পারছিলাম না। বোঝই তো।

নেপথ্যে বাদ্যভাণ্ড ও কলরব শোনা গেল

৫ হা। [দূরের দিকে চাহিয়া] একদল অক্সিজেন এই দিকে আসছে হে, প্রসেশন ক'রে বাজনা বাজিয়ে।

১ হা। তাই নাকি ?

৬ হা। হ্যাঁ হে, একটি দঙ্গল।

১ হা। খুব সম্ভব মীটিং করবে। তালে ঠিক আছে ওরা। অথচ আমরা—

৭ হা। চল, একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে শোনা যাক, কি করে ব্যাটারা।

হাইড্রোজেন-পরমাণু দল অন্তর্হিত হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গৈরিক-পতাকাধারী গৈরিক-পরিচ্ছদ-পরিহিত অক্সিজেন-পরমাণুগণের প্রবেশ। একটি অক্সিজেন-যুবকের স্কন্ধ হইতে হার্মোনিয়ম বিলম্বিত, আর একজনের মুখে বাঁশী, বাকি কয়েকজন জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছেন। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে আছেন। হাইড্রোজেন-পরমাণুদের অনুমান সত্য, একটি সভাই হইবে। একজন মাল্যশোভিত সভাপতি এবং ঠিক পিছনেই তাঁহার আসন বহন করিয়া একটি যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। নিকটেই আর একজনের মস্তকে একটি পাট-করা শতরঞ্জি দেখা যাইতেছে। জাতীয় সঙ্গীত চলিতে লাগিল।

—জাতীয় সঙ্গীত—

আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন
আমরা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।
নির্ম্মল করি বিষাক্তে
বিষ্ণুভক্তে, কি শাক্তে
তীব্র দাহনে জ্বালাই আমরা
গলাইয়া করি ঢালাই আমরা
অক্‌সাইডের সনাতন ছাঁচে হে—
গ্রাহ্য করি না কেবা কিবা বলিবেন।
আমাদের কথা ভগবান স্মরিছেন।
আমরা শুদ্ধ
আমরা বুদ্ধ
আমরা আর্য্য, আমরা অক্সিজেন।

সঙ্গীত শেষ হইয়া গেলে সভাপতির আসনটি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল, শতরঞ্জিটিও পাতা হইল। দেখিতে দেখিতে সভা জমিয়া উঠিল, যাঁহারা বসিতে পাইলেন বসিয়া পড়িলেন, যাঁহারা পাইলেন না দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখা গেল, সভায় কেবল অক্সিজেন-পরমাণু নয়, হাইড্রোজেন-পরমাণুও আছেন। ১ হা, ৪ হা, ৫ হা, ৬ হা এবং ৭ হাও সভাপতির পিছন দিকে ভিড়ের মধ্যে আসিয়া জুটিলেন।

সভাপতি। আজ সকাল থেকে ক্রমাগত সভা ক'রে বেড়াচ্ছি, আরও দু জায়গায় বাকি আছে, সুতরাং আপনাদের যার যা বলবার আছে, একে একে চটপট ব'লে যান।

একটি অক্সিজেন-পরমাণু উঠিয়া দাঁড়াইলেন

আপনি বলবেন ? বেশ, বলুন।

১ অ। আমরা সকলেই এক বিরাট কারাগারে বন্দী, আমাদের বাহির

হইবার পথ নাই, দুর্ভেদ্য কারা-প্রাচীর নিষ্ঠুর নিশ্চলতায় আমাদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমাদের কারা-প্রাচীরের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুর্ভেদ্য হইলেও স্বচ্ছ। ইহার ভিতর দিয়াই আমরা আকাশ দেখিতে পাই, মহাকাশচারী সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের জ্যোতির্ম্ময় অভিযান বিস্মিত নয়নে চাহিয়া দেখি, ছুটিয়া বাহির হইতে চাই, কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসি, মনে হয়—

সভাপতি। সংক্ষেপ করুন।

১ অ। মনে হয়, কবে ওই মহাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত স্বচ্ছন্দে সঞ্চরণ করিতে পারিব! মনে হয়, কবে আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের অবসান হইবে! মনে হয়—

২ অ। [ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে] আরে কচু খেলে যা, তুমি আগে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তার কথাটা বল না, আকাশ নিয়ে পরে মাথা ঘামিও।

সভাপতি। [শান্ত কণ্ঠে] সংক্ষেপে কাজের কথাটাই আগে বলুন।

১ অ। আচ্ছা বেশ।

গলা-খাঁকারি দিয়া বক্তৃতার মোড় ফিরাইলেন

আপনারা সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আজকাল ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাগুলির কি ভীষণ অবস্থা। প্রায় প্রতি রাস্তাতেই গ্রীষ্মকালে এক হাঁটু ধূলা এবং বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা থাকে। পুলগুলিও মেরামত-অভাবে জীর্ণ। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, কণ্ট্রাক্টারেরা ফাঁকি দিতেছে। এই প্রসঙ্গে সমবেত ভদ্র-মণ্ডলীকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের শতকরা আশিজন কণ্ট্রাক্টার এবং পঁচাত্তরজন ওভারশিয়ারই হাইড্রোজেন-জাতীয়। যোগ্যতা সত্ত্বেও বহু অক্সিজেন-কর্ম্মী দেশের

কাজে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিবার অধিকার হইতে অন্যায়-ভাবে বঞ্চিত হইয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড এবং লোকাল-বোর্ড উভয় প্রতিষ্ঠানেরই চেয়ার্‌ম্যান হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন যখন কর্ণধার, তখন অক্সিজেনদের কর্ণই যে বারম্বার নিপীড়িত হইবে, তাহাতে যদিও বিস্মিত হইবার কিছু নাই, তবু আমরা করদাতাগণ, এই সভায় আমাদের কাতর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি। আশা করি, ইহা নিষ্ফল হইবে না।

২ অ। বাঃ, বেড়ে বলেছ, এইবার ব'স।

সভাপতি। হ্যাঁ, আপনি এবার বসুন।

করতালির মধ্যে ১ অ উপবেশন করিলেন

আর যদি কারও কিছু বলবার থাকে তো বলুন।

৩ অ। [সবিনয়ে] আমাকে এঁরা এই সভায় কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করেছেন, আমিও তাতে সম্মতি দিয়েছি—নিজের বাগ্মিতা জাহির করবার জন্যে নয়, কারণ আমি যে বাগ্মী নই, তা আপনারা সকলেই জানেন ; আমি সম্মতি দিয়েছি কতকটা কর্ত্তব্যের খাতিরেও বটে, কতকটা আপনাদের সাহচর্য্যসুখ লাভ করবার জন্যেও বটে। বর্ত্তমানে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের বিরোধটা অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করেছে, এবং এ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা নানা রকম গুজব বক্তৃতায় ও খবরের কাগজের মারফৎ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়াতে সমস্যাটিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। এই যেমন ধরুন, 'নারী-ধর্ষণের' কথা। কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত প্রতি বৎসরই এই হীন কার্য্য ক'রে থাকে, গত বৎসরে এ সম্বন্ধে যতটুকু সত্য আমি সংগ্রহ করেছি, সেইটুকুই এই সভায় বলব। কোন মন্তব্য আমি করব না, আপনারা নিজেরাই এ থেকে যা বোঝবার বুঝে নিন।

অক্সিজেন কর্ত্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—১২ জন

সধবা—২৪ জন

কুমারী—১৮ জন—মোট ৫৪ জন

অক্সিজেন কর্ত্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৭ জন

সধবা—১৩ জন

কুমারী—৬ জন—মোট ২৬ জন

হাইড্রোজেন কর্ত্তৃক হাইড্রোজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—৩৫ জন

সধবা—২০ জন

কুমারী—১৩ জন—মোট ৬৮ জন

হাইড্রোজেন কর্ত্তৃক অক্সিজেন-নারী ধর্ষণ

বিধবা—২২ জন

সধবা—২১ জন

কুমারী—৫ জন—মোট ৪৮ জন

স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, হাইড্রোজেনরাই অধিকসংখ্যক নারী ধর্ষণ করেছেন, যদিও অক্সিজেনরাও এ বিষয়ে একেবারে নিরপরাধ নন। আমি নিজে অক্সিজেন-জাতীয় হ'লেও সকলের জন্যই লজ্জাবোধ করছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি হাইড্রোজেন-জাতীয়দের এই অধিক অপরাধ-প্রবণতার দিকে কর্ত্তৃপক্ষদের দৃষ্টিও আকর্ষণ না ক'রে পারছি না। এর বেশি আমার আর কিছু বলবার নেই।

করতালির মধ্যে উপবেশন করিলেন

সভাপতি। আর যদি কেউ কিছু বলতে চান তো বলুন এবার।

৪ অ। আমাদের পাড়ার কয়েকটি কুমারী আপনাদের সম্মানার্থে ওরিয়েণ্টাল নাচ গান প্র্যাক্‌টিস্ করছে কদিন থেকে। যদি অনুমতি করেন, তাদের নিয়ে আসি।

সভাপতি। আর কারও কিছু বলবার নেই?

৪ অ। আজ্ঞে না।

সভাপতি। নিয়ে আসুন তা হ'লে। বেশি দেরি করবেন না—আরও দু জায়গায় যেতে হবে আমাকে, মনে রাখবেন।

৪ অ। আজ্ঞে না, এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

ভিড় ঠেলিয়া ছোকরা বাহির হইয়া গেল এবং ক্ষণপরেই গোটা চারেক মেয়েকে আনিয়া হাজির করিল। দেখিবার মত বস্তু চারিটি। তাহারা আসিতেই সকলে সরিয়া গিয়া নাচের আসর করিয়া দিল এবং নর্ত্তকীগণ আধুনিক কায়দায় হাত পা বাঁকাইয়া নাচ গান সুরু করিল

—গান—

নীল আকাশের হাতছানি
জানি জানি জানি গো
বহন করে কোন্ বাণী!
মন ভ'রে যায় উদাসে
বুক ভ'রে যায় হুতাশে
আনমনে গো আনমনে—
খুলে রাখি দখিন বাতায়নখানি॥
নীল আকাশের হাতছানি—
পরাণ চঞ্চল করে—
আঁখির কোণে জল ভরে
হায় হায় হায় হায় রে—
মনের বীণায় যায় কে মধুর মীড় টানি॥
নীল আকাশের হাতছানি—

নৃত্যগীত-অবসানে নর্ত্তকীগণ এক পার্শ্বে উপবেশন করিতেই সভাপতি মহাশয় কালক্ষেপ না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোক অক্সিজেন-বংশাবতংস, ইঁহার বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে অক্সিজেন-কুল উজ্জ্বল।

সভাপতি। অদ্য এই দুর্দ্দিনে অক্সিজেন-বংশীয় পৌরজনকে আমি পুনরায় আমাদের অতীত গৌরবকথাগুলি শুনাইতে চাই। প্রতি সভায় বরাবর আমি এই কথাগুলিই বারম্বার আবৃত্তি করিতেছি এই আশায় যে, আমাদের অতীত গৌরব-কথাগুলি স্মৃতি-পথে সতত জাগরূক রাখিলে আমরা হীনকার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইব। আমরা যে বিশ্বব্যাপারে নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মত বস্তু নহি, বস্তুত আমরা যে আছি, তাহার প্রথম আভাস পাইয়াছিলেন Boyle। কিন্তু তিনি আভাস মাত্রই পাইয়াছিলেন, আর কিছুই পান নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে John Mayow সত্যের কিছু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও আমাদের প্রকৃত রূপটি কি, তাহা ধরিতে পারেন নাই। হয়তো পারিতেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে এবং ফ্লজিস্টন থিওরির প্রাদুর্ভাবে তাহা আর ঘটে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে Scheele এবং Priestley আমাদের বিশিষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া রসায়ন-জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আমাদের প্রকৃত রূপটি, আমাদের চরিত্রের বিশিষ্ট ধর্ম্মটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে আবিষ্কার করিয়াছিলেন মহামতি Lavoisier; এই Lavoisierই সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন যে, দহন মানেই আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠ মিলন। শুনিয়াছি, আমাদের এই মিলনের ফলে Neutral oxide, Acidic oxide, Basic oxide, Amphoteric oxide, Peroxide এবং Compound oxide নামে ছয় প্রকার সঙ্কর কিন্তু প্রবল-শক্তিসম্পন্ন বিবিধ-গুণসমন্বিত রাসায়নিক বস্তুর উদ্ভব হইয়াছে। শুনিয়াছি—

পিছন দিকের ভিড় ঠেলিয়া ১ হা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটি-কুটিল, চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতেছে

১ হা। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

আরও আগাইয়া আসিলেন। সভাপতি মহাশয় উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা পাইয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। সভাপতি হিসাবে হয়তো তিনি ১ হা-কে বাধা দিতে পারিতেন, কিন্তু ১ হা-র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবভঙ্গি দেখিয়া নিরস্ত হইলেন

সভাপতি। [নিরীহভাবে] বেশ, বলুন কি বক্তব্য আপনার। আগে বললে দেখতে শুনতে সব দিক থেকেই শোভন হ'ত। [বসিলেন]

১ হা। আগে কিছু বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শুনে আমার ধমনীতে ধমনীতে সমস্ত রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে।

নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল

সভাপতি। বেশ, বলুন।

১ হা। [উত্তেজিত উদাত্ত কণ্ঠে] নিজেদের মশাল-আলোকে যদি আপনাদের চক্ষু অন্ধ না হ'ত তা হ'লে আপনারা দেখতে পেতেন, নিজেদের ঢক্কা-নিনাদে যদি আপনাদের কর্ণ বধির না হ'ত তা হ'লে আপনারা শুনতে পেতেন যে, হাইড্রোজেন নামেও এক অতি প্রাচীন বনিয়াদী জাতি বহুকালাবধি আপনাদের সান্নিধ্যে বাস করছে; বুঝতে পারতেন, তাদের মহিমাও আপনাদের মহিমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়; স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না যে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসের বুকেও Paracelsus Cavendish এবং Lavoisier-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে; চিন্তা ক'রে শঙ্কিত হতেন যে, আগ্নেয়গিরির উৎক্ষিপ্ত ধূমরাশিতে, সূর্য্যের জলন্ত শিখায়, বায়ুলোকের উর্দ্ধস্তরে হাইড্রোজেন-পরমাণুগণ নিত্য বিরাজমান; অনুসন্ধান ক'রে জ্ঞানলাভ করতেন যে, আমরাও Hydride নামক রাসায়নিক বস্তুর জনক; প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ঙ্গম করতেন যে,—

সহসা ভিতর হইতে একটি পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তাহা আসিয়া ১ হা-র বুকে লাগিল। ১ হা থামিয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই পাদুকাটি উত্তোলন করিয়া পুঙ্গব-কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন

যে ভীরু নপুংসক ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে কাপুরুষের মত এই জুতো ছুঁড়েছেন, তিনি যদি জারজ না হন, তা হ'লে এগিয়ে আসুন তিনি, তাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, চ'লে আসুন।

আস্তিন গুটাইয়া আগাইয়া গেলেন। সভা নিস্তব্ধ

আবার বলছি, চ'লে আসুন।

আরও খানিকটা আগাইয়া গেলেন। আগাইয়া যাইতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় তিনি একজন নর্ত্তকীর পা মাড়াইয়া দিলেন, নর্ত্তকীটি কাতর কণ্ঠে "উঃ, বাবা গো" করিয়া উঠিলেন

জনৈক অ। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে, মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়েছে।

সভায় একটা কলরব হইতে লাগিল। দেখা গেল ৩ অ, যিনি নারী-ধর্ষণ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তিনি গা বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িতেছেন। কলরব ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। জনৈক হাইড্রোজেন-যুবক কর্ত্তৃক আহত হইয়া সভাপতি রক্তাক্ত-কলেবরে ভূশায়ী হইলেন। আরও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ঘুষি, জুতা, ছাতা, ছড়ি, লাঠি এবং অবশেষে ছোরাছুরিও চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই দুই চারিজন রক্তাক্ত হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। কলরবে, আর্ত্তনাদে, গালাগালিতে সমস্ত স্থানটা ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ব্যাপার যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন দড়াম করিয়া একটা শব্দ হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল এবং দুইটি প্ল্যাটিনাম ইলেক্‌ট্রিক নোডের মধ্যবর্ত্তী স্থান তড়িৎশিখায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত হইয়া তড়িৎবৎ মিলাইয়া গেল। আলো জ্বলিলে দেখা গেল, হাইড্রোজেন অক্সিজেন কেহ নাই, একটি টেবিলের উপর অবস্থিত গ্লাসে নির্ম্মল জল টলমল করিতেছে। তড়িৎশিখার যাদুস্পর্শে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন পরমাণুগুলির লক্ষঝম্প জল হইয়া গিয়াছে।

যবনিকা

"বনফুল"

বোলপুরে অক্সফোর্ড

পশ্চিম আসিয়া পূর্ব্বকে বরণ করিল, সিদ্ধি আসিয়া সাধনাকে আলিঙ্গন করিল, অস্তগামী রবিকে অস্তাচলে যাইতে হইল না, অস্তাচল আপনি আসিয়া তাঁহাকে শীর্ষে ধারণ করিল; জগৎ মুগ্ধ হইল। গত ৭ই আগস্ট তারিখে বোলপুরে উক্ষাপারের (অক্সফোর্ড) উদয় হইয়াছিল, জগতের এই দারুণ দুর্দ্দিনে মহামন্বন্তরের মুখে, এ যেন এক মহাস্বস্ত্যয়ন, যেমন কালোচিত, তেমনই শুভশংসী। কিন্তু স্নেহ পাপশঙ্কী; আমাদের ভয় হয়, রবি বুঝি এইবার সত্যই অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন; এ স্বস্ত্যয়ন জগতের কল্যাণসূচক বটে, কিন্তু দরিদ্র আমরা, আমাদের যে ওই একটি ছাড়া আর কিছুই নাই! কেবলই মনে হইতেছে, এ যেন রবীন্দ্রের শেষ সম্মান।

কিন্তু তিনি কি সত্যই শুধু আমাদের? এমন কি আদৌ আমাদের বলিয়া দাবি করাও কি আর সঙ্গত হইবে? অক্সফোর্ড তাঁহাকে যে কারণে তাহার নিজের জ্যোতিষ্ক-সভায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহাতে বাঙালী বা বাংলার কোন গৌরব নাই; কারণ সে তাঁহার বংশ, তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিভা ও শেষে তাঁহার বিশ্বরূপের বন্দনা করিয়াছে। ঠিকই করিয়াছে, খুব বিবেচনা ও সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মহামানবতার প্রতীক; দেশ জাতি বা সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে গেলে, আমাদের ক্ষুদ্র অভিমান চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের আসন নীচু হইয়া যায়। এত বড় যে গান্ধী,

তিনিও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নহেন—তিনিও মানব-সভ্যতার এই মহাসঙ্কটকালে, সেই সভ্যতার রক্ষণ-চিন্তায় আর সকল চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই—বিশ্বধর্ম্ম-প্রচারক হইবার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও পলিটিক্‌স ত্যাগ করিতে পারেন নাই—কোথায় যেন একটু বাধে.—আপনারই কর্ম্মফলে আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সে দ্বিধা নাই; জগতের কল্যাণ-কামনায়, তিনি সেদিনও প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টকে যে মর্ম্মস্পর্শী আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হয়, ভারতের ভাবনাও তিনি পৃথক্ করিয়া ভাবিতে পারেন না; ভাবিলে তাঁহার এই সম্মান, এই মহত্ত্ব থাকিত না। তাই আজ অক্সফোর্ড তাঁহাকে যে বাণীর দ্বারা বরণ করিল, তাহাতে বিশ্বমানবেরই জয় ঘোষণা হইয়াছে।

* * *

আমরা গর্ব্ব করিব না বটে, তথাপি রবীন্দ্রনাথ তো আমাদেরই! কোন বিশেষ জাতি বলিয়া একজন বাঙালীর মন ও প্রাণ যে কত উর্দ্ধে উঠিতে পারে, গর্ব্ব করিবার হেতু না থাকিলেও, এ কথা চিন্তা করিবার অধিকার অবশ্যই আমাদের আছে। সেই পরম অভ্যুদয়-ক্ষণে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত হইয়া, এবং বিশ্বমানবতার প্রতিভূ সেই মহৎ ব্যক্তিগণের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া তাঁহার বাঙালীত্ব নিশ্চয় বিস্মৃত হন নাই; হইয়া থাকিলেও বঙ্গজননী তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না, কারণ সন্তান যদি মায়ের সন্তান থাকিয়াই না বাঁচে, তবে কোন্ জননী বাঁচিয়া থাকিবার জন্য তাহাকে বিশ্বের কোলে তুলিয়া দিতে কাতর হয়? কিন্তু আমাদের ভাবনা তাহাই নয়, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেমন যেন ভয় হইতেছে—এত দিন পরে এই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের নীচে এত কাণ্ড করিয়া ঠিক এই সময়ে পশ্চিম রবিকে এত আদর করিল কেন? এর

আগে তো অনেক সময় ছিল, দশ বৎসর আগেও তো রবীন্দ্রনাথ এই রবীন্দ্রনাথই ছিলেন? ঝড় উঠিয়াছে, চারিদিকে মেঘগর্জ্জন শোনা যাইতেছে। তবু তাহারই মধ্যে সন্ধ্যারতির মত এই ধূপ দীপ ও শঙ্খধ্বনি কেন? রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যদেবতা কি চঞ্চল হইয়াছেন? বুঝি এর পর আর সময় হইবে না, রবিপূজার শেষ ও শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য যাহা তাঁহার প্রাপ্য ছিল, এখনই দেওয়াইয়া দিলেন।

* * *

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একখানি পত্রিকার একটি প্রবন্ধ ও সেই প্রবন্ধের স্থানবিশেষে চোখ পড়িল—তখনই সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। প্রবন্ধটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকায় একজন ব্রাহ্ম পাদ্রীর লেখা। মথিলিখিত সুসমাচারের পর এমন ধর্ম্মগত সত্য আর প্রচারিত হয় নাই। পাদ্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। "তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] বহু ছোট গল্পে গ্রাম ও গ্রাম্য-জীবনের অপূর্ব্ব চিত্র প্রভৃতি তাঁহার ব্রাহ্ম সংস্কৃতির যে পরিচয় দেয়…"! এইটুকু পড়িয়াই সর্ব্বদুঃখ দূর হইল। হিন্দু হইলে, আমরা কেবল বাঙালী হইলেই, রবীন্দ্রনাথকে দাবি করা চলিবে না। বাঁচা গেল! ইহার পরেও "কম্যুন্যাল অ্যাওয়ার্ড" যে মিথ্যা, এ কথা বলিতে কাহার সাহস হইবে?

* * *

বিদ্যাসাগর ব্রাহ্ম ছিলেন

ঐ সংখ্যার আর এক প্রবন্ধে পাদ্রী মহাশয় আমাদিগকেও এক হাত লইয়াছেন। আমাদের অপরাধ, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাতির জাগরণের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের নাম করিয়া থাকি—এবং "বিধবাবিবাহ"-প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগরকেও হিন্দু

ও ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার অসমসাহসের কথা বলিয়া থাকি। এমন কথা হিন্দুরা সকলেই বলিয়া থাকে, এমন কি সেদিনও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র হিন্দু সম্পাদক বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায় নাকি বলিয়াছিলেন, "সামাজিক একটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি একাই সংগ্রাম করিয়াছিলেন।" ইতিহাসের এমন অপলাপ নাকি আর হইতে পারে না। কারণ, বিখ্যাত দার্শনিক বিপিনচন্দ্র পাল ইংরেজীতে বলিয়াছেন, ব্যক্তি যত বড়ই হউক, তাহার জীবন-চরিতের মূল্য খুবই কম; কারণ, "Emphasis of the new thought is not on the individual but on the collective thought and life of the society to which he belongs." তত্ত্বটি যেমন মৌলিক—এবং ইংরেজীতে লেখা ও একজন ব্রাহ্ম ঋষির বচন বলিয়া তাহার গুরুত্বও যেমন অধিক, তেমনই এই তত্ত্বটিকে পাদ্রী মহাশয় যে ভাবে প্রামাণ্য করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও গুরুতর ও মৌলিক।

এই তত্ত্ব অনুসারে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কিছুই নয়, তাঁহার সমাজের "collective thought and life" তাঁহাকে গড়িয়া তুলিয়াছে, অতএব তাহারই মূল্য বেশি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, বিদ্যাসাগর কোন্ সমাজের? কেন? ইতিহাস পড় নাই? জান না, সেকালে এক ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া আর কোন সমাজ ছিল না, এবং সে সমাজের কেন্দ্র বা পীঠস্থান ছিল তত্ত্ববোধিনী সভা। এই তত্ত্ববোধিনী সভা হইল একটি বিরাট্ সমাজের চুম্বক-প্রতিকৃতি—ইহাই ছিল কিং আর্থারের রাউণ্ড টেব্‌ল। আর কেহ ছিল না—কিছুই ছিল না; ইহাই সেই হিরণ্যগর্ভ যাহা হইতে দ্যাবা-পৃথিবীর সৃষ্টি হইল। একটা সভা হইল সমাজ—বৃহৎ মানবমণ্ডলী ওই গণ্ডির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল! বাংলা দেশে হিন্দু যাহারা ছিল, তাহারা খাইত এবং ঘুমাইত, তাহাদের

প্রাণমন প্রভৃতির কোন বালাই ছিল না; এই তত্ত্ববোধিনী সভাই তাহাদের জন্য চিন্তা করিত, তর্ক করিত, চক্ষু বুজিয়া নিরাকার সাধন করিত, বিধবাবিবাহ দিবার জন্য বক্তৃতা করিত, প্রস্তাব পাস করিত—এবং তাহার দ্বারাই জাতিকে উদ্ধার করিত। সেকালে যে এত পত্রিকায় এত চিন্তা, এত মতবাদ, এত তর্কবিতর্কের ঝড় বহিত, সেগুলাতে জাতি বা সমাজের "collective thought and life"এর কোন প্রকাশ ছিল না; কারণ, তাহারা তত্ত্ববোধিনী সভায় নাম রেজিষ্ট্রি করে নাই, তাহারা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে ত্যাগ করে নাই। বিদ্যাসাগর এই তত্ত্ববোধিনী সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন বলিয়াই এত বড় সংস্কারক হইতে পারিয়াছিলেন—অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন বলিয়াই এই কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্যই ছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, অতএব এ সভার যিনিই সভ্য তিনিই ব্রাহ্ম—বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। যেমন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন বলিয়া আর হিন্দু থাকিতে পারেন নাই, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার একজন চাঁই ছিলেন বলিয়া, তিনিও প্রত্যহ ঘণ্টা-মাফিক চোখ বুঁজিয়া পরমপিতার ধ্যান করিতেন; এবং পুত্রের বিধবা-বিবাহ দিয়াছিলেন। অত কথা কেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের যিনি মূল উৎস, তিনিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন, পৈতা ফেলিয়াছিলেন,* প্রকাশ্যে অব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিতেন—এবং বিলাত যাইবার সময়ে পাচক ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে বাবুর্চ্চি লইয়াছিলেন, গঙ্গাজল লইবার মত কুসংস্কারও তাঁহার ছিল না। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্ম ভিন্ন সে যুগে কাহারও lifeও ছিল না, thoughtও ছিল না।

পাদ্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনীর সভ্যগণ প্রায় সকলেই

* যদিও পৈতা ফেলেন নাই।

হিন্দু কলেজের ছাত্র, ডিরোজিওর শিষ্য—অতএব ইহাদের সেই "New thought" এইখান হইতে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার বাহিরে সেই New thought-ই শিষ্যপরম্পরায় তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু সমাজে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই ফলে এ জাতির প্রাণশক্তি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্জীবিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্ববিলাসী বাবুদের দ্বারাই তাহা হয় নাই। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র দেবেন্দ্র ও তৎশিষ্য তারাচরণ প্রভৃতি এই তাণ্ডবের কিঞ্চিৎ পরিচয় এখনও বহন করিতেছে। সেকালের কলিকাতার ভদ্রশিক্ষিত নাগরিক সমাজে এই life ও thought প্রবল বেগে বহিয়াছিল এবং ইহারই তরঙ্গাঘাতে মফস্বলেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁহারা শক্তিমান ও মনস্বী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিয়া বক্তৃতা করিতেন না। স্বর্গীয় আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কেহ কেহ পজিটিভিস্ট হইয়াছিলেন। এই সকল স্মরণ করিলে ব্রাহ্ম পাদ্রীদের গৌরবে নয়—প্রাণবান ও মেধাবী হিন্দুসন্তানের সেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামশীলতার গৌরবেই—আমরা এখনও উৎফুল্ল হইয়া থাকি।

সে যুগের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল নবশিক্ষা-বিস্তার—ধর্ম্মপ্রচার নহে। এই New Learning-ই বাংলায় Renaissance আনিয়াছিল। ব্রাহ্ম পাদ্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, সেই শিক্ষা-বিস্তারে দেশময় স্কুল-কলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় যাহারা বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয় জন তত্ত্ববোধিনীর আলোক-দূত? এই কালে যাহারা নূতন বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদেরই বা কয় জন ব্রাহ্ম সভায় গিয়া চোখ বুঁজিত? এ যুগের যে

"collective thought and life of society"—তাহার কতটুকু ওই তত্ত্ববোধিনীর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে, সে যুগে সারা বাঙালী হিন্দু সমাজে যে শোণিত-পীড়া বা জ্বরতাপ ইংরেজী শিক্ষার ফলে ঘটিয়াছিল—তত্ত্ববোধিনী সভা তাহারই একটা ভাব-বিস্ফোটক মাত্র? তাহাও ওই সমাজ-দেহেরই একটা রোমকূপে দেখা দিয়াছিল—দেহের অন্যান্য অঙ্গের সহিত তাহার শিরা-সম্পর্ক ছিল বলিয়াই তাহা ওই দেহের হৃদ্‌পিণ্ডত্ব দাবি করিতে পারে না। সমগ্র জাতির দেহে নূতন সমাজ ও ধর্ম্ম চেতনার যে বেদনা-সংশয় অন্তর্গূঢ়ভাবে জাগিয়াছিল—বাঙ্গালীর হৃদয় ও মনীষাকে যাহা বিদ্ধ করিতেছিল—তাহা এই যুগের প্রথম ভাগে নানা নিষ্ফল আন্দোলনে ও শুভ চেষ্টার ব্যর্থ উদ্যমে পথ হারাইতেছিল; এবং ইহারই ফলে, কেবলমাত্র যুক্তি ও বিবেকের প্ররোচনায় যাহারা অধীর হইয়াছিল, কিম্বা যাহারা কেবল মাত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতাকেই একমাত্র কাম্য মনে করিয়াছিল, তাহারাই কৃষ্ণ বন্দ্যো বা মধুসূদন দত্তের মত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, অথবা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া মধ্যপথাবলম্বী হইয়াছিল। ইহারা জাতি ও সমাজকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদের জন্য পৃথক্ পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়াছিল। কিন্তু যাহারা এত সহজে এ সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইতে চাহে নাই—যাহাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম প্রেমকে পরাভূত করিতে পারে নাই, তাহারাই সেই প্লাবনের মুখে কঠিন শিলাভিত্তির সন্ধান করিয়াছিল—তাহারা তত্ত্ববোধিনীর সভ্য হউক বা না হউক, এই জাতির ধর্ম্ম ও সমাজকেই আশ্রয় করিয়া জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। এই প্রয়াসের আদিতে বিদ্যাসাগর, ইহার প্রধান সাধন ছিল—শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার; মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, ইহার সাধন ছিল—জাতির চিত্ত-

সংস্কার ; শেষে বিবেকানন্দ, ইহার সাধনক্ষেত্র ছিল—জাতির অধ্যাত্ম-জীবন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী জাতির নব জাগরণে যেটুকু সাফল্য লাভ হইয়াছিল, তাহা এই তিন বিরাট্ পুরুষের সাধনায় ; ইহাই ইতিহাস ; এ ইতিহাসকে অস্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে—পাদ্রীদের তো আছেই—কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যা পাণ্ডিত্যের ধমক চলিবে না।

"বিধবা-বিবাহে"র যে যুদ্ধ, তাহা বিদ্যাসাগর একা করিয়াছিলেন এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণরূপেই তাহা করিয়াছিলেন—ইহাও ইতিহাস। প্রথমত তত্ত্ববোধিনীতে বিদ্যাসাগরের পদার্পণ থাকিলেও তাহাতে তাঁহার হিন্দুত্ব নষ্ট হয় নাই। হিন্দুর আচার তিনি লঙ্ঘন করেন নাই, এবং বিধবার বিবাহও তিনি হিন্দুর জাতিভেদ ও অন্যান্য সমাজবিধি বজায় রাখিয়াই দিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কেবল সভায় বসিয়া চোখ বুঁজিয়া বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাসই করেন নাই ; তিনি দেহের রক্ত ও সদুপায়ে উপার্জ্জিত অপরিমাণ অর্থের দ্বারা সেই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন—জমিদারি ও বিলাসব্যসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল পাটোয়ারী বুদ্ধি ও লেখনী চালনা-দ্বারা তাহা করেন নাই। কেবল তত্ত্ব ও ভাববিলাস নয়, নাকি সুরের পাদ্রিয়ানাও নয়—তিনি খাঁটি হিন্দু বাঙালী সন্তানরূপে সেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন—তাঁহার চরিত্রে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরই নিষ্ঠা ও প্রবল আন্তরিকতা ছিল। তিনি কোন ব্রহ্ম বা ভগবানের ধার ধারিতেন না—আত্মপ্রত্যয়ী পুরুষ ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না। এই মনোভাবও সম্পূর্ণ হিন্দু—হিন্দুর রক্তেই ইহা সম্ভব ; এই নাস্তিকতা প্রাচীন সমাজের বড় বড় পণ্ডিতেরও ছিল। এমন পুরুষের নাম কোন পাদ্রীর মুখে রাম নামের মতই শোনায়। তিনি যে একা এই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাও কি প্রমাণ করিতে হইবে? হিন্দু

সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াই যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধে কোন বিধর্ম্মী তাঁহাকে সাহায্য করিবে কেমন করিয়া? যাহারা পৃথক্ সমাজ, পৃথক্ ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে এই যুদ্ধে তাঁহার যোগ কোথায়?

পাদ্রী মহাশয় বলিয়াছেন—বিদ্যাসাগরের এই যুদ্ধ-ঘোষণা তত্ত্ব-বোধিনীতে যোগ দেওয়ার পরে—অর্থাৎ তিনি ইহার পূর্ব্বে এ চিন্তা করেন নাই, কিন্তু ব্রাহ্ম হওয়ার পর, অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়া এই ক্ষুদ্র প্রেরণা লাভ করিলেন। ইতিহাস এই কথা বলে! অর্থাৎ এইরূপ তারিখ-তত্ত্বই ইতিহাস! তত্ত্ববোধিনী এত বড় একটা শক্তি-পীঠ যে, বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তে গ্রাস করিয়া ফেলিল! যে পুরুষসিংহের আবির্ভাবে তত্ত্ববোধিনীর কৃতার্থ হইবার কথা, যাঁহার পদাঙ্গুলির স্পর্শে সমগ্র জাতির উদ্ধার হইয়া যাইবার কথা, তাঁহাকে মানুষ করিল তত্ত্ববোধিনী? তত্ত্ববোধিনীর তত্ত্ব বহু পূর্ব্বেই তাঁহার মানসে আরও সত্য ও মনুষ্যত্বযুক্ত হইয়া ধরা দেয় নাই!

একজন ব্রাহ্ম পাদ্রীর মুখে আজ এত কাল পরে এই মহাপুরুষের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়াই আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর যে মানুষ, সে মানুষকে বুঝিতে হইলে পাদ্রী-জীবন পাল্টাইয়া আসিতে হইবে। হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্মকে গালি দিবার অধিকার হিন্দুই সকলকে দিয়াছে—এ কাজে কোন বীরত্ব বা বাহাদুরি নাই ; কিন্তু যে মানুষ মানুষ-হিসাবে সকল ধর্ম্মধ্বজিতার উপরে, যে হিন্দু থাকিয়াই মানবতার—বক্তৃতা নয়—আচরণ করিয়াছিলেন, বিধবা-বিবাহ বিধিসঙ্গত করাই যাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ম্ম ছিল না, এবং হিন্দুর চক্ষে তাহাই তাহার একমাত্র মহিমা নয়—সেই মহাপুরুষকে একটা অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ

করিবার এই হীন চেষ্টা যে কতখানি হাস্যকর, তাহা আমরাও জানি; তথাপি প্রতিবাদ নয়—এই সূত্রে ও সুযোগে কয়েকটি কথা এক সম্প্রদায়ের লোককে জানাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্ম মহাপুরুষেরাই যে এ জাতির পরিত্রাতা, ইহাই নানা ভাবে প্রচারের চেষ্টা আজকাল প্রবল হইয়াছে।

* * *

সর্ব্বশেষে একটা কথা 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকগণকে না বলিলে সত্য গোপন করা হইবে, এবং সম্ভবত এই প্রসঙ্গে যে একটু হাস্য ও করুণ রসের অবকাশ আছে, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। আমরা যে পাদ্রী মহাশয়ের সহিত এতক্ষণ যুদ্ধ করিলাম, তিনি আমাদেরই ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ও 'শনিবারের চিঠি'র এককালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস। ভাগ্যের কি পরিহাস! নিয়তির কি বিড়ম্বনা! সেই যোগানন্দ দাস, যিনি এককালে সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন ও আমাদিগকে লজ্জা দিতেন, আজ তিনিই উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ঘোরতর আস্তিক ও ও তত্ত্ববাদী হইয়া উঠিয়াছেন, পাদ্রী হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের ইতিহাস পড়াইতেছেন! বুড়া হইলে বনে যাইবার কথা; যাহারা পঞ্চাশের পূর্ব্বেই বুড়া হয়, তাহারা সহসা ধার্ম্মিক হইয়া উঠে, এই ধার্ম্মিকতাও একরূপ বাণপ্রস্থ। এই বাণপ্রস্থের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা কবিসুলভ কল্পনায় একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন, আমরা অবশ্য আমাদের বন্ধুর সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলিতেছি না; তবু আমাদের দুঃখ প্রায় ততখানিই হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"আমার প্রিয় বন্ধু দাস্থ মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত, কত মাগী গঙ্গার ঘাটে স্নান কালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে "দাস্থ মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। দাস্থর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল, এখন দাস্থ নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে পাত মুছিয়া ফেলে। অরণ্যের আর বাকি কি?"

সংবাদ-সাহিত্য

এইচ. জি. ওয়েল্‌স প্রমুখ ইংলণ্ডের পঁয়তাল্লিশ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বর্ত্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বদেশের তরফে পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজের দরবারে এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। জার্মানিতে বর্ত্তমানে কোনও সাহিত্যিক অবশিষ্ট আছেন বলিয়া মনে হয় না; থাকিলে তাঁহারা ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্য লইয়া একই আবেদন করিতে পারিতেন এবং সেই আবেদনে স্বভাবতই ন্যায় ও ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজেদের তরফেই রাখিয়া দিতেন। এই আবেদন সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলিবার নাই, কারণ অধীনতা-সূত্রে আমরা তাঁহাদেরই আপন জন, সুতরাং ইহা আমাদের উদ্দেশে লিখিত নয়। আমরা এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিলাম শুধু ইহাই দেখাইবার জন্য যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে নিতান্ত কল্পনালোকের ব্যাপার বলিয়া সাহিত্য উপেক্ষিত হইলেও এখনও তাহার লৌকিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় নাই। সুষ্ঠুভাবে প্রোপাগাণ্ডা করিবার জন্যও সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা সাহিত্যিকে দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ একান্ত বিশ্বমানবীয় সামগ্রী কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন, তাঁহারাও বিশ্বমানবতার দোহাই পাড়িয়া স্বদেশেরই কল্যাণ কামনা করেন; বিশ্বমানব উপলক্ষ্য—লক্ষ্য আপন দেশ। পুশ্‌কিন, ডস্টয়ভ্‌স্কি এবং গর্কি রুশিয়ার ধর্ম্মকে সমগ্র বিশ্বমানবের ধর্ম্মরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন; হুইট্‌ম্যান নূতন ছন্দে ইয়াঙ্কি স্বাধীনতার বাণীই প্রচার করিয়াছেন; নোগুচি জাপানের এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিতে কসুর করেন নাই। দেশগত আদর্শ-বিরোধের ফলে সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে বিরোধ বাধিতে সেদিনও দেখিয়াছি। আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড-উপাধি ত্যাগের ঐতিহাসিক পত্রটিকে ইংরেজ সাহিত্যিকেরা বিশ্বমানবের আর্ত্তনাদ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি ইংলণ্ডের দৈনিক পত্রের কোনও কোনও সম্পাদক এবং পার্লামেণ্টের দুই একজন সভ্য স্বীকার করিয়া লইলেও, সেখানকার সাহিত্যিকদের সমর্থন এখনও ইহা লাভ করে নাই। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশপ্রেমিক হইয়াছেন। আমাদের সুবিধা আছে; আমরা ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও দেশপ্রেমিক হইতে পারিব।

—

করিবার এই হীন চেষ্টা যে কতখানি হাস্যকর, তাহা আমরাও জানি; তথাপি প্রতিবাদ নয়—এই সূত্রে ও সুযোগে কয়েকটি কথা এক সম্প্রদায়ের লোককে জানাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ব্রাহ্ম মহাপুরুষেরাই যে এ জাতির পরিত্রাতা, ইহাই নানা ভাবে প্রচারের চেষ্টা আজকাল প্রবল হইয়াছে।

* * *

সর্ব্বশেষে একটা কথা 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকগণকে না বলিলে সত্য গোপন করা হইবে, এবং সম্ভবত এই প্রসঙ্গে যে একটু হাস্য ও করুণ রসের অবকাশ আছে, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে। আমরা যে পাদ্রী মহাশয়ের সহিত এতক্ষণ যুদ্ধ করিলাম, তিনি আমাদেরই ভূতপূর্ব্ব সহযোগী ও 'শনিবারের চিঠি'র এককালীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস। ভাগ্যের কি পরিহাস! নিয়তির কি বিড়ম্বনা! সেই যোগানন্দ দাস, যিনি এককালে সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির জীবন্ত বিগ্রহরূপে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন ও আমাদিগকে লজ্জা দিতেন, আজ তিনিই উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ঘোরতর আস্তিক ও ও তত্ত্ববাদী হইয়া উঠিয়াছেন, পাদ্রী হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের ইতিহাস পড়াইতেছেন! বুড়া হইলে বনে যাইবার কথা; যাহারা পঞ্চাশের পূর্ব্বেই বুড়া হয়, তাহারা সহসা ধার্ম্মিক হইয়া উঠে, এই ধার্ম্মিকতাও একরূপ বাণপ্রস্থ। এই বাণপ্রস্থের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা কবিসুলভ কল্পনায় একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন, আমরা অবশ্য আমাদের বন্ধুর সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা বলিতেছি না; তবু আমাদের দুঃখ প্রায় ততখানিই হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"আমার প্রিয় বন্ধু দাস্থ মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত, কত মাগী গঙ্গার ঘাটে স্নান কালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে "দাস্থ মিত্রায় নমঃ" বলিয়া ফুল দিয়াছে। দাস্থর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল, এখন দাস্থ নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে পাত মুছিয়া ফেলে। অরণ্যের আর বাকি কি?"

সংবাদ-সাহিত্য

এইচ. জি. ওয়েল্‌স প্রমুখ ইংলণ্ডের পঁয়তাল্লিশ জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বর্ত্তমান যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বদেশের তরফে পৃথিবীর সাহিত্যিক সমাজের দরবারে এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। জার্ম্মানিতে বর্ত্তমানে কোনও সাহিত্যিক অবশিষ্ট আছেন বলিয়া মনে হয় না; থাকিলে তাঁহারা ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্য লইয়া একই আবেদন করিতে পারিতেন এবং সেই আবেদনে স্বভাবতই ন্যায় ও ধর্ম্মকে তাঁহারা নিজেদের তরফেই রাখিয়া দিতেন। এই আবেদন সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলিবার নাই, কারণ অধীনতা-সূত্রে আমরা তাঁহাদেরই আপন জন, সুতরাং ইহা আমাদের উদ্দেশে লিখিত নয়। আমরা এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিলাম শুধু ইহাই দেখাইবার জন্য যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে নিতান্ত কল্পনালোকের ব্যাপার বলিয়া সাহিত্য উপেক্ষিত হইলেও এখনও তাহার লৌকিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজন অস্বীকৃত হয় নাই। সুষ্ঠুভাবে প্রোপাগাণ্ডা করিবার জন্যও সাহিত্যের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা সাহিত্যিকে দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ একান্ত বিশ্বমানবীয় সামগ্রী কল্পনা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন, তাঁহারাও বিশ্বমানবতার দোহাই পাড়িয়া স্বদেশেরই কল্যাণ কামনা করেন; বিশ্বমানব উপলক্ষ্য—লক্ষ্য আপন দেশ। পুশ্‌কিন, ডস্টয়ভ্‌স্কি এবং গর্কি রুশিয়ার ধর্ম্মকে সমগ্র বিশ্বমানবের ধর্ম্মরূপে দেখিতে চাহিয়াছেন; হুইট্‌ম্যান নূতন ছন্দে ইয়াঙ্কি স্বাধীনতার বাণীই প্রচার করিয়াছেন; নোগুচি জাপানের এবং রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিতে কসুর করেন নাই। দেশগত আদর্শ-বিরোধের ফলে সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে বিরোধ বাধিতে সেদিনও দেখিয়াছি। আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড-উপাধি ত্যাগের ঐতিহাসিক পত্রটিকে ইংরেজ সাহিত্যিকেরা বিশ্বমানবের আর্ত্তনাদ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি ইংলণ্ডের দৈনিক পত্রের কোনও কোনও সম্পাদক এবং পার্লামেণ্টের দুই একজন সভ্য স্বীকার করিয়া লইলেও, সেখানকার সাহিত্যিকদের সমর্থন এখনও ইহা লাভ করে নাই। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া দেশপ্রেমিক হইয়াছেন। আমাদের সুবিধা আছে; আমরা ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও দেশপ্রেমিক হইতে পারিব।

—

বারোই আগস্ট সোমবার হইতে ইংলণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ উপকূলে যেরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান উপস্থিত হইয়া ভূপাতিত হইতেছে, তাহাতে একটিমাত্র উপমাই আমাদের মনে পড়ে। ইংলণ্ড যেন প্রজ্বলন্ত দীপশিখা এবং শত্রুবিমানগুলি যেন পতঙ্গ—আপনার উত্তেজনায় আপনিই আহত ও ভগ্নপক্ষ হইয়া প্রভাতের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। প্রাণের এমন ছিনিমিনি খেলা পৃথিবীর সমস্ত ব্যর্থ-প্রেমিক সমাজও সমবেতভাবে করিতে পারে নাই। ইহা হইতেই অনুমান করা চলিতে পারে, দেশপ্রেমের উগ্র সুরা কতখানি মাদকতা আনিতে পারে। ভারতবর্ষে এই মাদকতা হাজার বৎসরের মধ্যে দেখা যায় নাই; সম্ভবতঃ ইহা বর্ত্তমান ভারতীয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিরুদ্ধ। এখানে দেশরক্ষার নামে যে আয়োজন চলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ ও সার্থক করিতে হইলে এই উগ্র মদের আমদানি আবশ্যক। পরাধীন রাজ্যে অতিরিক্ত ডিউটি দিয়া ইহার কারবার লাভজনক নয়; বেআইনী চোলাইয়ের কারবারও যে ভাল চলে না, তাহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীদের দিয়াই ভারতবর্ষ রক্ষা যদি ইংরেজের শেষ লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই দেশপ্রেমের অবাধ বিস্তার আবশ্যক। মিঃ এমারি প্রমুখ সহৃদয় ইংরেজেরা তাহা বুঝিতেছেন না। থকসার, লীগ, মহাসভা প্রভৃতি জালের প্রচলন এই কারণেই ব্যাপকভাবে চলিতেছে।

—

এত দূরে বসিয়া শুধু দৈনিক সংবাদপত্র ও ছায়াছবির মারফতে আধুনিক যুদ্ধ কি বস্তু, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই রাত্রিতে নিদ্রা যাই এবং সুখস্বপ্নও দেখিয়া থাকি। যুদ্ধের ভয়াবহতার কিছু কিছু আভাস কোনও কোনও সাহিত্যিক দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গত মার্চ মাসে প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক W. Somerset Maugham লিখিত *France at War* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। Maugham ফ্রান্সের আয়োজনই দেখিয়াছিলেন, পরাজয় দেখেন নাই। এই চটি বইখানির মধ্যে আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সকল আয়োজন সত্ত্বেও চিরন্তন মানব-মনের যে আর্ত্তনাদ স্তব্ধ হইয়া আছে, তাহা সর্ব্বত্র শ্রুত হইলে এই অতিশয় অর্থহীন আত্মঘাতী কলহের জন্য পৃথিবীসুদ্ধ সকল মানবের লজ্জা হইবে। যুদ্ধ-

বিরোধী না হইয়াও আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। একটি ফরাসী শহরের (১৯৪০) বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—

...The wide streets, the narrow lanes with their old houses, are unnaturally neat and clean. They are empty and the silence is uncanny. No trams run, and it startles you when now and then a military car speeds by. The city seems to be waiting for something, and you have the impression that those deserted streets are holding their breath in a terrified foreboding. For a wonder on the day I was there the sun shone brightly; it was high noon, but you had the sinister feeling of a city at dead of night. It was like a city in a fairy-tale where everyone who dwelt in it was wrapped in a magic sleep. Here and there, in a house or a flat, a window has remained unshuttered, and you cannot resist the notion that someone is living behind that closed window, closed because there is a nip in the air, and that at any moment a face will appear behind it; but you know that not a soul is there. These hundreds and hundreds of houses, street after street, lane after lane, are empty.

Most of the shops have their shutters up, but some had none to put up, and in these the goods for sale remain on display. Women's under-wear, silk stockings, hats; they have a strangely forlorn look. At a pastry-cook's little cakes, sweets and what not lie mouldering in the window. There was no time to put anything away when the evacuation took place. Things had to be left just as they were, while the owners huddled a few clothes into a bag, such household linen as they could carry, and fled. They had to leave their cats behind, and now, fed by the soldiers, they wander disconsulate and mew....

এই শ্মশান-চিত্রের সহিত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সংমিশ্রিত হইয়া যুদ্ধের ভয়াবহতার কিছু আভাস দিতেছে।—

...Then on a sudden the sinister note of the siren broke the unearthly silence that wraps the city like a shroud; it rang through the stillness with a merciless intensity, echoing through those empty streets so that it seemed to assail you from every direction; and though I had heard it more than once before, it had in that deserted city an ominous horror. Two or three men started running, and following them I found myself at the police station. There were perhaps a dozen of us, policemen, employees of the municipality and three or four soldiers. They were impatient and exasperated....

গৃহহারাদের বর্ণনাও অতিশয় করুণ—

Interminable processions passed along the roads, men and women on foot pushing hand-carts and perambulators, whole villages, at their head the Maire and the Cure telling his rosary, carts by the thousand in which were the old people, children and such effects as it had been found possible to bring away. At night, exhausted, they got what rest they could by the wayside. They flung their weary bodies into the

ditches...They were piled into trucks, often open ones, and they suffered from the heat by day and from the cold at night, from vermin, from hunger and thirst....Those who died on the way, those who fell ill, women in labour, were taken off the train. When finally the refugees reached their destination their state was pitiable.

যে ফ্রান্সকে আমরা বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তপ্রতীক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, তাহার বর্ত্তমান এই দুরবস্থার কারণ কি? জার্মানির যত দোষই থাকুক না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় যে প্রকাণ্ড গলদ রহিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এই গলদ দূর করিবার প্রধান অন্তরায় সাহিত্যিক প্রোপাগাণ্ডা। এই অস্বাভাবিক অবস্থা চলিলে ভবিষ্যতে সাহিত্য শুধু এই কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে।

—

প্রাচীনপন্থী (পরিভাষায় এবং বানানে নয়!) এবং বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইচ্ছা করিলে যে কতখানি তারুণ্য-মদ হজম করিতে পারেন, ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে তাহার কিছু পরিচয় আছে। ৫৭৩ পৃষ্ঠা খুলিয়া শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত "কনে-দেখা আলো" কবিতাটি অবলোকন করুন। ব্রাহ্ম হইলেও নাতি-ঠাকুরদাদার সুবাদে রস-রসিকতা যে অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে, তাহা আমরা মানি, তাহার উপর নাতি যদি সদ্যবিবাহিত হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই! তথাপি মানী ভাইপো ও সমর্থ ছেলেমেয়েরা থাকিতে এতখানি রাশ ঢিল দেওয়াটা আমরা পছন্দ করিতেছি না। কামাক্ষীপ্রসাদের "কনে-দেখা আলো" রাত্রির অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে; দুইজনে মুখামুখি বসিয়া আছেন, লজ্জা সরমের বালাই নাই। কিন্তু 'বর্ণ-পরিচয়' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগের লেখক ভাষার এতখানি উদোম উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করিতেছেন, ইহাতেই আমরা তাজ্জব বনিয়া গিয়াছি! মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের "গোধূলি-লগনে"র আকণ্ঠ ভোজের পর এই "কনে-দেখা আলো"র চাট্‌নি বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় খুব "রেলিশ" করিয়াই উপভোগ করিয়াছেন।

মেঘের মিনারে বাঁকানো অশনি জাফরি কাটে
বর্ষার দিন, এ তোমারি দিন, কঠিন নয়।
আকাশের কোনে কনে-দেখা আলো স্বপ্ন আনে—
প্রলাপী গলির অনেক উর্দ্ধে মেঘলা মিছিল।

তবুও তিক্ত। সূর্য্য পূজারী আকাশে চায়।
সূর্য্যের ছুটি, কামনার তীর বেঁধে নি তাকে।
ধোঁয়াটে মেঘেরা ধূসর চাদরে, আকাশ তাদের—
কনে-দেখা আলো সন্ধ্যার নীল আবছায়ায়।
কনে-দেখা আলো কোনো মরীচিকা বিছাবে না।
গলা পিচ নেই। স্মৃতির হাঙর বর্ষা-দিনে।

'প্রবাসী'র প্রতি পুরাতন শ্রদ্ধাবশত আমরা জাফরি কাটা মিনার, প্রলাপী গলি, হাঙর বর্ষা—এ সব কিছুই মানিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু নাত-বউকে লইয়া এতখানি বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করিতে পারিতেছি না।

—

'প্রগতি' 'কল্লোল' হইতে সদ্য অতীত পর্য্যন্ত আধুনিকতার যে জয়-ঘোষণা চলিয়াছিল, আধুনিকেরাই আজ প্রকৃতিস্থ হইয়া যে তাহার হিসাব নিকাশ করিতে পারিতেছেন, ইহাকে শুভলক্ষণ বলিব। অতীত 'ভবিষ্যৎ' এবং 'অগ্রগতি' সম্প্রদায়ের একজন চাঁই সম্প্রতি হিসাব খতাইয়া এই রায় দিয়াছেন—

"...মিথ্যা-আদর্শও একমাত্র অভিনবত্বর দাবীর জোরেই আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। কিন্তু তাহার পরিচয় এবং অভিজ্ঞতা যখন অভ্যস্ত হইয়া আসে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়—অভিনবত্বর প্রলেপ ক্ষয়িত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে একটা কুশ্রী মিথ্যা। তখন আবার চলে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রয়াস, প্রতিষ্ঠিত সত্যের অভিমুখে শ্রান্ত পথিকের তীর্থ পরিক্রমণ।

পৃথিবীর ইতিহাস ইহাই। এক একবার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া, পারিপার্শ্বিককে ভাঙিয়া চুরিয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়া, অভিনবের প্রতি—তা সে হোক্ প্রান্তর-সীমাবর্তী আলেয়া—মৃত্যু-বিলাসী পতঙ্গের প্রবাহ। আবার ফিরিয়া আসিবার ডাক শোনা যায়, অতিদূর হইতে, ক্ষীণায়মান ডাক, পুরনো দীপশিখার আহ্বান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে, কাব্যে ও সুকুমার শিল্পে, আমরা সেই শাশ্বত সৌন্দর্য্যকে নতুন করিয়া জানিবার প্রয়াসই লক্ষ্য করিতেছি। প্রাগল্‌ভ পরিবেশ আমাদিগকে অনেক অপপ্রয়াসের মধ্যে টানিয়া নিয়া গিয়াছিল। বহুঘোষণার সাহায্যে অনেক অপ্রাকৃতকে সত্য বলিয়া চালানো হইয়াছে। কিন্তু আর না।

সত্যই তো অনেক সময় বৃথা বহিয়া গিয়াছে, আর নয়।

—

পরের ভাবকে কি করিয়া বেমালুম আত্মস্থ করিয়া লওয়া যায়, ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' "দু'ধারা" কবিতায় শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় তাহা দেখাইয়াছেন। "বনফুল" 'ভারতবর্ষের'ই অন্যতম খেলোয়াড়,

সুতরাং এক হিসাবে ইহা সেম-সাইড গোল হইয়াছে। সম্পাদক ফণীন্দ্রবাবু নিমকের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য বাংলার বাহিরের কাগজ-গুলিতে ('শাশ্বতী', বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭) কৌশলে 'ভারতবর্ষে'র বিজ্ঞাপন দিবার কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকেন বলিয়া সব দিক হিসাব করিয়া চলিতে পারেন না ; কিন্তু আরও পাঁচজন তো আছেন !

—

কডালিয়া প্রেস, বালিগঞ্জ হইতে শ্রীঅসীম দত্ত আমাদিগের নিকট একটি খোলা চিঠি পাঠাইয়াছেন। তাহার মূল বক্তব্য এই—'কবিতা'-সম্পাদক সমর সেনের 'ভারতবর্ষ' নামে একটি কবিতা 'অগ্রণী' মাসিক পত্রিকায় কিছুদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কবিতাটিই নাকি নামান্তরিত ("হসন্তিকা") হইয়া ১৯৪০ সালের মার্চ সংখ্যা 'কবিতা'য় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। লেখক আমাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছেন—সেন মহাশয়ের এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি ? আমরাও সম্পাদক, নিতান্ত "কপির অভাব" উদ্দেশ্য হইলে, উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বিপন্ন অবস্থায় অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবার পরামর্শও পণ্ডিত জনে দিয়া থাকেন, নিজের কবিতা দুইবার ছাপা তো সহজেই চলিতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে "ভারতবর্ষ" "হসন্তিকা" হয় কি করিয়া ? যেখানে গরমে লোকে বৎসরের নয় মাস হাঁসফাঁস করে, সেখানে আগুন পোয়ানোর কথা নিতান্তই নির্ম্মমতা। বাল্যকালে 'সন্দেশ' পত্রিকায় "বাতাস"কে "আগুন", "তেল"কে "জল" করিতে দেখিয়া অবাক হইতাম। সমরবাবু আমাদিগকে বুড়া বয়সে অবাক করিতেছেন না তো ?

—

অগ্রগতি'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক আশু চট্টোপাধ্যায় শ্রাবণের 'বালিগঞ্জে' "এমন দিনে তারে বলা যায়···" লিখিয়াছেন। বলা যায় না, তবু চেষ্টা করিয়াছেন। গুটিকয়েক টিপ্‌সও আছে—

ঠাট্টা নয়ক, আজকের দিনে যদি হতে চাও আধুনিক
ঠাকুর বাড়ীর বুড়োর মতন যদি নাহি হও মিষ্টিক
শ্রমিকের তরে তাহলে বাড়াও বাল্‌তি বাল্‌তি আঁখিজল
নিজেরাও যদি যাও গোল্লায় তাহলেও জেনো হবে ফল,
··· ··· ···
পাশের বাড়ীর মেয়েদের খোঁজে বৃথা করোনাক কালক্ষয়
বৃষ্টিতে ভিজে প্রেমের খোঁজেতে ঘুরে মরে তারা লেকময়,···

পাঠক আকর্ষণ করিবার জন্য 'বালিগঞ্জে'র এ এক নূতন ধরনের বিজ্ঞাপন বটে।

—

শ্রাবণ সংখ্যা 'পরিচয়ে' "হ" "পত্রিকা-প্রসঙ্গ" লিখিয়াছেন। লেখাটি পড়িয়া মনে হইল "হ" নিশ্চয়ই "হ য ব র ল" নামের আদ্যক্ষর ; রাঁচী হইতে পলাইয়া না আসিলে প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ করা যায় না। যাইব মোগলসরাই, চড়িলাম হাওড়া স্টেশনে পাঞ্জাব মেলে, মাঝরাত্রে মাঝদিয়ায় ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় আহত হইয়া হাওড়া হস্‌পিটালের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে জ্ঞান হইল—এরূপ হইলে মনে যে অনুভূতি হইতে পারে, "পত্রিকা-প্রসঙ্গ" পড়িয়া অনুরূপ অনুভূতি জাগিবে। লেখক লিখিতে চাহিয়াছেন " 'ভারতবর্ষ' ও দ্বিজেন্দ্রলাল" সম্বন্ধে, কিন্তু লিখিয়া ফেলিয়াছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ। "উদ্ভট হাস্যরসের" ইহা অপেক্ষা ভাল দৃষ্টান্ত 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'ও নাই।

—

এই সংখ্যা 'পরিচয়ে'ই একটি কবিতা আছে "শান্তি"—শুধু শান্তি নয়—আপদশান্তি !

অবশেষে শোনো টানে যদি কোনো দন্তক,
সেই অরণ্য মন্দ কি আর লাগবে !
না হয় ঢাকবে আরও অকুণ্ঠ নির্মোক,
গোদাবরী-তেই জাগর যামিনী কাটবে।
বিশ্বাস নেই শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যে ?
ছেয়ে আছে পথ অনেক সিদ্ধাসিদ্ধে।
নবমেঘে আসে বলাকার পাল সেখানে,
মধুপ-পুঞ্জ জম্বু !

"দন্তক" ছাপার ভুল ; "দত্তজ" শুদ্ধ পাঠ।

—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র তৃতীয় পুস্তক 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এটিরও লেখক। বাংলা সাহিত্যকে যাঁহারা একদিন বুকের রক্ত দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিস্মৃত সাধনার সম্পূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নামমাত্র মূল্যে (চার আনা) জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়া পরিষৎ সত্যকারের লোক-শিক্ষার কাজ

করিতেছেন। এগুলি পড়িলে অনেক বিষয়ে আমাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হইবে।

—

নানা কারণে আমরা পুস্তক-সমালোচনা করি না, অথচ বন্ধু ও লেখকজনে আমাদিগকে পুস্তক উপহার দিয়া বিপন্ন করিয়া তুলেন। পুস্তকের লোভ আমাদেরও আছে, বইয়ের গাদা জমিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সেগুলির দিকে চাহিয়া বিবেক-দংশন অনুভব করি। সুতরাং স্থির করিয়াছি, আগামী আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় পুস্তকগুলির সামান্য পরিচয় দিয়া কর্ত্তব্যপালনের আনন্দ অর্জ্জন করিব। এই সঙ্গে লেখক-সম্প্রদায়কে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি যে, ভবিষ্যতে সমালোচনার্থ তাঁহারা যেন আমাদিগকে কোনও পুস্তক না পাঠান। পাঠাইলে বই মারিয়া দিব, সমালোচনা করিব না। বিবেককে উপেক্ষা করিব।

DWARKIN'S HARMONIUMS

হারমোনিয়ম কিনিতে হইলে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়মই আপনার কেনা উচিত। ডোয়ার্কিনই হাত-হারমোনিয়মের আবিষ্কারক এবং এই যন্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি এ যাবৎ হইয়াছে তাহা ডোয়ার্কিনের বাড়ী থেকেই উদ্ভূত।

বাজারের জিনিষ ২।৪ টাকা কম দামে অবশ্য পাইতে পারেন কিন্তু তাহা ডোয়ার্কিনের জিনিষের মত নির্ভরযোগ্য কখনই হইতে পারে না।

সচিত্র মূল্য তালিকার জন্য লিখুন।

DWARKIN & SON, 11, Esplanade, Calcutta.

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১২শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৭ [১২শ সংখ্যা

জাতীয় জীবন-সঙ্কটে

জোর করিয়া ফুল ফুটানো যায় না, ফুল না ফুটিলে ফলের আশা করা বৃথা। এই উপমাটি বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যার পক্ষেও অতিশয় সত্য—কারণ বিশ্ব-প্রকৃতির তত্ত্বটি এই উপমার মধ্যে আছে, তাই এই উপমাটিকেই আশ্রয় করিয়া আমি আধুনিক বাঙ্গালী জাতির দুরবস্থার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা আধুনিক কালে—এই বিংশ শতাব্দীর সংক্রমণ হইতেই—রাজনৈতিক আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছি। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে, এক্ষণে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আমরা এতদিন স্বপ্ন-সঞ্চরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া এক মহা-বিনাশের গহ্বর-মুখে দাঁড়াইয়াছি। জাতীয়তার যে মন্ত্র আমরা উচ্চারণ করিয়া ক্রমাগত উত্তেজনা রক্ষা করিতেছিলাম, তাহা অতি উগ্র মাদকদ্রব্যের মতই আমাদিগকে প্রথমে প্রমত্ত ও শেষে দুর্ব্বল ও দিক্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। ভাববিলাসী বাঙ্গালীর পক্ষে এই মন্ত্র প্রাণদ না হইয়া প্রাণঘাতী

হইয়াছে। বাংলা দেশে আজ আর মানুষ নাই, ধার্ম্মিক পুরুষ নাই, সমাজ বা গোষ্ঠীপতি নাই—পারিবারিক অভিভাবকও নাই। প্রবল ভাব-বন্যার স্রোতে গৃহ ও সমাজের বন্ধন ছিঁড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে। বন্যার শেষে এখন বাস্তর চিহ্ন কিছুই নাই—অতি গভীর পঙ্ক ও পঙ্কিল জলে জীবনের সমুদয় ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছে। চিন্তা আমরা করি নাই, সত্যকার ভাবনা ভাবি নাই। কেমন করিয়া কি হইতেছে, কোন্ পথে চলিতেছি, অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় নিশ্চিতকে হারাইতেছি কি না—যাহা চাই ও যেমন ভাবে চাই, তাহা আমাদের ধাতুতে হজম হইবে কি না,—এমন কি, যাহা চাই, তাহা প্রাণের মনের সত্যকার চাওয়া কি না, কেবলমাত্র একটা পরানুচিকীর্ষা বা অভিমান-আক্রোশের তাড়নায় তাহা চাহিতেছি কি না—তাহা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। ফলে, যখন কঠিন বাস্তব মুখব্যাদান করিল, এবং তাহার সহিত যুঝিবার যেটুকু পৈত্রিক শক্তি পূর্ব্বে ছিল, তাহাও হারাইয়াছি বুঝিতে পারিলাম, তখন নৈরাশ্যের আর সীমা রহিল না। যে জাতি কখনও রাজনীতির ছায়া মাড়ায় নাই, যাহার ধাতু-প্রকৃতিতে সেই কর্ম্মসংস্কার বা দূরদৃষ্টির প্রতিভা কখনও ছিল না, যাহার জীবন চিরদিন অন্য খাতে বহিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে স্বাধিকারনীতি, সাম্য ও সার্ব্বজনীন সহানুভূতি যাহাদের সামাজিক বা নৈতিক সংস্কারের বহির্ভূত, তাহারা যখন সহসা কতকগুলি 'আইডিয়া'র ভাব-রসে উন্মত্ত হইয়া একদা আন্দোলন সুরু করিল, তখন যাঁহারা সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে ও প্রাণে ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজী রাজনীতি যতটা প্রেরণা যোগাইয়াছিল, দেশের মূক মুগ্ধ জন-সমাজের চরিত্র ও সংস্কার, দেশের ইতিহাসের ধারার গভীরতর ইঙ্গিত তাঁহাদিগকে ততটা প্রণোদিত করে নাই। তাই ভাব-সর্ব্বস্ব উত্তেজনার বশে ক্রমাগত বিপথে ঘুরিয়া এবং

বার বার পরাহত হইয়া আজ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি নৈরাশ্যে ও অবসাদে অভিভূত হইয়াছে।

বাংলা দেশের প্রকৃত সমস্যা,—বাঙ্গালীর চরিত্রগত শক্তি ও অশক্তি; বাঙ্গালী-সমাজের গত চারি পাঁচ শত বৎসরের শাসন-ব্যবস্থা ও তাহার মূলগত অভিপ্রায়; আধুনিক অভিনব শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনে সেই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এবং তাহাতে জাতীয় আদর্শের বিপর্য্যয় প্রভৃতি—সকল সমস্যা ধীরভাবে দূরদৃষ্টি-সহকারে ধ্যান ও চিন্তা করিয়া, আমরা এই আন্দোলনকে পরিচালনা করি নাই। যে ইংরেজ-শাসনের আনুকূল্যে হিন্দু বাঙ্গালী নানা দিকে অগ্রগামী হইতে পারিয়াছে, সেই আনুকূল্যের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে কি না, যে সুবৃহৎ অপর সম্প্রদায় এই বাঙ্গালী-জাতির জ্ঞাতি-প্রতিবেশীরূপে মূক মৌনী হইয়া অতিশয় অবনত অবস্থায় দিন গণিতেছে, ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে তাহাদের সহিত কি ভাবে, কোন্ নীতির কৌশলে বসবাস করিয়াছি, তাহার সঠিক ভাবনা ও ধারণা, এবং এখনই বা য়ুরোপ হইতে ধার-করা জাতীয়তা-মন্ত্রের সাধনায় তাহাদের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যোগস্থাপনের জন্য কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে মিলন সম্ভব, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিয়া, এবং সমাজ-জীবনে বা ব্যক্তিগত মনোভাবে সেই পুরাতন নীতি সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিয়া, কেবলমাত্র একটা অন্ধ ভাবোন্মাদের 'ন্যাশনালিজ্‌ম'-এর মোহে আমরা এতকাল ছুটাছুটি করিয়াছি। দেশকে, জাতিকে, জাতির অতীত ইতিহাসকে, এবং জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষায় ধর্ম্ম ও নীতি-সংস্কারকে অগ্রাহ্য করিয়া—বৈদেশিক শিক্ষার কতকগুলি মতবাদ মাত্র সম্বল করিয়া যে কয়েকজন বাঙ্গালী নেতা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে রাজনৈতিক যুদ্ধে আহ্বান ও চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন প্রধান, তাঁহাদের

সহিত দেশের নাড়ীর যোগ ছিল না, দেশীয় সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রাণের যোগ তাঁহাদের ছিল না ; জাতির মজ্জাগত সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম-সংস্কার বুঝিবার, জানিবার বা সহানুভূতি-সহকারে বিচার করিবার সুযোগ ও শক্তি তাঁহাদের ছিল না। তাই প্রথম হইতেই তথাকথিত জাতীয়তার নামে আমরা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। এতবড় একটা বিপ্লব, সমগ্র জাতির জীবন-মরণ যাহার ফলাফলের উপর নির্ভর করে, যাহার পরিণাম সুদূর-প্রসারী—তাহার মূলে সেই পূর্ণজ্ঞান বা দিব্যদৃষ্টি ছিল না। ১৯০৪-৫ সালের সেই ভাব-প্লাবনের কথা এখনও অনেকের মনে আছে, কেমন করিয়া সেকালের যুবকসম্প্রদায়ের মনে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা আজও বুঝিতে পারি। সেই কালের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের সিংহনাদ বাংলার যুবক-ছাত্রসমাজে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল ; তারও পূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাবুক ও চিন্তাশীল মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর অতীত গৌরব উদ্ধার, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর কলঙ্কমোচন কল্পে এক অত্যুচ্চ আদর্শবাদমূলক সুগভীর কবিত্বপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দুই মহাপুরুষের দ্বারা কর্ষিত চিত্তভূমিতে অতঃপর যে বীজ বপন করা হইল, তাহার ফল ফলিতে বিলম্ব হয় নাই। সেকালের যুবক-সম্প্রদায় 'পলিটিক্স' বুঝিত না, তাহারা অত্যুগ্র আদর্শবাদী ছিল। আনন্দমঠ, গীতা, ভক্তিযোগ, ও শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—এই সকলের আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় তাহারা কেবল জীবন উৎসর্গ করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল—বাঁচিবার কথা কেহ ভাবে নাই। সেই আধ্যাত্মিক আবেগের আগুনে তাহারা ন্যায়-অন্যায়, সুমতি-কুমতি, পাপ-পুণ্য, নীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্ব ভস্মসাৎ করিয়াছিল—দেশ ও জাতি তাহাদের নিকটে একটা অবাস্তব মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কেবল আত্মত্যাগ ও আত্মঘাতের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। ভাবের

এই আগুন বেশিক্ষণ ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহার পরে পলিটিক্সের অতি স্থূল ও নগ্ন নীতিই জয়লাভ করিল। ভাবোন্মাদের প্রতিষেধক নানা সমস্যা ক্রমে চারিদিকে জটিল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল ; সেই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইবার বা সেগুলির সমাধানে চিন্তাশক্তি নিয়োজিত করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর রহিল না। এমনই করিয়া একটা ভাবোন্মাদ বা অবাস্তব আদর্শবাদের মোহে গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ এ দেশের যুব-শক্তি দিশাহারা হইয়া ক্রমে সর্ব্বপ্রকার নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে। সমাজে পরিবারে ভাঙ্গন ধরিয়াছে ; অস্বাস্থ্য ও অন্নাভাব প্রবল হইয়াছে, এবং তাহার ফলে অতি উচ্চ আদর্শবাদ হইতে একেবারে দুর্নীতির গভীরতম গহ্বরে অধঃপতন ঘটিয়াছে।

আজ যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশের সমগ্র চিন্তাশক্তি ও চরিত্র-শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাই কেন্দ্রীভূত করিয়া, আমরা যে ভুল করিয়াছি, সেই ভুল ভাঙ্গাইবার যত কিছু উপায় আছে, তাহার ভাবনা ও নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এখন সর্ব্বাগ্রে চিন্তার সত্য চাই, এবং সেই সত্য সর্ব্বত্র প্রচার করা চাই। নূতন আদর্শে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে না পারিলে জাতি-হিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। অর্থনীতি বা রাজনীতির জ্ঞান যতই প্রয়োজনীয় হউক—কোন জ্ঞানই প্রাণমূলে শক্তি সঞ্চার করে না, যদি জাতি প্রকৃতিস্থ না হয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে শিক্ষানীতি ও তাহার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। আজ যাঁহারা পুরাতন আদর্শে শিক্ষিত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহারা গত যুগেরই সেই ভাব-প্লাবনের শেষ কর্দ্দমস্তর—কোনও আদর্শ, কোনও সত্য-চিন্তা বা নিঃস্বার্থ-নীতি তাঁহাদের নিকট আশা করাই বৃথা। আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মরক্ষা ছাড়া তাঁহাদের জীবনে আন্তরিক লোক-কল্যাণ-কামনার প্রমাণ লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য আছে,

তর্কবুদ্ধি আছে, অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তি আছে—কিন্তু এ সকলের মূলে প্রেম নাই। লোকসাধারণের জন্য, জাতির সর্ব্বনাশ নিবারণের জন্য যে আকুল উৎকণ্ঠা মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে সদা-জাগরূক থাকে—ধ্যান, চিন্তা ও কর্ম্মে যে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়—সেই উৎকণ্ঠা কুত্রাপি নাই। রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রে আমরা স্থানবিশেষে যেটুকু স্বদেশানুরাগ লক্ষ্য করি, তাহাতে দিব্যদৃষ্টির পরিচয় নাই, বুদ্ধি বা প্রতিভার উন্মেষ নাই—তাহার কারণ, সে অনুরাগে সত্য নাই, শক্তি নাই। সমগ্র জাতিই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, স্বার্থপরতা হইতে কেহই মুক্ত নয়। দেশ বা জাতির চিন্তা দূরে থাক, ইহারা আপন বংশধর পুত্র-পৌত্রের ভবিষ্যৎ-চিন্তাও করে না—সে চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি নাই, কারণ—অক্ষম ও নিরুপায়। অতএব দেশের যদি কোনও ভবিষ্যৎ থাকে, যদি এখনও আশা রাখিতে হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশের দিকে তাকাইতে হইবে, নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে হইবে। এখন হইতে তাহার আয়োজন চাই, কুড়ি পঁচিশ বৎসর পরে যাহারা এই দেশে পূর্ণবয়স্ক হইয়া বাস করিবে, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। তার জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই পরিবর্ত্তনের জন্য সর্ব্বপ্রথমে চাই শিক্ষা কথাটির নূতন অর্থবোধ। আমার মনে হয়, বিগত এক শত বৎসর আমাদের দেশে যে অভিপ্রায় ও যে প্রণালীতে শিক্ষাদান হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষার ধারণাই অন্যরূপ হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিতে আমরা বুঝি—চাকুরিলাভ, এবং সেই সঙ্গে জাতি ও সমাজ হইতে পৃথক ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপনের গৌরব; আর্থিক সচ্ছলতা ও শহরের ভদ্র আবহাওয়ায় বাস করিবার মহাসৌভাগ্য—ইহাই শিক্ষালাভের পরম পুরস্কার। পাঁচজনে সভয়-সম্ভ্রমে দূর হইতে ঈর্ষা করিবে, আমার জ্ঞাতিবর্গ আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা

করিতে স্পর্দ্ধা করিবে না; শেষ পর্য্যন্ত, সরকারী উপাধিভূষিত হইয়া সর্ব্বকামনা চরিতার্থ করিয়া যখন মৃত্যুরূপ মোক্ষলাভ হইবে, তখন সংবাদপত্রে সচিত্র শোক-সংবাদ ছাপা হইবে, হয়তো বা শোকসভাও হইবে। ইহাই আমাদের শিক্ষালাভের চরম লক্ষ্য। এই শিক্ষালাভের প্রণালীও তদুপযুক্ত। কতকগুলি পুঁথির সাহায্যে শিশুকাল হইতে মনকে শাণিত ও স্বভাব-ধর্ম্মকে রুদ্ধ করিতে হইবে। পুঁথিগুলিতে যে সকল বাক্য আছে, সেইগুলিকে কোনওরূপে মগজস্থ করিয়া "পরীক্ষা" নামক যন্ত্রে এক একটা চিহ্নে চিহ্নিত হইতে হইবে। এই ছাপ নিজের মানসচর্ম্মে যে যত গভীর করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে পারে, সে-ই চাকুরির ক্ষেত্রে তত বেশি উচ্চস্থান লাভের অধিকারী, তাহার কলরব তত বেশি। যদি ছাপ-অনুযায়ী চাকুরি না মিলে, তবে আক্ষেপ ও আক্রোশের সীমা নাই। এই চাকুরির প্রতিযোগিতার ফলে জ্ঞাতি বন্ধু ধর্ম্ম সমাজ—সর্ব্বত্র মহা রেষারেষি, মনুষ্যত্বের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হইয়া যায়। যে প্রণালীতে ও যে আদর্শ ও অভিপ্রায় সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষার নামে এই ঘোরতর অকল্যাণকর প্রথা আমাদের দেশে প্রথমে অপ্রকট ও পরে ক্রমশ প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে—তাহার চিন্তা যে কেহ করিবেন, তিনিই শিহরিয়া উঠিবেন। অর্থোপার্জ্জন বা জীবিকা-সংগ্রহ মানুষমাত্রেরই জীবনের অতিশয় আবশ্যিক কর্ম্ম—কিন্তু শিক্ষালাভ করা বা মানুষ হওয়া যে তারও অপেক্ষা প্রাথমিক প্রয়োজন, এবং এই দুইয়ের অন্যোন্য-সাপেক্ষতা যতই সত্য হউক, আদৌ শিক্ষা যে শিক্ষার জন্যই, সে কথা আমরা বহুদিন ভুলিয়াছি। আধুনিক শিক্ষানীতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, কেমন করিয়া আমরা যে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এককালে শিক্ষা ছিল মেধার উৎকর্ষসাধন—একপ্রকার পাণ্ডিত্য-সাধনা। তখনও তাহার অন্তরালে জীবিকা-সংগ্রহরূপ

উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিদ্যমান ছিল ; তথাপি সেকালে পাণ্ডিত্যলাভের আগ্রহও কতক পরিমাণে ছিল, যদিও শিক্ষার মূল অভিপ্রায়—সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব-বিকাশের অভিপ্রায়, কোন কালেই ছিল না। উত্তরকালে প্রকৃত পাণ্ডিত্য বা মেধার উৎকর্ষ-সাধন এতই গৌণ হইয়া উঠিল যে, অবশেষে শিক্ষার সেটুকু সার্থকতাও আর রহিল না। আজকাল যাঁহারা উচ্চ-শিক্ষা শেষ করিয়া 'রিসার্চ' নামক তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহাতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বা বিদ্যার প্রতি বিশেষ আসক্তি বাড়িয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদলাভের কারণ নাই। উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই সকল ছাত্র অধিকাংশ স্থলে সদ্য অর্থলাভের আশায় যতদিন চাকুরি না হয়, ততদিন গবেষণাপ্রসাদে কিঞ্চিৎ বৃত্তিলাভের লোভে, এইরূপ 'তপশ্চর্য্যা' করিয়া থাকেন। যদি শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন, এবং তাহার ফলে আর একটা উপাধিলাভ ঘটে, তবে জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজন প্রায়ই আর থাকে না—সেই উপাধির সাহায্যে অতঃপর চাকুরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। সেই গবেষণা তাঁহাদের জীবনে অথবা দেশে জ্ঞান-বিস্তারের পক্ষে আর কোনও ফল প্রসব করে না। আজকাল এইরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ চাকুরির প্রতিযোগিতায়—দেশীমার্কা উমেদারের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, অতঃপর বিদেশ হইতে ছাপা হইয়া না আসিলে সকল বিদ্যা বন্ধ্যা হইবার সম্ভাবনা ; তাই দলে দলে বিদেশ-যাত্রার ধুম পড়িয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষিতের চরম আদর্শ।

শিক্ষার নামে এই অনাচার বহুদিন যাবৎ চলিয়াছে। ইহার ফলে জাতির চিত্ত কলুষিত হইয়াছে, স্বভাবগত মনুষ্যত্বও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে : উচ্চশিক্ষার অভিমান বাড়িয়াছে, অথচ, প্রকৃত শিক্ষা—

যাহাকে উচ্চ বা নিম্ন কোনও নাম দিবার প্রয়োজন নাই—সেই শিক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। দেহ, মন ও প্রাণ এই তিনের যুগপৎ পুষ্টিসাধন ; সত্য পিপাসার উদ্রেক ও তাহার পানীয় সংস্থান ; চরিত্র ও বুদ্ধির মিলিত শক্তি ; সমাজ ও গোষ্ঠীর সহিত নাড়ীর যোগরক্ষা ; দেশের ইতিহাস—তাহার অতীত ও বর্ত্তমানের তুলনামূলক জ্ঞান ; এবং সর্ব্বোপরি স্বার্থের সহিত পরার্থের সামঞ্জস্যবিধান—এক কথায় মানুষ হইতে হইলে মনুষ্যসন্তানের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার কোনটাই আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর লক্ষ্য নয়। দেশকে আমরা ভুলিয়াছি, পিতৃ-পরিচয় জানি না, বিদেশী শিক্ষার অন্তর্গত পরধর্ম্মের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া, কেবলমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যে তাহার আলোড়ন অনুভব করিয়া, জাতীয় সংস্কার বিসর্জ্জন দিয়াছি। নিজকে জানিতে চাহি নাই, আত্মীয়কে পর করিয়াছি, দেহের রক্তে যে বীজ নিহিত আছে, সে বীজের চাষ বন্ধ করিয়াছি। ক্রমাগত পরানুচিকীর্ষার ফলে প্রাণ-মনের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি হারাইয়াছি—দাস-মনোভাব মজ্জাগত হইয়াছে। আজ শিক্ষা-সংস্কারের যে নানা কলরব শোনা যাইতেছে, তাহার মূলেও সেই একই মনোভাব রহিয়াছে। সহজ সরল দৃষ্টি তাহাতে নাই—মনের কুটিল চিন্তায় তাহা আচ্ছন্ন, প্রাণের সাড়া তাহাতে নাই। শিক্ষানীতি অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক বা দলীয় কূটনীতি শিক্ষার নামে স্বার্থসাধনের সুযোগ পাইতেছে। মুখে বড় বড় কথা, কিন্তু আসল লক্ষ্য ভাগাড়ের দিকে। যাহারা গম্ভীরভাবে শিক্ষা-সংস্কারের চিন্তা করে, তাহারাও মাছি-মারা কেরানীর মত য়ুরোপীয় পদ্ধতির 'ট্রু কাপি' করিতে চায়। কোনও জাতির শিক্ষা-পদ্ধতি যে, তাহার পারিপার্শ্বিক ও প্রকৃতি—তাহার জীবনযাত্রা-প্রণালীর উপযোগী না হইলে, ফলপ্রদ হয় না, সে কথা আমাদের দেশের ময়ূরপুচ্ছধারী বায়স-সমাজ ভুলিয়া যাইতে পারিলেই গৌরব বোধ করেন। এক দেশের পক্ষে যাহা ঔষধ,

আর এক দেশের পক্ষে তাহাই বিষ। য়ুরোপীয় শিক্ষা-পদ্ধতি যে বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মূলে সার্ব্বজনীন তত্ত্ব থাকিলেও, অবস্থাভেদে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ-ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য ; তাছাড়া কোনও পদ্ধতি কখনও সর্ব্বত্র সমান উপযোগী হইতে পারে না। তার কারণ, জীবনযাত্রার প্রণালীভেদ আছে, এবং সর্ব্বোপরি, কোনও জাতির মানস-প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, বহুকালাগত তাহার সেই স্বধর্ম্ম একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল মনোবিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের উপরেই নির্ভর করিলে সুফল লাভ হইবে না।

আমাদের বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ সমস্যার মূলে এই শিক্ষার সমস্যা রহিয়াছে। কেমন করিয়া কি করিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান লেখকের নাই। আমার এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য তো নাই-ই, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নাই। আমি আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করি নাই, আমি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির গবেষক নহি—আমি কেবল দেশের বর্ত্তমান অবস্থার নানা লক্ষণ, জাতির ঘোরতর মুহ্যমান অবস্থা চাক্ষুষ করিতেছি এবং তাহারই অতিশয় সরল ও সহজ কার্য্যকারণঘটিত প্রশ্ন নিজ মনে বহুদিন চিন্তা করিয়াছি। তাহার ফলে আমার প্রতীতি হইয়াছে, সর্ব্বপ্রথমে এই শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে—মানুষ গড়িয়া তোলা। স্বাস্থ্য, চরিত্র ও কর্ম্মবুদ্ধি, আত্ম-প্রত্যয় ও চিত্তশুদ্ধি, এবং সাধারণভাবে মনুষ্যজগতের সহিত পরিচয় ও বিশেষভাবে আত্মপরিচয়—নিজ জাতির ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান—এই সকল অর্জ্জন, উদ্বোধন ও সংবর্দ্ধন শিক্ষার মূলীভূত অভিপ্রায় হইবে। ইহার ফলে বালক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন সে অন্তত ততটুকু দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী হইবে, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে সে কিছুতেই নৈরাশ্যকাতর হইবে না, এবং অবস্থা যেমনই প্রতিকূল হউক, তাহাকে অনুকূল করিয়া তুলিতে পারিবে। এ যাবৎ কাল, যেমন, 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'—এই মন্ত্রেই সে হাতে-খড়ির সময় হইতে দীক্ষালাভ করে, এবং জ্ঞান ও বয়সের বৃদ্ধিসহকারে চাকুরি-ফলপ্রদা বিদ্যারই সাধনা উত্তরোত্তর একাগ্র মনে

করিয়া থাকে, ও তাহার ফলে নিজের আত্মাকেও ভুলিয়া যায় ; আত্মশক্তি, চরিত্রবল বা ধর্ম্মবুদ্ধি কিছুই আর থাকে না, পরিশেষে চাকুরিও মরীচিকার মত কেবল দূরেই সরিয়া যাইতে থাকে—তেমন আর হইবে না, চাকুরিকেই মুখ্য না করিয়া গোড়া হইতেই মনুষ্যত্বকেই মুখ্য করিয়া ধরিলে পরিশেষে চাকুরিহীন মনুষ্যত্ব তাহাকে যতখানি বাঁচাইয়া রাখিবে,—মনুষ্যত্ব ও চাকুরি দুইয়েরই অভাব তাহাকে সেটুকু বাঁচাইয়া রাখিবে না। এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সংস্কার প্রভৃতি হুজুগ ত্যাগ করিয়া, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় মনোভাবই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সরস্বতীকে চাকুরি-দেবতার পাদপীঠরূপেই বজায় রাখিয়া, তাঁহার অঙ্গ-সংস্কার করিতে যাওয়া নিতান্তই আত্ম-প্রবঞ্চনা। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমূল উৎপাটন করিয়া একেবারে নূতন ভিত পত্তন করিতে হইবে—এক পক্ষে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার মোহ এবং অপর পক্ষে তাহার ব্যবসাদারীর উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কথাটা শক্ত হইল এবং বড় লম্বা শোনাইল তাহা জানি, তথাপি এ ক্ষত প্রলেপ দ্বারা আরোগ্য হইবে না। শিক্ষা যাহা হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পুস্তকের বোঝা এবং তাহার অনুপাতে বিদ্যার পরিমাণ—শিশুপাঠ্য পুস্তকেরও রচনা, সঙ্কলন ও নির্ব্বাচন-প্রণালী—শিক্ষার দুর্ম্মূল্যতা ও 'পাসের' সুলভতা—এ সকল লক্ষ্য করিলে, এই মুমূর্ষু জাতির উপরে এই প্রকার নির্ম্মম প্রবঞ্চনা অসহ্য বলিয়া মনে হয়। "শিক্ষিত যুবকের বেকার অবস্থা"—এইরূপ বাক্য আজকাল বহু-প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বাক্যের প্রথম অংশ সম্বন্ধে কেহ সন্দেহও করে না। "বেকার অবস্থা" কথাটা সত্য, কিন্তু "শিক্ষিত যুবক" কথাটা কোনও অর্থে সত্য কি? এই "শিক্ষিত" নামটির আলেয়ার পশ্চাতে দলে দলে যাহারা ছুটিতেছে, তাহারা বেকার হইবে না তো হইবে কাহারা? আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তারা তাহা স্বীকার করিতে নারাজ—তাঁহারা এইরূপ শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইয়া এবং আরও বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল হইয়া উঠেন। ইহার মূলে জাতির প্রকৃত কল্যাণ-কামনা কতখানি আছে, তাহা বিচার না করাই ভাল। ব্যক্তিগত প্রভাব, প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব-গৌরব, এবং

তৎসহ মূঢ় ও মোহগ্রস্ত সমাজে "পাস"-বিক্রয়ের ব্যবসায়টি অক্ষুণ্ণ রাখা ভিন্ন, অর্থনাশ মনস্তাপ ও আয়ুক্ষয়ের এই বিরাট যন্ত্রটিকে সচল রাখিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—অন্তত জনসাধারণের পক্ষে ইহার কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজনবোধ থাকিত, সন্তানকে শিক্ষিত করিবার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ উদ্‌গ্রীব হইত, তাহা হইলে শিক্ষকগণের এমন দুরবস্থা হইত না—স্কুলমাস্টারকে সমাজে পতিত হইয়া থাকিতে হইত না; শিক্ষকতায় যেমন যোগ্যতার আবশ্যক হইত, তেমনই তাহার মূল্য ও মর্য্যাদাও থাকিত; এবং পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নও এরূপ প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় হইয়া উঠিত না। নিত্যনব মুদ্রিত রাবিশের স্তূপ প্রতিবৎসর একদফা পরিষ্কার করিয়া ও আর একদফা ক্রয় করিয়া বালকের ইহকাল ও অভিভাবকের পরকাল খোয়াইতে হইত না।

আমি সমস্যার মূল সন্ধান করিয়াছি, বর্ত্তমান ও জাতীয় সঙ্কটের বিষয় যেদিক দিয়াই চিন্তা করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ঐ এক মূল কারণে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ধর্ম্মহানি ও চরিত্রের অধঃপতনই এ জাতির আসন্ন মৃত্যুর নিদান—মনুষ্যত্বের কোনও লক্ষণই আর কোথাও দেখা যাইতেছে না। এককালে জোর করিয়া ফুল ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছিল—গাছের দিকে আমরা লক্ষ্য করি নাই, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করি নাই, মূলে রস-সঞ্চারের ভাবনা ভাবি নাই—সদ্যফলপ্রাপ্তি আশা করিয়াছিলাম। আজ এখনও যদি সত্য ও শুভবুদ্ধির উদয় হয়, যদি ফল ও ফুলের প্রত্যাশা একটু দূরে রাখিয়া একেবারে মাটির কাজে হাত লাগাইতে পারি, উপর হইতে লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া নীচে নামিয়া নীরবে কাজ সুরু করিতে পারি, তবেই এখনও বাঁচিলেও বাঁচিয়া যাইতে পারিব। দেশে এখন সবচেয়ে বড় শুভ ঘটনা হইবে—"The school master is abroad"; এই ঘটনা ঘটিতে হইলে চাই সত্যসন্ধ মহাপ্রাণ মনীষীকে—রাজনীতি নয়, প্রাণ-ধর্ম্মনীতির উপদেষ্টাকে। দেশ এক্ষণে সেই মনীষা ও মহাপ্রাণতার প্রতীক্ষাই করিতেছে।

ভৌতিক

[শ্রীভূতনাথ ভড় একজন অতি-আধুনিক কবি। তাঁহাকে একদিন 'প্রভাতের শিশির' বিষয়ক একটি কবিতা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে একটি কাগজের টুকরায় লেখা ছিল—'আপনার জন্য সুবোধ্য করিয়া লিখিলাম।' তথাপি কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকিল না। অতি-আধুনিক-কাব্য-সমালোচক বহু ডিগ্রীধারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্ষোৎফুল্ল মাইতি মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে টীকা লিখিয়া দিয়াছেন। পড়িয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা একা ভোগ করিয়া সুখ হয় না, সেইজন্য আপনাদেরও আহ্বান করিতেছি—আসুন, ধন্য হউন।]

নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে আকম্পিত শিশির-কণিকা—
রাবীন্দ্রীয় ভাষায়, ক্ষণিকা!
আমি আধুনিক কবি,
এই ছবি
মোর চক্ষে দীপ্যমান হয় নব-রূপে।
শতাব্দীর কূপে
যে কূপমণ্ডুক
আপিঙ্গল হর্ষোচ্ছ্বাসে নিজ দুঃখ সুখ
রোমন্থন লাগি
ধ্যানমগ্ন কর্কটেরে করেছে বিবাগী,
বর্ষা-স্ফীত তারই অহঙ্কার
বারম্বার
উদ্বেলিত করে বারিরুষে,
যেথা মরে ফুঁসে

(সন্ধানিয়া শঙ্খচিল-ছল)
পল্লব-আগ্রহী লক্ষ বাদুড়ের দল,
উৎসারিয়া ম্যমির মিনারে
(ভূর্জ্জ-মুগ্ধ তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়ন-কিনারে)
টেরোড্যাক্‌টাইলের অতীত-ভবিষ্য-লক্ষ্য
অধুনা-বিলুপ্ত-পক্ষ
যার বাণী
বলে, সাজো—সাজো
হে মালকোষ, এরোপ্লেনে বাজো
কমিউনিজ্‌ম-ক্ষুব্ধ বাজো মধুটুসি
তন্দ্রালু পতঙ্গ-বক্ষে বাজো মহাখুশি
বাজো সব, কোন ভয় নাই
দন্ত-হীন হে দন্তুর, ফোঁপরা ফানুসে মার ঘাই,
নির্ব্বিশেষে পার যতক্ষণ
গিরগিটির পুচ্ছ-প্রান্তে ই-বোটের তোল শিহরণ।
বল তুমি বল হে বিদ্রোহী
পাংশু নিন্দা সহি
শিশিরের ক্ষুদ্র বুকে শালিকেরা হেরে বিশ্বরূপ!
সহসা নিশ্চুপ…
নিঃশেষ হইয়া আসে নাৎসীয় ধূপ
শতাব্দীর কূপ!
পর্ব্বত সমুদ্র নদী খাল বিল খানা ডোবা চর
সমস্ত ধূসর।

[টীকা : স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কবি এখানে শতদ্রুনদীর কথা চিন্তা করিতেছেন। নিজস্ব আধুনিক পদ্ধতিতে শতদ্রুনদীর এমন বর্ণনা অন্য কোথাও আছে বলিয়া আমার জানা নাই।]

ধূসরের আধূম্র নীলিমা
অতিক্রমি হরিদ্রাভ সীমা
আকপিশ গোলাপীর তীরে আসি থামে
বল্লরী-বল্লভ-দেহ ভিজিয়াছে ঘামে।
কহে বারে বারে
'ঘোলা জলটারে
থিতাইতে দাও'
এ বাণী যে বলেছিল নহে সে ফারাও।
চেনো তারে?
লাউৎজেরে?
জরথুস্ত্র হাসে অট্টহাসি
সে হাস্যে উচ্ছিত হয় শড়া, গলা, বাসী
(আহিরমন্ ভয়ে কম্পমান)
আগ্রহ-তৎপর বজ্র করেছিল যার অবসান
চেনো তারে?
হেরিছ নীহারে!!
প্রায়-মানব, তক্ষশীলা, শব্দব্রহ্ম, সাকী হে শর্করা
(সাবেক 'পুরাণ' লয়ে আধুনিক বাজারে দর করা!)
চন্দনিত শিব-লিঙ্গে অন্ধভক্তি গন্ধ-বণিকের
নহে ক্ষণিকের
নহে আবশ্যিক
আবার ধূসর চারিদিক।

[টীকা : ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর Orville Wright একটি বাই-প্লেনে প্রথম আকাশ-যাত্রা করেন ১২ সেকেণ্ডের জন্য। এই ঘটনাটির আভাস যদিও উক্ত লাইনগুলির ফাঁকে ফাঁকে আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, কবি তাঁহার অনুপম ভঙ্গিতে 'Mendelian conception of gametic differentiation'কেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন।]

পুনরায় দেখা যায় কচি কচি আলো
(ঈষৎ পেট্রোল-গন্ধী, আতপ্ত, প্যাঁচালো—)
মাইরি-মোহন দ্বীপ
জিপ্ জিপ্ জিপ্ জিপ্
হাঁসের বাসর-ঘরে হাঙরের হাসি !
হরিকেলে বাস করে আসি
ইচিং—চৈনিক
জ্ঞান-মার্গী আজব সৈনিক
অতি দূর সপ্ত শতাব্দীর !
পাঞ্জাবি আদ্ধির
মান-রক্ষা করে যথা জাল-গেঞ্জিগুলি,
নাতি-শীতোষ্ণ পুলি
পিসীমার,
জীবন-বীমার
অন্তর্লীন আত্মা জেনো ডাক্তার তেমতি,
ডিগ্রী-ডাহুকেতে চড়ি এরা নাহি হ'লে শুভ-মতি
ঘনিষ্ঠ ঘুণেরা আসি সাফ ঝাঁপতালে
নিঃশেষ করিয়া দিত জালা-ভরা চালে,
খঞ্জ নাহি হইত খঞ্জন

কাদাখোঁচা হইত না কর্দ্দমরঞ্জন,
শফরী-নয়না কভু নাহি হ'ত গবাক্ষ-প্রেয়সী
মৃত্যু-মুখী মোটরেতে বসি।
হাসিতেছে ধাঙড় মুস'র
সমস্ত ধূসর।

[টীকা : এই অংশটিকে মন্ত্র-সপ্তকে Pataeozoic বলা চলিতে পারে নিশ্চয়ই, কিন্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সহিত তুলনা করিলে এই অংশটাই জিতিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। শঙ্করাচার্য্য এবং কন্‌ফ্যুসিয়সের বিখ্যাত উক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য]

ধূসর কুয়াশা পুন কাটে
বসি মহাকাল-খাটে
চালাইয়া ত্রিকাল-কঙ্কতী
জটা সংস্কারে মন দিয়াছেন ধূর্জ্জটি সম্প্রতি।
কঙ্কতিক-ভরা
অসংখ্য উকুন পড়ে ধরা
জেপেলিন, এরোপ্লেন কিলবিল করে ঝাঁকে ঝাঁকে
কঙ্কতিকা-দন্ত ফাঁকে ফাঁকে ;
ক্ষিপ্ত মহেশ বুঝি হয় নটরাজ !
'চোখ-খেকো, নাই তোর লাজ'
উদ্যত করিয়া ঠোনা কহিল কল্পনা
'স্পর্দ্ধা তোর দেখি তো অল্প না !
ভাল ক'রে দেখ আরবার
একি কারবার !
উক্ত চিত্র উক্তভাবে সে-কালীয় কবি দেখিবেন।
তুই দেখ যেন বিগ বেন

ভাগ্‌নরীয় উচ্ছ্বাসেতে মধ্যরাত্রি করিছে ঘোষণা ;
সে ক্যাপিট্যালীয় ছন্দ মরম-শোষণা
প্রোলিটারিয়েট-মার্কা পুকুরের ধারে
আছাড়ি পড়িছে বারে বারে
বুর্জোয়া-ভঙ্গিমাভরে আথালি-পাথালি,
(নিষুতি নয়ন 'পরে নিদালি রাতালি)
বোকনো মাজিবার ছলে যেথা আবলুশিকা
চতুরা মূষিকা
নিত্য ফেলে কাটি
মর্ম্ম-পেটিকাটি ;
যে রক্ত-গোধিকা
ধরণী-শোধিকা,
যে স্বর্ণ-দর্দ্দুর
স্বর্ণকার-দর্প করে চুর,
এরা তুচ্ছ যার কাছে
তুই দেখ তাহার ছোঁয়াচে
জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্ব চরাচর
সমস্ত ধূসর ।'

[টীকা : 'মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ' নাম দিয়া বিবেকানন্দ ১৫৬ পৃষ্ঠাব্যাপী যে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়াছেন, তাহা কত সংক্ষেপে কত সুন্দরভাবে এবং কত নূতনত্ব সহকারে বলা যায়, এই লাইনগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া, কবি-মনে সাধারণ বস্তুনিচয় sublimated হইয়া যে কি অপরূপ অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তাহাও এই অংশটিতে দ্রষ্টব্য। Theory of Relativity, fourth dimension, pre-existence of time সমস্তই কত সহজে ব্যক্ত হইয়াছে !]

ধূসরের যবনিকা কে আবার তোলে !
পুনরায় দোলে
বিনতা-অগুজ মায়া
অসমাপ্ত অরুণের কায়া
বরুণের বাষ্প-দেহে তুলিতেছে ফিজিক্স ফচলায়ে।
দেখিলে কচলায়ে
যদিও ধূসর সব
মাঝে মাঝে তবু যেন করি অনুভব
অধূসরও আছে কিছু এই ধরণীতে।
সরণীতে
শরাবখানায়
'ভিব্‌জিওর' মাঝে মাঝে হয়তো মানায়।
আমি কিন্তু কভু তারে করি না স্বীকার
মধ্যবিত্ত এ রুচি-বিকার
নহে মোর মজ্জাগত,
ক্রথনক-শঙ্কাহারী আমি জয়দ্রথ
প্রতিবাদ অনিবার্য্যের,
ফুলঝুরি-বেড়া-দেওয়া বুটিদার কারুকার্য্যের
আমি কর্ত্তা করণ কারক,
হায়েনার বুক-ভরা থুক কাসি আমার স্মারক।
শ্যামল উষর
মোর কাছে সমস্ত ধূসর।

[টীকা : মুচুকুন্দফুলের সৌরভে যাঁহারা মুগ্ধ হন, তাঁহারা এই অংশটুকুর অর্থ বুঝিতে পারিবেন না। মঙ্গলগ্রহে ইউরোফোনাস ফস্‌ফরিকা নামে এক প্রকার গন্ধগোকুল-

জাতীয় প্রাণীর পুচ্ছাগ্র হইতে যে অপার্থিব সৌরভ নিঃসৃত হইবার কথা, কবি তাহারই গন্ধে বিভোর হইয়া উক্ত পংক্তিগুলি রচনা করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে যে, অবচেতন লোক হইতে বহির্মুখী ঈপ্সাকে চাপিতে গিয়া এই কাণ্ড হইয়াছে। তাহা যে সত্য নয়, তাহার প্রমাণ Frost control করিয়াও কবির কল্পনা Clyde Bank-এর Ship yard-এর অবস্থা প্রাপ্ত হইল কি করিয়া? নানাবিধ হায়াসিন্থ-ফুলের বর্ণ-গৌরবও বা এমন মুন্সিয়ানার সহিত এই অংশটির প্রতি ছত্রে ছত্রে প্রকটিত করিলেন কি করিয়া যদি ইউরোফোনাস্ ফস্ফরিকার গন্ধ-মদিরা তাঁহাকে বিহ্বল না করিয়া থাকে!]

ঈষন্ম্যাকা কোকিলের খানদানি ক্ষোভ-ক্লান্ত স্বর
ফ্যাকাশে ধূসর।
সে ধূসরে ব'সে আছে কাবুলিয়া মেনি
পিচুমর্দ্দ-শাখে বসি কাঁদে যাজ্ঞসেনী।
বাজায়ে রবাব
রাহু খায় চাঁদের কাবাব:
আমরুল-চাঁপ
রোধ করে অ্যামিবা-প্রতাপ:
কিসের আশ্বাসে
পাণ্ডবেরা হাসে!
অপরাহ্ণ গত
বৃষ্টি পড়ে ছোরলের মত।
সন্ধ্যা নামে
ট্রামে।
যাযাবর কাকে!
পাউডার-পাফে
সিনেমা-সখীরা হাঁচে
অলিম্পিক নাচে।

ঠারেঠোরে
পাখা ঘোরে।
মেকি বেঁকি চুড়ি পরি ঢেঁকিতে পা দিয়া
এক্কের প্রিয়া
এক্কা ছাড়া সকলেরে করে আবাহন
বাজায়ে কাঁকন;
ফাঁকে ফাঁকে
হুঁকা ডাকে।
কম্বুকণ্ঠ মিতা
অসীম আগ্রহে খোঁজে ফিতা
বাণীহীন বাণীকণ্ঠ লাগি,
লণ্ঠনের ফিতা নাই অন্ধকারে রয়েছে সে জাগি।
মরে হেসে ডাক-টিকিটেরা
উকিল মক্কেলে করে জেরা।
ফলসাগাছের বাঁকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
মাছের ছানারা
চেলো-যন্ত্রে বাজায় কানাড়া।

[টীকা: Xenophone স্মরণ করুন।]

নৈঋত উৎসাহভরে জম্বুক অশ্লীল হয়;
অবিমিশ্র ভয়
হয় তিক্ত
হয় সিক্ত।
নিরঙ্কুশ নভস্তলে
শ্রেণীবদ্ধ আরসোলা সামরিকভাবে উড়ে চলে
লক্ষ লক্ষ সারে সারে!
গুজব বাজারে
নারীরে করিতে জব্দ পৃথিবীর ক্ষিপ্ত পুংগণ
ছাড়িয়াছে অগণন

সুদক্ষ আরসোলা।
ব্যাঙ কোলা
শিক্ষা লভিতেছে বসি গুপ্ত কোন শিবির-ভিতরে
বাহিরিবে পরে।
অতি-সান্ত বেদান্তের অপূর্ব্ব চিন্তন!
মিল ও অমিলে চলে চুলাচুলি দ্বন্দ্ব চিরন্তন
বাসী গজকচ্ছপীয় সুরে,
হে কাশ্যপ, আছ কত দূরে!
হেনকালে রগ-প্রান্তে
বিয়াত্রিচে সহ আসি বসিলেন দান্তে।
ইতালীয় গোনাডের ঝড়ে
রগ ছিঁড়ে পড়ে।
মুর্খ বুজি
মনীষা-ঠেকনো গুঁজি
রুখিলাম তাহা।
তারপর দেখিলাম, আহা,
বিয়াত্রিচে-আঁখি দুটি, মাই গড, গুজরাটী-ধূসর!
সুষমা-সু-শর।
নাতিদীর্ঘ ধূসরের আমন্থর পট-ভূমিকায়
জাগে কবি
খোশামোদ-লোভী।
ডি শার্পে শোনা যায় বাস্তঘুঘু-স্বর
'আমি আছি, ভয় নাই যাহা খুশি কর—"
দেখিলাম শেষ করি লিখা
নব দূর্ব্বাদল-শীর্ষে শুকায়েছে শিশির-কণিকা।

[টীকা : ইকনমিক্সের সহিত জুওলজির প্রকৃত সম্পর্ক কি এবং সে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কি করিয়া আলু চাষ করা সম্ভব, তাহাই এই অংশটুকুর মূল বক্তব্য।]

"বনফুল"

দিল্লীকা লাড্ডু

নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ যে করে, সে মন্দ লোক হইতে পারে; কিন্তু সে যে সাহসী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কারণ নাক-কাটা ব্যাপারটি তো সহজ নয়; এমন কি ব্লেডের এক প্যাঁচে কাটিবে—ইহা নিশ্চিত জানিয়াও কাটিবার পূর্ব্বে সাত পাঁচ ভাবনা হয়। সেই ভাবনাই তো ভয় এবং সেই ভয়েই সংসারে শতকরা নিরানব্বই-জন একজনের কাটা নাক দেখিয়া যাত্রাভঙ্গ করিয়া বসিয়া থাকে।

আমাদের গ্রামের হীরেন মুখুজ্জের মত নিরীহ-প্রকৃতির ব্যক্তিটি যে অকস্মাৎ খোলস ছাড়িয়া সেই একজন হইয়া দাঁড়াইতে পারে—এ ধারণাই কেহ কোন দিন করিতে পারে নাই। এ যেন বল্মীকস্তূপের অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরিরূপে আত্মপ্রকাশ।

চল্লিশ বৎসর বয়সে সাত সাতটি পুত্র কন্যা সত্ত্বেও হীরেন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া বসিল। বড় পুত্রটির বয়স উনিশ; দ্বিতীয়া কন্যাটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে; বাকি পাঁচটি পনরো হইতে তিন পর্য্যন্ত, হার্‌মোনিয়মের রিডের মত সারিবন্দী দাওয়ায় বসিয়া ক্রন্দন ও কোলাহলের অবিরাম বেসুরা কোরাস জমাইয়া রাখিয়াছে। হীরেনের বিবাহ হইয়াছিল তেরো বৎসর বয়সে; উপনয়নের পর ন্যাড়া মাথায় টোপর পরিয়া নয় বৎসরের বধূকে সে ঘরে আনিয়াছিল। তাহারও আগে বধূ ছিল একেবারে ঘরের পাশেই। দুই বাড়ির মধ্যে কেবল একটা গলির ব্যবধান। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর বিবাহিত জীবনে হীরেন কখনও রাত্রি নয়টার বেশি নয়টা এক মিনিট পর্য্যন্ত বাহিরে থাকে নাই; তাও স্টাণ্ডার্ড টাইম নয়, ক্যালকাটা টাইম। শুধু তাই নয়, এই সাতাশ বৎসর ধরিয়া একবেলা

ভাত রাঁধিয়াছে, সকালে বিছানা তুলিয়াছে, ছেলেদের স্নান করাইয়াছে, স্ত্রী সূতিকাগারে প্রবেশ করিলে ছোটগুলির বিছানা কাচিয়াছে, রৌদ্রে দিয়াছে। সুতরাং ছেলেগুলিকে মানুষ করিবার অজুহাতে যে একটি তরুণীর প্রয়োজন, এটা নিতান্তই বাজে কথা। পুরুষমহলে হীরেনের এই অকল্পিত সাহসিকতায় তাক লাগিয়া গেল। তাহার উপর বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে না কাটিতে তাহারা অনুভব করিল, জীবন-পথে তাহাদের যাত্রাভঙ্গ ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়াও চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

শ্যামের স্ত্রী রাত্রে স্বামীর হাতখানা সরাইয়া দিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, যাও যাও, পুরুষ-জাতের মুখে আগুন। তোমাদের ছুঁলে পাপ, গঙ্গাস্নান করতে হয়।

শ্যাম এ আকস্মিকতায় ঘাবড়াইয়া গেল। একেই স্ত্রীকে সে বাঘিনীর মত ভয় করে; তাহার উপর অকস্মাৎ তাহাকে উল্কামুখী হইতে দেখিয়া বুকটা তাহার টিপ্‌টিপ করিয়া উঠিল, সে আজই লোহার কাঁটা দিয়া স্ত্রীর বাক্স খুলিয়া চারিটি সিকি সরাইয়া ফেলিয়াছে। না ফেলিয়াও বেচারার উপায় ছিল না, বিড়িওয়ালা বেনে মামার কাছে দেড় টাকার উপর ধার জমিয়া উঠিয়াছে; সে আর ধার দিবে না বলিয়া নোটিস দিয়াছিল। শ্যামের বরাদ্দ দৈনিক এক পয়সার বিড়ি, কিন্তু তাহাতে তাহার কুলায় না। এক পয়সায় দশটা বিড়ির মধ্যে পাঁচটা যায় দোক্তা হিসাবে, বাকি পাঁচটায় কাহারও দিন চলা অসম্ভব।

স্পন্দিত বক্ষে শুষ্ক মুখে শ্যাম তাহার পেটেন্ট 'হে-হে' শব্দে বোকা হাসি হাসিয়া বলিল, কেন, কি হ'ল কি? করলাম কি?

চিরেতা খাওয়ার মত মুখভঙ্গি করিয়া স্ত্রী বলিল, হেসো না, আর হেসো না, বুঝলে? "বাঁদরের মুখ পোড়ে আর বাঁদর হাসে,—বলে, এ কি সৌভাগ্য হ'ল আমার", সেই বিত্তান্ত!

শ্যাম উষ্ণ হইয়া উঠিল, বাঁদর হইবার কামনাই তাহার জাগিয়া উঠিল, লেজ গজাইলে সে স্ত্রীর গলায় জড়াইয়া কণ্ঠরোধ তো করিতই, উপরন্তু বালি-রাবণ-সংবাদের মত সাত ঘাটে চুবাইয়া লোনা জলের সাহায্যে ভিতরের সমস্ত বিষ উদ্গীরণ করাইয়া ছাড়িত। লেজের অভাবে সে দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে তুমি বাঁদর বলছ?

তাহার মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিয়া স্ত্রী বলিল, বলছি বলছি বলছি। শুধু তোমাকে নয়, গোটা পুরুষ-জাতকে বলছি। সাত সাতটা বেটা-বেটী থাকতে চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করতে তোমাদের লজ্জা করে না? তোমরা সবাই হীরেন মুখুজ্জে।

সাপের মাথায় ইসের মূল পড়িল; শ্যাম একবারে ফণা গুটাইয়া ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মত ঘুমাইয়া পড়িল। আবার সে তাহার পেটেন্ট 'হে-হে' করিয়া বোকার হাসি হাসিয়া বলিল, তা তুমি বলেছ ঠিক। হে—হে—হে; কিন্তু সবাই তো আর হীরেন—

সবাই, সবাই, গোটা পুরুষ-জাতটাই হীরেন।

শ্যাম মহা বিরক্ত হইয়া হীরেনকে গাল দিয়া উঠিল, শা—লা!

রামের বাড়িতেও সেই অবস্থা।

রাম লেখাপড়া-জানা লোক; শুধু লেখাপড়া জানাই নয়, সে একেবারে আধুনিক, যাহাকে বলে মডার্ন। তাহার স্ত্রীও শিক্ষিতা মেয়ে, ফেরতা দিয়া কাপড় পরে, হাই-হীল জুতা পরে, চোখে চশমা দেয়; বব ছাঁটে না কেবল চুলের বাহারের জন্য; চুলগুলি তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ এবং উপলসঙ্কুল ঝরনার মত ঢেউ-খেলানো।

রূপার তৈয়ারি দেশী দাঁত-খুঁটনির ভঙ্গিতে ঠোঁটের এক দিক বাঁকাইয়া রামের স্ত্রী বলিল, রাম সীতার শোকে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন,

ওটা বাজে কথা। বাল্মীকি আর শিশির ভাদুড়ীর সাজানো কথা। আসলে তিনি আর একটা বিয়ে করতে না পেয়ে পাগল হয়েছিলেন।

রাম একখানা বই পড়িতেছিল—ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, সে মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, বাল্মীকিকে তুমি দেখই নি, শিশির ভাদুড়ীর রাম-রূপও কিন্তু তোমার মনের মধ্যে এখন নেই, এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি। মনে মনে তুমি দেখছ হীরেন মুখুজ্জেকে, আই অ্যাম সিওর।

বুদ্ধি এবং শিক্ষার জোরেই তোমরা এতদিন তোমাদের বর্ব্বর রূপ ঢাকা দিয়ে নিজেদের ঢাক বাজিয়ে এসেছ—এ কথাটা হাজার বার স্বীকার করি। হীরেনের মধ্যে যে পুরুষ-প্রকৃতি, সেটা অবশ্যই রামের মধ্যেও ছিল এবং তোমার মধ্যেও আছে, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে।

স্বীকার করলাম। কিন্তু হীরেন বিয়ে করায় তোমার ক্রোধের হেতু ফ্রয়েড-অনুসারে—

কি? হাজার বাতির সমকক্ষ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের সুইচ কে যেন 'অন' করিয়া দিল, শিক্ষিতা স্ত্রী ভদ্রভাবে তীক্ষ্ণতম স্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ক্রুট কোথাকার!

পরমুহূর্ত্তেই যেন ফিউজ হইয়া গেল, ঘরখানাকে অন্ধকার করিয়া দিয়া সে অন্তর্হিত হইল। আধুনিকা হইয়াও সনাতন গোসা-ঘরে খিল দিল। রাম কিছুক্ষণ চেষ্টা করিল আবার বইয়ে মন দিতে। কিন্তু হাজারো রকমে মনকে বিশ্লেষণ করিয়া মনকে একাগ্র অথবা শান্ত করিতে পারিল না। বইখানাকে রাখিয়া দিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে সে ভয়ানক চটিয়া উঠিল হীরেনের উপর, দূর হইতেই তাহাকে উদ্দেশ করিয়া গালি দিয়া উঠিল, বীস্ট!

গ্রামের এই নর-নারী-সংবাদ হীরেনের কানেও উঠিয়াছিল। সে কিন্তু মোটেই লজ্জিত হইল না বা দমিল না। বল্মীকস্তূপ অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরি হইয়া উঠিয়া কেবল অগ্ন্যুদ্গারই করিতে আরম্ভ করিল; প্রকাশ্য পথেই সে আস্ফালন আরম্ভ করিল, কুছ পরোয়া নেই, এ তো বউ ম'লে বিয়ে করেছি, এবার একটা থাকতেই আর আবার বিয়ে করব। এক আধটা নয়—পাঁচ দশটা, দেখি কে কি করে আমার! চালাও পানসী।

হীরেনের সাহস দেখিয়া সমস্ত পুরুষ-সমাজ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু গোপনে। প্রকাশ্যে তাহারা তাহাকে গালিগালাজ করিয়া আকাশ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া দিল।

* * *

হীরেনের আস্ফালনের সংবাদ পাইয়া মেয়েরা যেন রণরঙ্গিণী হইয়া উঠিলেন, পুরুষদের জীবন বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। দায়ে পড়িয়া সকলে ভগবৎ-ভক্ত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ গোপনে গিরি-মাটির সন্ধান করিতে লাগিল। শ্যাম বেচারা প্রায় মুমূর্ষুর মত হতবাক হতচেতন হইয়া শবের মত এলাইয়া পড়িল; কিন্তু কাল কলি বলিয়া শাস্ত্রও মিথ্যা হইয়া গেল, শ্যামের স্ত্রী হতচেতন স্বামীর বুকের উপর প্রায় নাচিতে লাগিল, তবু জিব কাটিল না।

ঠিক এমনই সময়ে—যে ভগবান যুগে যুগে সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হন—তিনিই বোধ হয় দুঃস্থ পুরুষগণের দুঃখ মোচনের জন্য অবতীর্ণ না হইয়াও পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিলেন। চাকা ঘুরিয়া গেল। গাঙ্গুলীদের ছেলে নীরেন ভগবানের ইঙ্গিতে একটা বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। নীরেন এম. এ. পাস, ভাল চাকরি করে; মাত্র বৎসর দুয়েক পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর শরীর খারাপ দেখিয়া

সে তাহার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গেল ; এবং কয়েকদিন পরেই বাড়িতে সংবাদ দিল, বধূটির যক্ষ্মা হইয়াছে। তাহার চিকিৎসার জন্য তাহাকে এখন হাসপাতালে রাখিয়াছে। তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য নিজেও সে ছুটি লইয়াছে। নীরেনের বাপ-মা ছুটিয়া কলিকাতায় গেলেন ; কিন্তু কয়েকদিন পরই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। নীরেনের মা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতেছেন, নীরেনের বাপের মুখ উদাস গম্ভীর। সংবাদটা অনুমান করিয়া লইবার পথে বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা কোথাও ছিল না, স্টেশনে সমবেত সকলেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

রামও স্টেশনে ছিল, সে বাড়িতে গিয়া সুগভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ, নীরেনের বউটি মারা গিয়েছে !

রামের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল, কে ? কে মারা গিয়েছে ?

নীরেনের স্ত্রী। ভেরী স্যাড।

রামের স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। রাম সে দৃষ্টি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল, যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বেই সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উদ্যোগ করিল।

রামের স্ত্রী বলিল, চললে কোথা ? তোমার তো আর স্ত্রী মরে নি যে, ঘোড়ার খোঁজে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরুচ্ছ !

রাম অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াও সভয়ে বলিল, কি বল তুমি তার ঠিক নেই !

হাসিয়া রামের স্ত্রী বলিল, বলি আমি ঠিক।

রাম আবার ফিরিয়া বসিয়া বলিল, নাও, কি বলছ বল ?

একটি কাজ করতে হবে। নীরেনের সঙ্গে শেফালির বিয়ের সম্বন্ধ করতে হবে। বাবা আমার টাকা খরচ করতে পেছুবেন না।

রামের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, নীরেন হীরেনের সম্বন্ধে কি রকম ভাইও হয় না ? বোধ হয় মাসতুতো !

রামের স্ত্রী বলিল, সে আমি জানি না, তবে তোমার ভাবী ভায়রাভাই, এটা আমি জানি।

সন্ধ্যার পর রাম বেড়াইয়া ফিরিলে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, গিয়েছিলে নীরেনদের বাড়ি ?

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাঁকা হাসি হাসিয়া রাম বলিল, গিয়েছিলাম।

সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে স্ত্রী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

রাম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁকা হাসি একটু বেশি করিয়া হাসিয়া বলিল, শুনলাম, হীরেনের সঙ্গে নীরেনের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রামসম্পর্ক পর্য্যন্ত না।

কপাল কুঁচকাইয়াই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্ত্রী বলিল, মানে ?

মানে, নীরেনের স্ত্রীর মৃত্যু এখনও হয় নি। এবং নীরেন তার রুগ্না স্ত্রীর শিয়রে সাবিত্রীর মত ব'সে আছে। বাপ মা কারও অনুরোধ শোনে নি। চাকরি থেকে ছ মাসের ছুটি নিয়েছে, দরকার হ'লে চাকরি ছেড়ে দেবে।

স্ত্রী কিছুক্ষণ রামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমাদের জাতটাই এমনই, বুঝেছ ? স্ত্রীর জন্যে মা-বাপকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দাও তোমরা !

বুদ্ধিমান বহু বিদ্যার অধিকারী রাম হতবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামের অবস্থা আরও শোচনীয়, সে সগৌরবে একটা বিড়ি ফেলিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা বিড়ি ধরাইয়া বলিল, শুনেছ তো ?

স্ত্রী মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, যথের ধন-টন পেয়েছ নাকি ?

খুব করিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শ্যাম বলিল, বলি হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো কথা বল—

বাধা দিয়া স্ত্রী বলিল, দু টান খেয়েই বিড়িটা ফেলে আবার একটা বিড়ি ধরালে যে ?

ফেলিয়া-দেওয়া আধপোড়া বিড়িটা কুড়াইয়া কুলুঙ্গিতে রাখিয়া দিয়া শ্যাম বলিল, ধেৎতেরি, বিড়ির নিকুচি করেছে !

স্ত্রী বলিল, তা বইকি, মরদের মুরদ তো বিশ বিঘে ধানের জমি। তাতে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঁয়ষট্টি পয়সার বিড়ি চাই। সেই বিড়ি ফেলে দেওয়া !

শ্যাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, অপরাধ হয়েছে, বাপ রে, বাপ রে !

স্ত্রী এ কথার কোন প্রতিবাদ করিল না, গম্ভীরভাবে পানের বাটা টানিয়া লইয়া দোক্তা খাইবার উপযোগী ডবল খিলি রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্যাম বলিল, নীরেনের কথা শুনেছ তো ? হীরেনের কথা নিয়ে খুব তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা বল। নীরেন কি রকম—

যাও যাও, স্ত্রৈণ ভেড়ুয়া কোথাকার ! ওই কথা নিয়ে বড়াই করতে লজ্জা করে না ? বুড়ো বাপ মা, তুই একমাত্র ছেলে, তাদের ছেড়ে তুই—ছঁ ! গলায় দড়ি তোমাদের। আমার ছেলে হ'লে কান ধ'রে টেনে আনতাম, এনে বিয়ে দিতাম। ছেলে নেই পুলে নেই, কাঁচা বয়েস—ছঁ !

শ্যাম বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াইয়া নিঃশেষিতপ্রায়

বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া ঘরের চালকাঠের দিকে চাহিয়া গান ধরিল, 'তনয়ে তারো তারি—ণী !

স্ত্রী বলিল, একটা টোকির গান গাও। যত সব সেকেলে গান !

শ্যামের কণ্ঠস্বরটি ভাল, গানও সে ভালই গায়। স্ত্রীর কথায় তারিণীর স্তব তাহার অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কিন্তু টকির গান তাহার একটাও মনে পড়িল না।

* * *

শুধু রাম আর শ্যাম নয়, যদু, মধু, হরি, মাধব, যাদব, সকলের বাড়িতেই এখন নীরেনের আলোচনা ; হীরেন এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। নিষ্কৃতি পাইয়া সে বেশ স্বাভাবিক হইয়া উঠিল ; হাট করে, বাজার করে, জমি দেখে, তাস খেলে, নীরেনকে লইয়া সেও আলোচনা করে। আলোচনায় সকলের সহিত সেও একমত। এটা একেবারে বাড়াবাড়ি, বাড়াবাড়িরও বেশি—অপরাধ।

মেয়েরা বলে, আদিখ্যেতা।

নীরেনের বাপ ছেলেকে বুঝাইয়া পত্র দিলেন, লিখিলেন, সমগ্র গ্রামের লোক তোমার এ আচরণের নিন্দা করিতেছে। তাহা ছাড়া তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, বিজ্ঞান বল, শাস্ত্র বল, কিসে তুমি তোমার এই আচরণের সমর্থন পাইলে ? এ মায়া মিথ্যা, মিথ্যার মোহে পড়িয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিও না।

নীরেন উত্তর দিল, গ্রামের লোকের স্তুতি-নিন্দায় আমার কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞান ও শাস্ত্র এ দুইকেও আমি মানি না। তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু প্রেম, একমাত্র তাহাকেই আমি মানি।

শাস্ত্রকে মানি না বলিয়া রেহাই আছে, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানি না বলা ধৃষ্টতা ; মাস কয়েক পরেই নীরেনের স্ত্রী মারা গেল। নীরেনের

বাপ মা আবার একবার কলিকাতায় ছুটিলেন, কিন্তু দুইজনেই সেই পূর্ব্বের মত ফিরিয়া আসিলেন, বাপের মুখ গম্ভীর, মায়ের চোখে জল। নীরেন আসে নাই, সে কাশী গিয়াছে, সেইখানেই স্ত্রীর শ্রাদ্ধাদি সারিয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইবে।

ঘরে ঘরে আবার একবার আলোচনা জমিয়া উঠিল।

শ্যামের স্ত্রী বলিল, মুখে ঝ্যাঁটা, মুখে ঝ্যাঁটা! বুড়ো বাপ-মাকে ফেলে স্ত্রীর শোকে সন্ন্যেসী হওয়ার মুখে ঝ্যাঁটা!

শ্যামের উপস্থিত বিড়ির পয়সার প্রয়োজন ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে সমর্থন করিয়া বলিল, একশো বার।

শ্যামের স্ত্রী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, একশো বার? হাজার বার, লক্ষ বার।

শ্যাম বলিল, আমিও তো তাই বলছি। তুমি রাগছ কেন?

রাগছি কেন? তোমাদের দেখলে সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। তোমরা কি মানুষ? তোমরা জানোয়ার।

সকালবেলা হইতে বিড়ি খাইতে না পাইয়া শ্যামের মেজাজ ভিতরে ভিতরে রুক্ষ হইয়া ছিল, তাহার উপর গালিগালাজের ক্রমবর্দ্ধমান প্রচণ্ডতায় বিড়ির পয়সার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া সে বলিল, কি, আমরা জানোয়ার?

একশো বার, হাজার বার, লক্ষ বার।

লক্ষ বার?

হ্যাঁ, কোটি বার।

তবে এই দেখ্।—বলিয়া শ্যাম উঠান হইতে একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া উনানে বসানো ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার উপর দুম করিয়া বসাইয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্যামের স্ত্রী প্রথমটা হতভম্ব হইয়া গেল, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোষণা করিল, ওগো মা গো, শেষে তুমি মাতাল-গেঁজেলের হাতে আমাকে দিয়ে গেলে গো!

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সে বসিয়া বসিয়া আপনার বাপকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল, আবাগীর বেটা চোখখেকো কঞ্জুস কিপটে, পয়সার জন্যে আমার এই দশা ক'রে গেলি তুই!

এখানে বলা প্রয়োজন শ্যামেরা বংশজ; তাহারা বরপণ পায় না, কন্যাপণ দিয়া তাহাদের বিবাহ করিতে হয়।

শ্যাম বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিতেছিল, হীরেনদের পাড়ায় আসিয়া দেখিল, রাস্তার উপরেই বেশ একটা মজলিস জমিয়া উঠিয়াছে; মায় বুদ্ধিমান পণ্ডিত রাম পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত। সেও আসিয়া জমাইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন তাহার দিকে বিড়ি দেশলাই আগাইয়া দিল, বলিল, ব'স ব'স। একটা বেশ নধর খাসী দেখে দাও দেখি ভাই।

শ্যাম স্বভাবগত নির্ব্বুদ্ধিতার সহিত অকারণে প্রশ্ন করিল, খাসী?

হ্যাঁ, খাসী। হীরেনের নতুন বউয়ের আজ সাধভক্ষণ। আমরা রাত্রে ফিষ্টি খাব।

অন্য একজন বলিল, একটা খাসীতে হবে তো? মেয়েরাও তো ছাড়বে না।

রাম প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, তা হ'লে আমি নেই কিন্তু। ওদের সঙ্গে সামাজিক ভোজন না ক'রে উপায় নেই, কিন্তু প্রীতিভোজন অসম্ভব।

শ্যাম কথাটা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সায় দিল, আলবৎ।

* * *

মাস দুয়েক পর।

একদিন গভীর রাত্রে রাম তখনও একখানা বই পড়িতেছিল, তাহার আধুনিকা স্ত্রী সন্ধ্যা হইতে তাহার সহিত তর্কের নামে তুমুল কলহ করিয়া সদ্য ঘুমাইয়াছে। তর্কের বিষয় ছিল হীরেনের তথা সমগ্র পুরুষ-জাতির নির্লজ্জতা। জীবজগতে অতিবড় নির্লজ্জ না হইলে এমন করিয়া কেহ বৃদ্ধ বয়সে তরুণী ভার্য্যার সাধভক্ষণ উপলক্ষে এমন করিয়া সমারোহ করিতে পারে না। পরিশেষে বলিয়াছিল, আমার সঙ্গে দেখা হয় নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেনের বউ লজ্জায় কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে পারে নি।

রাম উত্তরে তুলিয়াছিল নীরেনের প্রসঙ্গ, ফলে স্ত্রীর চোখে মুখে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; সভয়ে রাম সকল প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া বই লইয়া বসিয়াছে। সহসা একটা বুকফাটা ক্রন্দন-ধ্বনিতে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না।

ঘণ্টাখানেক পর শ্যাম ডাকিল, রাম! রাম!

কি হে? চকিত হইয়া রাম জানালা খুলিয়া সাড়া দিল।

আসতে হবে ভাই একবার। হীরেনের বউটি মারা গেল।

মারা গেল?

হ্যাঁ। প্রসব হ'তে গিয়ে মারা গেল।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া শ্যাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হীরেন বেচারীর ভাগ্যটাই খারাপ!

স্ত্রী বলিল, খারাপ? পরম ভাগ্যবান লোক। লাফ দিয়ে আবার ঘোড়ায় চড়বে।

শ্যাম চুপ করিয়া রহিল, হীরেনের সপক্ষে কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল না, আর বলিবার আছেই বা কি?

স্ত্রী বলিল, একটি উপকার কর দেখি আমার। আমার মাসীর অবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর আঠারো বছরের মেয়ে গলায়; হীরেনকে ব'লে-ক'য়ে বিয়েটি ঘটিয়ে দাও দেখি।

শ্যামের লজ্জা হইল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। তাগাদার পর তাগাদা সে শ্রাদ্ধশান্তির অজুহাতে ঠেলিয়া ঠেলিয়া অবশেষে একদিন প্রভাতে উঠিয়াই হীরেনের নিকট না গিয়া পারিল না।

হীরেনের দরজায় বেশ একটি ভিড় জমিয়াছিল, অনেকগুলি লোক। মধ্যস্থলে হীরেনের প্রথম পক্ষের শ্বশুর দাঁড়াইয়া হাতমুখ নাড়িয়া বলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার শাস্তিটা দেখ, ওই নাতি-নাতনীর দল, তার বিষয়পত্র—এ সব কি আমার চালাবার শক্তি আছে, না সময় আছে?

হীরেন গত রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। শ্বশুরকে পত্র দিয়া গিয়াছে, "সংসারে তাহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে; ছেলেপুলেগুলির ভার, বিষয়পত্রের ভার আপনার উপরই রহিল।"

শ্যাম হাঁপ ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য?

শ্যাম বলিল, হ্যাঁ।

মুখে আগুন বৈরাগ্যের; একঘর ছেলেপুলে, তাদের ভাসিয়ে দিয়ে বৈরাগ্য! তারপর স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, তোমরা এমনিই বট!

রামের স্ত্রী বলিল, বৈরাগ্য—ভালবাসা—ও আমি বিশ্বাসই করি না। হীরেন আর বিয়ে করতে পাবে না ব'লে দেশত্যাগ করেছে।

রাম অবাক হইয়া গেল।

স্ত্রী বলিল, তা বিধবা-বিবাহ করলেই পারত। আজকাল তো আকছার হচ্ছে। একটা আদর্শ স্থাপন করাও হ'ত। তারপর হাসিয়া বলিল, আমার মৃত্যুর পর তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে; তুমি কিন্তু বিধবা-বিবাহ ক'র।

রামের ইচ্ছা হইল, ঠাস করিয়া স্ত্রীর গালে পুরাকালের মত একটি চড় কষাইয়া দেয়।

* * *

গ্রামে আলোচনাটা তুমুল হইয়া উঠিল।

সে তুমুল আলোচনাকে ঢাকিয়া দিয়া অকস্মাৎ কোথায় নহবতের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বাঁশী বাজিতেছিল নীরেনদের দরজায়। নীরেন বিবাহ করিয়াছে। আজই সে বউ লইয়া ফিরিবে বারোটার ট্রেনে, এইমাত্র টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

রামের বউ ফিকফিক করিয়া বাঁকা হাসি হাসিতে আরম্ভ করিল; শ্যামের বউ উঠানময় আরম্ভ করিল রণরঙ্গিণী নৃত্য।

রাম ভাবিতেছিল, সে সন্ন্যাসী হইবে কি না।

শ্যামের অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সে ভাবিতেছিল, আর একটা বিবাহ করিবে কি না।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুধার প্রেম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এমন সময়ে কপালের উপর কাহার স্পর্শে চমকিয়া উঠিয়া সুধা সভয়ে কহিল, কে?

ভূষণ থতমত খাইয়া কহিল, আমি, মানে ভূষণ। ভয় কি?

সুধা উঠিয়া বসিয়া গায়ের কাপড় সামলাইয়া বিরক্তির সহিত কহিল, হঠাৎ কপালে হাত দিলেন যে?

ভূষণ লজ্জিতভাবে কহিল, কপালে হাতটা লেগে গেল, অন্ধকার কিনা। তা কেমন আছ? শুনলাম শরীর-খারাপ।

সুধা নীরস কণ্ঠে জবাব দিল, কে বললে আমার শরীর-খারাপ?

ভূষণ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, শরীর-খারাপ নয়? তবে যে তোমার বাবা বললেন, আচ্ছা, দেখি জিজ্ঞাসা ক'রে।

সুধা কহিল, শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভাল আছি!

ভূষণ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল; একমুখ হাসিয়া কহিল, ভাল আছ। এমনই চিন্তা হয়েছিল!

সুধা ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, আমার অসুখে আপনার চিন্তা কেন?

ভূষণ দুই চোখ বড় করিয়া বিস্মিত মুখে কহিল, বা রে! আমার চিন্তা হবে না! কি বল! তারপর হাসিয়া কহিল, হেঃ হেঃ, সারাজীবন ধ'রে চিন্তা করবার ব্যবস্থা করছি।

এমন সময়ে বৃদ্ধা আসিয়া হাজির হইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, কেমন আছ মা? শরীরটা কি খুবই খারাপ?

সুধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নামাইয়া কহিল, আজ্ঞে না, ভাল আছি।

বৃদ্ধা তাহাকে সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, মুখটি শুকিয়ে গেছে। একা রাত জাগতে হচ্ছে, তাই বোধ হয় শরীর-খারাপ হচ্ছে। ভূষণ, তুই তো—

বলিতে হইল না, ভূষণ সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়ই, আমি আজ থেকেই আসব।

সুধা বাধা দিয়া কহিল, না না, কিছু দরকার নেই। রাত জাগতে তো হয় না। পাশে থেকে ঘুমুই, বাবা দরকার হ'লে উঠিয়ে দেন।

বৃদ্ধা কহিলেন, বেশ। কিন্তু দরকার হ'লেই ব'ল মা, লজ্জা ক'র না। ভাল-ভালস্তে দু হাত এক হয়ে গেলেই তোমার বিপদ তো ভূষণকেই ঘাড় পেতে নিতে হবে মা।—বলিয়া ভূষণের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, রাঘববাবুর মত হয়েছে। ঐ দিনেই আশীর্ব্বাদ হবে।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ভূষণের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, আগ্রহভরা কণ্ঠে কহিল, সত্যি?

সুধা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা কহিলেন, আজ আসি মা, কাল আবার আসব।

ভূষণ মাকে কহিল, মা, শরীরটার সম্বন্ধে একটু—

বৃদ্ধা পুত্রের অত্যধিক দরদ দেখিয়া বোধ করি ক্ষুণ্ণ হইলেন, তবু যতদূর সম্ভব স্নেহের সহিত কহিলেন, হ্যাঁ মা, সাবধানে থেকো।

মাতা ও পুত্রকে বিদায় দিয়া সুধা রাঘববাবুর কাছে আসিয়া বসিল।

রাঘববাবু কহিলেন, কিছু খেয়েছিস মা?

সুধা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। রাঘববাবু কহিলেন, রাত জাগার জন্যেই হয়েছে বোধ হয়। আজ আর রাত জেগো না, আমি তো এমনই বেশ থাকি।

সুধা নীরবে বাবার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল।

রাঘববাবু কহিলেন, ভূষণের মা আশীর্ব্বাদের দিন স্থির ক'রে গেলেন।

সুধা বিরক্তির সহিত কহিল, না বাবা, এখন থাক। তুমি সেরে না উঠলে ওসব কিছু হবে না। রাঘববাবু কন্যার পিঠে একবার হাত বুলাইয়া কহিলেন, আর যদি আমি সেরে না উঠি মা? তোমাকে এমন অসহায় ফেলে গিয়ে আমি যে ম'রেও শান্তি পাব না। সুধা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না বাবা, ওসব কথা ব'ল না, আমার মনে যে কি হচ্ছে!—বলিয়া আঁচলে মুখ চাপিল।

দিন দুই পরে। সন্ধ্যার সময়ে সুধা ছাদে একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দুই দিনেই চেহারা শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; চোখের কোলে কালি জমিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল। দেহ ও মন দুইই অত্যন্ত ক্লান্ত। আজ সারাদিন প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সে মনোজের আসার আশা করিয়াছে। কতজনের পায়ের শব্দ, গলার স্বর শুনিয়া কতবার সে চমকিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মনোজ আজও আসে নাই বা কোন চিঠি দেয় নাই। কাল রাত্রি হইতে রাঘবের অবস্থাও খারাপের দিকে চলিয়াছে। ভূষণ সকালে ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিল; ডাক্তার ঔষধ দিয়াছে, কিন্তু আশা দেয় নাই। সুধার চিন্তার সীমা নাই। মনোজ আসিল না কেন? বাবা-মায়ের মত করিতে পারে নাই, সেইজন্যই বোধ হয় পাছু হটিয়াছে। প্রেম করিবার সময়ে বাপ-মায়ের কথা ছেলেদের মনে পড়ে না। প্রেমের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িতে আসিলেই বাবা-মাকে ঠেকাইয়া দিয়া গা-ঢাকা দেয়। কিন্তু মনোজ কি অন্য সকলের মত অপদার্থ, হৃদয়হীন? সুধা তাহা কোন দিন ভাবে নাই, কোন দিন ভাবিতে পারিবে না। আকাশে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহারই স্বল্প আলোকে বাম হাতের অনামিকায় সোনার আংটিটি চিকচিক করিতে লাগিল। সেই দিকে তাকাইয়া সুধার সেই

দিনের সন্ধ্যাটির কথা মনে হইল, যেদিন মনোজ তাহাকে আংটিটি পরাইয়া দিয়াছিল। আজও তেমনই সন্ধ্যা, আকাশ তেমনই প্রশান্ত নীল; আকাশের বুকে তেমনই অগণিত তারা, তেমনই চাঁদ; কিন্তু সেদিন হাতে মিলিয়াছিল হাত, হৃদয়ে মিলিয়াছিল হৃদয়; আর আজ দুইটি হৃদয়ের মাঝে শত ক্রোশের ব্যবধান, হয়তো শত জীবনের ব্যবধান।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। তবে কি মনোজ আসিয়াছে? সুধা কান পাতিয়া রহিল। নিশ্চয় তাহার জুতার শব্দ। সুধার বুকের ভিতরে ঘোড়-দৌড় সুরু হইল, সর্ব্বশরীর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সুধা কি করিবে? সুধা কি ছুটিয়া যাইবে? বলিবে, আসিয়াছ? এতদিনে মনে পড়িয়াছে? বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিবে, আমাকে একান্ত করিয়া লও, আমার আর কেহ নাই? হঠাৎ ঘনঘটা করিয়া অভিমানের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। সুধা যাইবে না, এইখানে এমনই করিয়া বসিয়া থাকিবে। কেন মনোজ তাহাকে এত ভাবাইয়াছে? সুধা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

জুতার শব্দ কাছে আসিয়া থামিল। ইহার পর? জলভরা মেঘ দেখিয়া বারিবর্ষণের আশায় সারা পৃথিবী যেমন উন্মুখ হইয়া উঠে, তেমনই মনোজের স্পর্শের আশায় সুধার সমস্ত শরীর উন্মুখ হইয়া উঠিল। হঠাৎ মেঘ-গর্জ্জনের মতই গলা-খাঁকারির শব্দ হইল। মনোজ তো নয়। তবে? সুধা চোখ মেলিয়া দেখিল, তাহার একান্ত কাছে দাঁড়াইয়া ভূষণ; তাহার দিকে—শক্ত রোগে অনেকদিন অনশনের পর রোগী অন্নপথ্যের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, ঠিক তেমনই ভাবে তাকাইয়া আছে। কলপ-মাখানো চুল তেল দিয়া পালিশ করিয়াছে; দাড়ি গোঁফ নির্ম্মূল করিয়া কামাইয়াছে; গায়ে আজানুলম্বিত ঝকঝকে তসরের পাঞ্জাবি, এবং পায়ে চকচকে পেটেন্ট লেদারের পাম্প-শু পরিয়াছে।

সুধা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত স্বরে কহিল, আপনি এখানে কেন?

ভূষণ হাসিয়া কহিল, আমি? রাঘববাবুকে দেখতে এসেছি।

বেশ তো, তাঁর ঘরে যান।

ভূষণ তাহার ফোলা ফোলা চোখের দৃষ্টি যতদূর সম্ভব ঘন করিয়া কহিল, শুধু কি তাঁকেই দেখতে এসেছি সুধা? তোমাকেও।

সুধা শক্ত হইয়া কহিল, আমাকে দেখবার কি দরকার আপনার?

ভূষণ দুই হাতে বুক চাপিয়া, ঘাড় হেলাইয়া, চক্ষে মিনতি ভরিয়া, গাঢ় কণ্ঠে কহিল, তা কি তুমি বোঝ নি সুধা? তোমাকে ভালবাসি যে।

সুধা মনে মনে কহিল, ভালবাসা নম্বর দুই, মধুকরের পর মত্তহস্তী, একজন লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে, আর একজন পেষণ করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে।

ভ্রূ কুঁচকাইয়া সুধা কহিল, সত্যি ভালবাসেন?

আগেকার পোজেই একপা আগাইয়া মস্তক আন্দোলিত করিয়া ভূষণ কহিল, সত্যি সুধা। তারপর দুই হাতের আঙুলগুলা বিদারণ-ভঙ্গিতে বাঁকাইয়া কহিল, যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম, দেখতে পেতে—

সুধা হাসিয়া ফেলিয়া শ্লেষের সহিত কহিল, কার ছবি আঁকা আছে এ বক্ষ মাঝারে, না ভূষণবাবু?

ভূষণ হাঁ-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সুধা কহিল, কিন্তু আপনার সেদিনকার স্ত্রীকেও তো খুব ভালবাসতেন দেখেছি। তাঁর ছবিও নিশ্চয় ওখানে আঁকা আছে?

পোজ পরিত্যাগ করিয়া ভূষণ লজ্জিতভাবে কহিল, তা আছে সুধা।

আর আপনার প্রথম স্ত্রী? তাঁর ছবি?

ভূষণ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তা—তা—তারও আছে বোধ হয়।

সুধা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া কহিল, তা হ'লে তো আপনার হৃদয়টিতে আপনি একটি চিত্র-ভবন খোলবার চেষ্টায় আছেন দেখছি। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, তা বেশ করেছেন ভালবেসেছেন, কিন্তু—

ভূষণ প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কিন্তু-টিন্তু নয় সুধা। আশীর্ব্বাদের দিন সব ঠিক।

সুধা কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার আগেই যে আর একজন আমাকে ভালবেসে ব'সে আছে।

ভূষণ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, আর একজন? কে সে? ওঃ, সেই সিটকে ছোঁড়া তো? তা হোক সুধা, তাকে আমি পেরে উঠব।— বলিয়া আস্তিন গুটাইল।

সুধা ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল, মল্লযুদ্ধ করবেন নাকি? কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না ভূষণবাবু, আমিও যে তাকে ভালবাসি। আর শুধু ভালবাসি কেন, আমাদের বিয়েও হয়ে গেছে।

দুই চোখ কপালে তুলিয়া প্রবল বিস্ময়ের সহিত ভূষণ কহিল, অ্যাঁ! বিয়ে হয়ে গেছে! তবে যে রাঘববাবু—

সুধা ধীরে ধীরে কহিল, বাবা জানেন না।

অত্যন্ত অবিশ্বাসের সহিত ভূষণ কহিল, পাগল! তা কি হয়, বাবা জানবে না, আর মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে!

সুধা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, আমি সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আর কাউকে বিয়ে করবার আমার উপায় নেই।

ভূষণের মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল; ক্রোধমিশ্রিত স্বরে কহিল, তবে তোমরা ধাপ্পা দিয়ে আমাকে এত দৌড়-ঝাঁপ করালে কেন? এত পয়সাই বা খরচ করালে কেন? তা ছাড়া মাকে এমন ক'রে ঠকালে কেন?

সুধা নীরস কণ্ঠে কহিল, ধাপ্পা আমরা কাউকে দিই নি, ঠকাতেও কাউকে চাই নি। যা কিছু আপনি নিজে হতেই করেছেন। আর খরচ? কত খরচ হয়েছে আপনার, বলুন।

ভূষণ নাসিকা উঁচাইয়া ঝাঁঝালো স্বরে কহিল, তার কি হিসেব রেখেছি নাকি? জান না, কত খরচ হয়েছে? তোমাদের সমস্ত পুজোর খরচ কে চালিয়েছে? ডাক্তারের ফী দেবার সময়ে ছিলে কোথায়? তা ছাড়া ঐ বিশে হতভাগা কি কম টাকা নিয়েছে আমার কাছ থেকে!

সুধা কহিল, বেশ। আমাকে একটা হিসেব দেবেন। আমি সব আপনাকে দিয়ে দোব।

মুখ ভ্যাংচাইয়া ভূষণ কহিল, দিয়ে দোব! টাকার গাছ আছে কিনা বাড়িতে! জানতে কিছু বাকি নেই।

হাতের কয়েকগাছি চুড়ি খুলিয়া ভূষণের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সুধা কহিল, নিন, আশা করি, এতে আপনার ধার শোধ হবে।

ভূষণ হাত নাড়িয়া কহিল, থাক থাক, ঢের হয়েছে, আর সাধুগিরি দেখিয়ে কাজ নেই। ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, রেখে দাও তোমার ব্যাঙের আধুলি, আখেরে কাজ দেবে, অনেক কষ্ট আছে কিনা কপালে তোমার।

সুধা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, থাকলেই বা কি করব ভূষণবাবু, উপায় কি? কিন্তু আপনি আর দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছেন কেন? আর একটি মেয়ে-টেয়ে ঠিক করুনগে। নইলে আশীর্ব্বাদের আয়োজনটা পণ্ড হয়ে যাবে যে।

কড়া গলায় ভূষণ কহিল, তা যাক, তোমাকে তার জন্যে ভাবতে হবে না। ফাজিল মেয়ে কোথাকার! তারপর যাইতে উদ্যত হইয়া আবার ফিরিয়া কহিল, সত্যি তো? ভূষণ ঘোষ ভারী জেদী লোক— একবার পা বাড়ালে আর ম'রে গেলেও ফিরবে না কিন্তু।

সুধা কহিল, আপনার ফেরবার দরকার হবে না ভূষণবাবু। আমার স্বামী শিগগির এসে পড়বেন।

ভূষণ ভ্রূকুটি-ভীষণ মুখে কহিল, স্বামী! ঘাড়ের রক্ত চুষে খেয়ে এর পর স্বামী দেখানো হচ্ছে! স্বামী এর পর আসবেন বইকি। কাজ গোছানো হয়ে গেছে যে। হাঁকিয়া কহিল, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে উচ্ছন্ন গেছ তোমরা, কিছু অসাধ্যি নেই তোমাদের।

সুধা তীব্র চাপা স্বরে কহিল, গোলমাল করবেন না ভূষণবাবু। বাড়ি যান। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমাকে বিয়ে করতে না পেরে যদি মনে সত্যি কষ্ট হয়ে থাকে তো মনে করবেন, বিয়ে করেছেন, আমি ম'রে গেছি। দুদিন সামলে চতুর্থ পক্ষের জন্যে চেষ্টা করবেন। জোটাতেও দেরি হবে না। আর টাকা? আমি সুদে আসলে সব টাকা আপনার পাঠিয়ে দোব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভূষণ সুধার দিকে অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, খুব বক্তিমে হয়েছে! মেয়ের ভাবনা ভূষণ ঘোষ করে না, একবার হাঁক দিলে দুশো মেয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর টাকা? টাকা একবার নিয়ে সবাই দেয়, লোক চিনতে বাকি নেই ভূষণ ঘোষের।—বলিয়া আপন মনে গজগজ করিতে করিতে ভূষণ নামিয়া গেল।

তাহার পরদিন বিকালে বিশু হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, ভূষণবাবুরা চ'লে যাচ্ছে।

সুধা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কোন জবাব দিল না।

বিশু বলিতে লাগিল, মোটঘাট বাঁধা হচ্ছে, আজ রাত্রেই পালাবে বোধ হয়।

সুধা শুধু কহিল, বেশ তো।

বিশু ভাবিয়াছিল, ভূষণের পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া সুধা চঞ্চল হইয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া সে দমিয়া গেল। কহিল, তা হ'লে বিয়ে হবে না?

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও।

বিশু কাঁচুমাচু হইয়া কহিল, যাচ্ছি, কিন্তু ভূষণবাবু এত চ'টে গেল কেন, বল দেখি?

সুধা কহিল, চটার পরিচয় পেলে কি ক'রে?

বিশু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, মানে, একটা টাকা চাইতে গিছলাম, তো তেড়ে মারতে এল।

সুধা রুষ্ট স্বরে কহিল, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যার-তার কাছে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না?

বিশু আমতা আমতা করিয়া কহিল, ভিক্ষে তো নয়, নিজের লোক ব'লেই—মানে, সব এমন ঠিক হয়েও যে ভেঙে যাবে, কে জানে!—বলিয়া সরিয়া পড়িল।

নরনারীর মিলন-ব্যাপারে বাধা ও বিঘ্নের বিপুলতা বিশুর মত জগতে আর কাহাকে বুঝিতে হইতেছে?

রাঘববাবু সারাদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া ছিলেন। সন্ধ্যার সময় সুধা যখন বুকে মালিশ করিতেছিল, তখন ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, কেমন আছিস মা?

সুধা কহিল, ভাল আছি বাবা।

ভূষণ আজ সারাদিন আসে নি, কোন কাজটাজ আছে বোধ হয়!

সুধা কহিল, ওঁরা সব দেশে চ'লে গেছেন।

রাঘব ঘোলাটে চোখ দুইটি মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

সুধা কহিল, দেশে জমিদারির কি কাজ আছে।

রাঘববাবু কহিলেন, আবার আসবে তো?

সুধা আশ্বাস দিয়া কহিল, আসবেন বইকি। কাজ সেরেই আসবেন। আমাকে ব'লে গেলেন।

রাঘববাবু দুই চোখ বুজিয়া নির্জ্জীব কণ্ঠে কহিলেন, আমাকে একটি বার ব'লে গেল না?

পরের দিন ভোরে রাঘববাবু মারা গেলেন। মৃত্যুর সময়ে কোন: কথা বলিতে পারিলেন না; শুধু দুইটি ব্যাকুল নয়ন মেলিয়া কন্যার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চোখের কোণ হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল; ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; এবং শীর্ণ, শীতল মুষ্টিতে মেয়ের হাতটি তিনি প্রাণপণে ধরিয়া রহিলেন। সুধা নিঃশব্দে নির্নিমেষ নয়নে বাবার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কাঁদিল না; শুধু পরম মমতার সহিত রাঘবের মাথায় ও মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। তারপর যখন সব শেষ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে মৃতের চোখ দুইটি নিমীলিত করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিল।

বিশু দরজার পাশেই বসিয়া বিড়ি টানিতেছিল। সুধা ডাকিয়া কহিল, বিশুদা, সব তো শেষ হইয়া গেল, পাড়ার সবাইকে খবর দাও।

বিশু বিড়িটায় শেষ টান দিয়া কহিল, তাই নাকি? আচ্ছা।— বলিয়া হঠাৎ প্রাণপণ চীৎকারে পাড়া প্রকম্পিত করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওরে বাবা রে! কি হ'ল রে! মামা যে আমার ম'রে গেল রে!

বিশুর এই ব্রড্‌কাস্টের পর কাহারও বিছানায় শুইয়া থাকা সম্ভব হইল না। একে একে সকলে জুটিতে লাগিল। পাড়ার সংকার-সমিতি

খবর পাইয়া সদলবলে আসিয়া হাজির হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় রাঘববাবুর শেষকৃত্যে কোন ত্রুটি রহিল না।

পরের দিন সকালে নিজের ঘরটিতে সুধা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার ভাবনার সীমা-পরিসীমা ছিল না। মনোজ আজও আসিল না, বোধ হয় আর সে আসিবে না। কেন আসিবে? সুধাকে আর কিসের প্রয়োজন? দিন কয়েক ভালবাসার ভান করিয়া সুধার সর্ব্বনাশ করিয়া সে হয়তো এখন অন্য নারীর পিছনে ছুটাছুটি সুরু করিয়াছে। কিন্তু কি করিবে সে? কোথায় যাইবে? হাতে যাহা কিছু ছিল, বাবার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াতে সব খরচ হইয়া গিয়াছে। বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্য আসিয়াছিল, তাহাকে অনেক কষ্টে বিদায় করিয়াছে। মোক্ষদাকে দিয়া কোন স্যাকরাকে ডাকিয়া গায়ের গহনা বিক্রয় করিয়া তাহার দেনা শোধ করিতে হইবে। আর দিন কয়েক পরে এ বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে হইবে। ঠাকুর-ঝিকেও বিদায় দিতে হইবে, তারপর—

মোক্ষদা একটি চিঠি আনিয়া হাতে দিয়া কহিল, বোধ হয় দাদাবাবুর চিঠি দিদিমণি।

সুধা নির্ব্বিকারভাবে হাত বাড়াইয়া চিঠিটা লইয়া কোলের উপর রাখিল। মোক্ষদা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সুধা তেমনই বসিয়া রহিল। মনোজের চিঠিতে কি লেখা আছে, সুধা যেন না পড়িয়াই বুঝিল। হয়তো লিখিয়াছে—মা-বাবার মত নাই বলিয়া আসিতে পারিতেছে না, একমাত্র সন্তান হইয়া মাকে দুঃখ দিতে তাহার মন চাহিতেছে না। অতএব সব দুঃখ সুধাই ভোগ করুক। তারপর বিনাইয়া বিনাইয়া ভালবাসা জানাইয়াছে, এবং কল্পনা ও কবিত্বের যদি বিশেষ মাত্রাধিক্য হইয়া থাকে তো পরলোকে মিলন হইবে—এই আশা

দিয়া ইহলোকে জীবনটা একরকম করিয়া কাটাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে চিঠিটা তুলিয়া লইয়া দেখিল, ঠিকানা মনোজের হাতের লেখা নহে; তবে কে চিঠি দিল আবার? খামটা ছিঁড়িয়া দেখিল, মনোজের চিঠি নয়, মনোজের মার চিঠি, লিখিয়াছেন—

সুধার চিঠি যথাসময়ে পৌছিয়াছে। মনোজ বাড়িতে নাই। বৈষয়িক কাজে অন্যত্র গিয়াছে। সুধার চিঠি তাহার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মনোজের কাছে সুধার কথা তিনি শুনিয়াছেন। সুধাকে দেখিতে তাঁহার খুব ইচ্ছা হয়। ভগবান যদি সব ভাল রাখেন, শীঘ্রই বোধ হয় সে সুযোগ হইবে। কারণ মনোজের এক জমিদারের একমাত্র কন্যার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইয়াছে। এবং শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহে সুধা ও তাহার বাবাকে নিশ্চয় আসিতে হইবে। মনোজেরও ইহা একান্ত ইচ্ছা।

চিঠি পড়া হইয়া গেল। তবুও সেই চিঠিটার দিকে সুধা অনেকক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকাইয়া থাকিল, তারপর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, যাক, বাঁচা গেল। সকল আশার শেষ হইয়া গেল। তৈলহীন প্রদীপের স্বল্প সলিতাটুকু উস্কাইয়া উস্কাইয়া ক্ষীণ আলোটুকু বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে অন্ধকার ঢের ভাল। আসুক মসীকৃষ্ণ গাঢ় স্নিগ্ধ অন্ধকার, এ জীবন নিঃশেষে তলাইয়া যাক সেই অন্ধকারের মধ্যে; বাঁচিতে বিন্দুমাত্র সাধ নাই সুধার।

কিন্তু মনোজ? রূপবতী রাজকন্যা ও রাজত্ব পাইয়া একেবারে ভুলিতে পারিল সুধাকে? সুধার কি হইবে, একবারও ভাবিয়া দেখিল না? একবারও ভাবিল না, ভোজের শেষে উচ্ছিষ্ট কলাপাতার মত পথের কুকুরের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ছাড়া তাহার আর কোন গতি রহিল না?

কিন্তু মনোজ তো অস্বাভাবিক কিছুই করে নাই। নারীর দেহটার উপরেই তো চিরদিন পুরুষের লোভ। পাইলে এক চুমুকে রস রক্ত ও মজ্জা, সব শোষণ করিয়া লইয়া শুষ্ক দেহটাকে ফেলিয়া দিয়া যায়; একবার ফিরিয়া তাকাইয়াও দেখে না, কি হইল সেই দেহটার। এই দুর্নিবার দুরন্ত লোভকে বশে আনিবার জন্য সমাজ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল দিয়া বাঁধে, রাষ্ট্র শাসনদণ্ড চক্ষের সম্মুখে উদ্যত করিয়া রাখে। তাই পুরুষের চক্ষে ঘনায় প্রেমাশ্রু, গড়িয়া উঠে গৃহ, রচিত হয় নারীর ভুলের স্বর্গ। বেশ করিয়াছে মনোজ তাহাকে ঠকাইয়াছে। যেমন নির্ব্বোধের মত নিজের সর্ব্বস্ব তাহার সামনে মেলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছে সে। শুধু কি শাস্তি? বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমানও করিয়াছে। ভাবিয়াছে, সুধার তো কেহ নাই, কিছুই নাই, তাহার আর মান-অপমান কি? মনোজ শুধু নিষ্ঠুরই নহে, নীচ। সমাজ কিন্তু এই নিষ্ঠুরতার, এই নীচতার জন্য কোন শাস্তি দিল না, দিল প্রচুর পুরস্কার; আর মেয়েমানুষ বলিয়া সব শাস্তি হইল সুধার। মনোজকে সুধা যদি আজ হাতের কাছে পাইত, তাহা হইলে—। হঠাৎ রাগে দেহের রক্তস্রোত মাথার মধ্যে বার কয়েক ঘুরপাক খাইয়া গেল; সুধা একটা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিল—

নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের যাইবার উপায় নাই। আমার কন্যা সুধার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম লগ্নেই বিবাহ হইবে। বিবাহে মনোজ আসিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। সুধারও আনন্দের সীমা থাকিবে না।.....
নিঃ—রাঘবচন্দ্র বসু

সুধা মোক্ষদাকে দিয়া চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া দিল। মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, দাদাবাবু কবে আসবে দিদিমণি?

সুধা গম্ভীরভাবে কহিল, জানি না। তাহার ভাব দেখিয়া মোক্ষদা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘরে সুধা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। মনোজের উপর এখন আর তাহার বিন্দুমাত্র ক্রোধ ছিল না, ছিল নিরতিশয় অভিমান। কেন একবার আসিলে না? আসিয়া যদি বলিতে, আমি আর তোমাকে ভালবাসি না, তাহা হইলে আমি তোমাকে ধরিয়া রাখিতাম না। তোমার সন্তানের জন্য পিতৃত্বের পরিচয়টুকু মাত্র লইয়া তোমাকে মুক্তি দিতাম। তারপর সেই সন্তানকে একদিন মানুষের মত মানুষ করিয়া তোমারই হাতে তুলিয়া দিয়া নিজে জন্মের মত মুক্তি লইতাম। কেন আমাকে সব দিক দিয়া নষ্ট করিয়া দিলে? হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া সুধা শুনিল, কে বলিতেছে, কিছু ভেবো নি দিদিমণি। চাহিয়া দেখিল, কাছে দাঁড়াইয়া মোক্ষদা। সুধা জবাব দিল না।

মোক্ষদা বলিতে লাগিল, নাই বা এল দাদাবাবু, ভয় কিসের? সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দোব।

সুধা বিস্ময়ের সহিত কহিল, কি?

মোক্ষদা একগাল হাসিয়া কহিল, কি আবার! তুমি যেন কিছু বোঝ নি! এত নেকাপড়া শিখেছ! দুদিনে একেবারে নিস্‌পাস হয়ে যাবে। কেউ টেরটি পর্য্যন্ত পাবে না।

সুধা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া গভীর ঘৃণার সহিত কহিল, ছিঃ মোক্ষদা, তুমি না মেয়েমানুষ!

মোক্ষদা কণ্ঠস্বর অশ্রুতে স্যাঁতসেঁতে করিয়া কহিল, মেয়েমানুষ ব'লেই তো বলছি দিদিমণি। মেয়েমানুষ ছাড়া মেয়েমানুষের দুঃখু আর কে বুঝবে বল। তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে আশ্বাস দিয়া কহিল, কিছু ভয় নেই তোমার। লজ্জাই বা কিসের? আজকাল ভদ্রলোকদের বাড়িতে

অমন ছার হচ্ছে। তারপর কণ্ঠস্বর নিখাদে নামাইয়া কহিল, তবে কিছু খরচ করতে হবে।

সুধা তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, আচ্ছা মোক্ষদা, তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

মোক্ষদা কহিল, আছে বইকি দিদিমণি। কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে। পরক্ষণেই কান্নার সুরে কহিল, কিন্তু এমনই পাষাণ মেয়ে যে, মায়ের দিকে চোখ পেড়ে তাকায় না; না হ'লে কি এই বুড়ো বয়েসে দাসীবিত্তি করতে হয় দিদিমণি! যেমন তেমন মেয়ে নয় আমার, কেমন বাবু, কত—

বাধা দিয়া সুধা কহিল, আমার যা কিছু আছে, সব যদি তোমাকে দিই, তা হ'লে একটি কাজ করতে পার?

মোক্ষদা বিস্ময়াহত কণ্ঠে কহিল, কি দিদিমণি?

তোমার মেয়ের বাড়ি গিয়ে তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে আসতে পার?

মোক্ষদা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ও কি কথা দিদিমণি? মেয়ে আমাকে নাই বা দেখল, তবু তো পেটের মেয়ে। আমার দিন এমনই ক'রেই কাটবে, সে আমার সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাক।

তবে আমাকে ও কথা বলছ কেন?

মোক্ষদা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দিদিমণির যেমন কথা! কিসে আর কিসে! যতক্ষণ পেটে, ততক্ষণ তো রক্তের ঢেলা। চোখে না দেখলে আর মায়া কিসের?

সুধা চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, মোক্ষদা বলে কি? দেহের অন্তরালে আছে বলিয়া সন্তানের উপরে মায়া হইবে না? যে অহরহ তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া বসিয়া আছে, যাহার স্পর্শ পাইবার জন্য সমস্ত দেহ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য প্রতিদিন পলে পলে স্নেহে মন ও সুধায় বুক ভরিয়া উঠিতেছে, যাহার আগমন-বার্ত্তা পাইয়া

তাহার সমস্ত জীবন প্রভাতের পদ্মের মত বিকচোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর মায়া হইবে না তো হইবে কাহার উপর? মিথ্যা মা হইয়াছে মোক্ষদা।

মোক্ষদা কহিল, মনটা একটু শক্ত কর দেখি। দুদিন পরে—যেমনটি আগে ছিলে, ঠিক তেমনিটি হয়ে যাবে। তারপর—

সুধা মোক্ষদার মুখের দিকে তাকাইল।

সে বলিয়াই চলিয়াছিল, বিয়ে করবে। সুধা নীরবে তাকাইয়া রহিল। মোক্ষদা বলিতে লাগিল, না হয় চাকরি করবে। কত মেয়েই তো করছে আজকাল। নেকাপড়া শিখেছ। সুধা জবাব দিল না। মোক্ষদা মুচকি হাসিয়া কহিল, তাও যদি না কর তো এই মুকী বোষ্টমীর ওপর সব ভার ছেড়ে দিও দিদিমণি। যদি দু মাসের মধ্যে তোমাকে রাজরাণী বানিয়ে না তুলতে পারি তো, আমার নামে কুকুর পুষো তুমি।

দুই ভ্রূ কুঁচকাইয়া সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, কি?

মোক্ষদা কহিল, রাজরাণী গো দিদিমণি! ইস্ত্রী তো পায়ের দাসী। মাথার মণি ক'রে রেখে দেবে বলছে—বাড়ি ক'রে দেবে, কাপড়-গয়না যত চাই দেবে—

গূঢ় ক্রোধের সহিত ধারালো কণ্ঠে সুধা কহিল, আমার জন্যে তোমার যে ঘুম নেই মোক্ষদা! এর মধ্যে খদ্দেরও যোগাড় করেছ! তা খদ্দেরটি কে শুনি?

মোক্ষদা মুখ ও চোখ ঘুরাইয়া কহিল, দিদিমণির যেমন কথা! খদ্দের কি গো? নাগর। বরের চেয়ে বেশি। কাত্তিকের মত চেহারা, দাদাবাবু তার পায়ের নখের যুগ্যিও নয়। পাঁচ পাঁচখানা বাড়ি শহরে, অঢেল পয়সা। নেকাপড়া-জানা লোক, দু দুটো পাস। স্ত্রীটা সুন্দরী হ'লে কি হবে, একেবারে গো-মুখ্যু, সোনার-বেনের মেয়ে কিনা।

বাবুটির পাস-করা মেয়ের ভারী শখ। সেদিন এসে নিজের চোখে তোমাকে দেখে গেছে, আর সব শুনেছেও—

সুধা বাধা দিয়া কহিল, ওঃ, তাই নাকি? তুমিই শুনিয়েছ বুঝি?

মোক্ষদা গালে হাত দিয়া কহিল, ও কি কথা দিদিমণি! আমি ও কথা বলতে পারি কাউকে? ছি ছি, নিদ্দোষীকে এমন ক'রে—

সুধা ধমক দিয়া কহিল, চুপ কর। তুমি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। সব করতে পার তুমি। তোমার যা কিছু পাওনা আছে, নিয়ে আজই আমার বাড়ি থেকে চ'লে যেও তুমি।

কান্না যেন মোক্ষদার ঠোঁটের ওপাশেই অপেক্ষা করিতেছিল, ভেউভেউ শব্দে বাহির হইয়া আসিল। চোখে অঞ্চল দিয়া অশ্রু-বিকল স্বরে মোক্ষদা গড়গড় করিয়া যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, সে যাহা করিয়াছে, তাহা সুধার ভালর জন্যই।

তারপর এক মুহূর্ত্তে অশ্রু-সংবরণ করিয়া কলহের স্বরে কহিল, আমি না হয় চ'লেই যাচ্ছি, কিন্তু কেলেঙ্কারি ঢাকবে কি ক'রে শুনি? ঐ পাপ নিয়ে যাবে কোন্ চুলোয়?

সুধা তীব্র চাপা স্বরে কহিল, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি যাও। কিন্তু মোক্ষদাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দরজার দিকে হাত বাড়াইয়া তীব্রতর কণ্ঠে কহিল, যাও, যাও বলছি।

মোক্ষদা সুধার দিকে একবার অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে বিশুকে ডাকিয়া সুধা কহিল, বিশুদা, সারাদিন কোথায় থাক? একবারও তোমার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাবার জো নেই!

বিশু প্রতিবাদের স্বরে কহিল, বাঃ রে! সারাদিনই তো বাড়িতে থাকি।

সুধা অভিমানের স্বরে কহিল, একবারও খোঁজ নাও না, আমি মরেছি, না বেঁচে আছি! বাবা নেই, তুমি ছাড়া আমার আর কে আপনার আছে, বল।

বিশু কাঁচুমাচু মুখে কহিল, খোঁজ নিই তো মোক্ষদার কাছে।

সুধা সক্ষোভে কহিল, আর খোঁজ নেওয়া! কাল থেকে জ্বর হয়েছে, একবারও জিজ্ঞেস করেছ, কেমন আছি?

বিশু অপ্রতিভ মুখে কহিল, জ্বর হয়েছে নাকি? কই, বুড়ী মাগী তো কিছু বলে নি আমাকে! সদম্ভে কহিল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তাকে।—বলিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই সুধা কহিল, কোথায় পাবে তাকে? সে তো নেই, তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি আমি।

বিশু বিস্ময়ের সহিত কহিল, তাই নাকি? কেন?

সুধা গম্ভীর স্বরে কহিল, ঝি রাখবার পয়সা নেই আমাদের। ঠাকুরও ছাড়িয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া এ বাড়িও ছেড়ে দিতে হবে, বাড়িওয়ালা নোটিস দিয়েছে। তোমার তো কোন ভাবনা-চিন্তা নেই, ব'সে ব'সে কেবল গাঁজা খাচ্ছ আর ঝিমচ্ছ!

বিশু লজ্জিত মুখে কহিল, ঝিমই না তো। কি করতে হবে বল?

সুধা কহিল, করতে হবে অনেক কিছু, কিন্তু তা পরে করলেও চলবে। সম্প্রতি আমার জন্যে একটু ওষুধ এনে দাও দেখি, আর বুকের বেদনার জন্যে একটা মালিশ। যন্ত্রণার ভঙ্গিতে কহিল, সারা বুকটা যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে, নিশ্বাস নিতে পর্য্যন্ত পারছি না।

বিশু ভয়ে ভয়ে কহিল, হোমিওপ্যাথী ওষুধ—

সুধা বিরক্তভাবে কহিল, ওতে কিছু হবে না, বিশুদা। যা বলছি, তাই এনে দাও। ডাক্তারকে বুঝিয়ে বলবে, বুকের অসহ্য বেদনা, যেন ভাল দেখে একটা মালিশ দেন।—বলিয়া ডাক্তারের ফী ও ঔষধের দাম দিয়া তাহাকে বিদায় করিল।

অগ্রহায়ণের এক শুভলগ্নে মাধুরীর সহিত মনোজের বিবাহ হইয়া গেল। জোড়ে শ্বশুর-বাড়ি ফিরিয়া আসার দিন দুই পরে একদিন শয়ন-কক্ষে বসিয়া মনোজ খবরের কাগজ পড়িতেছিল। হঠাৎ একটা খবরের দিকে চাহিবামাত্র চোখ যেন আটকাইয়া গেল। খবরটা এই:—কলিকাতার —স্ট্রীটের জনৈকা সপ্তদশ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা তরুণী, নাম—সুধানলিনী বোস, মালিশ সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। দেহ-পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখিতে দেখিতে মনোজের চক্ষের সম্মুখে দিনের আলো নিবিয়া গিয়া সন্ধ্যার তরল অন্ধকার নামিল এবং সেই অন্ধকারকে মথিত করিয়া একটি নারীকণ্ঠের ক্লান্ত ও করুণ স্বর বাজিতে লাগিল, বেশি দেরি ক'র না, বুঝলে? শিগগির ফিরে এস।

হঠাৎ কাহার কোমল স্পর্শে ফিরিয়া চাহিয়া মনোজ দেখিল মাধুরী, রূপ ও যৌবনের ঝলকে সর্ব্বাঙ্গ ঝলমল করিতেছে, সৌভাগ্যের আনন্দ যেন মুখে চোখে ধরিতে চাহিতেছে না। মাধুরী হাসিয়া মনোজের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া আবদারের সুরে কহিল, কি পড়ছ গো?

কিছু না।—বলিয়া মনোজ খবরের কাগজটা হাত দিয়া সরাইয়া মাধুরীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিল।

শ্রীঅমলা দেবী

মহাভারত-পরিক্রমা

পরিশিষ্ট

[মূল কবিতাটি এগারো বৎসর পূর্ব্বের রচনা। ইহাতে কলিকাতা মহানগরীকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো হয় নাই বলিয়া কবি নীচের অংশটুকু যোগ করিয়া ত্রুটি সংশোধন করিতে চান। ইহা নগরীর বর্ণনার মধ্যে যোগ করিয়া দিবার সুবিধা না হওয়ায় "পরিশিষ্ট"রূপে প্রকাশিত হইল।]

এই কলিকাতা ; হেথা ভারতের মাটি বায়ু জলে
পাশ্চাত্য সভ্যতা আজি ফলিয়াছে কি দিব্য ফসলে,
দেখে যেতে সাধ হয়। এখানেও দুঃখ দৈন্য আছে—
অর্দ্ধাহার, অনাহার, বিরোধ, বিদ্বেষ, আগে পাছে
সবলের উৎপীড়ন, ঋণজালা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা,
দাস্যের দৈন্যের অভিশাপ ; আছে ঘর্ঘর ঝঞ্ঝনা
কঠোর জীবন-সংগ্রামের ; কাজ কি সে কথা তুলে ?
পথে পথে তরুবীথি ছেয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়া-ফুলে,
চেয়ে দেখ কি সুন্দর ! হের হোথা সন্ধ্যারুণ রাগে
কি করুণ পরিহাস ভিক্টোরিয়া-স্মৃতিসৌধে জাগে !
ধবল মর্ম্মরস্তূপে সবলের দুর্ব্বল প্রয়াস
শিল্পকীর্ত্তি রচিবারে। নদীতীরে হের সৈন্যাবাস ;
নদীনীরে সহস্র অর্ণবযান, তরণীর ভিড় ;
অন্ধকারে সন্ধানী আলোর খেলা। কুঞ্জ-সুনিবিড়
ইডেন উদ্যান হের। শোন কি সুন্দর ব্যাণ্ড বাজে !
শ্বেতাঙ্গ পুরুষ-নারী ফিরে হের সুবিচিত্র সাজে

সুশ্যামল তৃণক্ষেত্রে। হের বিদ্যুজ্জ্যোতিদীপ্ত পথে
সহস্র বিপণি রাজে ; ধরণীর প্রান্ত প্রান্ত হতে
সঞ্চিত সজ্জিত সেথা বিলাসের লক্ষ উপচার
অর্থক্রেয়। হের চলে ট্রাম বাস হাজারে হাজার
গোযান, মনুষ্যযান। হের আলিপুর পশুশালা,
পুরাকীর্ত্তি-রক্ষাগার। গ্রন্থশালা হের সুবিশালা
চৌরঙ্গীর ; চিত্রশালা, অন্ন-পানশালা শত শত
জনাকীর্ণ জ্যোতির্ম্ময়। হের প্রেক্ষাগৃহে অবিরত
সহস্রজনের ভিড়। হের ঢাকুরিয়া হ্রদতীরে
পতিসনে, সখীসনে, সখাসনে পুরাঙ্গনা ফিরে
বিচিত্র বসনে সাজি ; যুবতী জরতী বর্ণচোরা
আপীনা, পীবরা, ক্ষীণা ; কারো হাইহীল জুতাজোড়া,
অলক্তকসিক্ত পদে নাগরা, স্যাণ্ডাল কেহ পরি,
আকুলকুন্তলা কেহ, কারো কেশে আলোল কবরী,
কেহ নীলোৎপলশ্যামা, সঞ্চারিণী দীপশিখা কেহ
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ, কেতকী-পাণ্ডুর কারো দেহ,—
আলাপে প্রলাপে চলে বিচ্ছুরিয়া আনন্দ-আলোক।
কবি, তব উজ্জয়িনী যতই কবিত্বময়ী হোক,
কলিকাতা সুখময়ী। ছাত্রদল যায় বিদ্যালয়ে
ট্রামে বাসে পদব্রজে ; ছাত্রীদল গ্রন্থ বুকে লয়ে
চলে সাথে দলে দলে, সখীসাথে হাস্য-পরিহাসে—
বর্ণে গন্ধে জাগাইয়া পুলক-স্পন্দন চারিপাশে,
লাবণ্যে হিল্লোল তুলি। পথপ্রান্তে গুলমোর-বীথিকা
ফুলে ভরে ; তার পানে চেয়ে বিরহিণী আধুনিকা
ধনীগৃহ-বাতায়নে যদি কভু ফেলে দীর্ঘশ্বাস—
বেতারে বিরহগানে আজ তারে জানায় আশ্বাস
নিত্য নব সুরশিল্পী। ধারাযন্ত্রে করি সুখস্নান,—
সুগন্ধি ফেনকধৌত স্নিগ্ধদেহে করি পরিধান
দিব্য ক্ষৌমবাস, খায় কান্তে স্মরি সুমিষ্ট সন্দেশ

বিরহিণী চা-র সাথে ; তাহে না ঘুচিলে মনোক্লেশ
চ'লে যায় ছায়াছবি-ঘরে ; উগ্র প্রেমলীলা হেরে
সচল আলোকচিত্রে আপন তৃষিত হৃদয়েরে
কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দেয়। বোতাম টিপিলে ঘুরে পাখা ;
শীতল পানীয় অন্ন 'ফ্রিজিডেয়ারে'তে থাকে রাখা ;
টেলিফোনে দূরে বসি চলে প্রেমালাপ। এত সুখ
ছিল কি তোমার কালে ? সত্য বটে, বলিবে দুর্মুখ,
এ সুখ সবার তরে নহে। উষালোকে টুটে ঘুম
পুরপরিষ্কারকের শকট-ঘর্ঘরে ; উঠে ধূম
লক্ষ গৃহে লক্ষ চুল্লী হতে। হেথা নবমেঘ দরশনে
লক্ষ মসীজীবী প্রাতে চলে পথে সশঙ্কিত মনে,—
ধারাজলসেকভীত। উহাদের দশটা বেলায়
অফিসে যেতেই হবে। পথপঙ্ক উৎক্ষেপি হেলায়
উহাদের শুভ্র বস্ত্রে ধনীর মোটর চলে ছুটে,
যেতে দাও ; উহাদের বুদ্ধি-অস্ত্রে ভিন্নদেশী লুঠে
উহাদেরি মায়ের ভাণ্ডার, নিতে দাও। ওরা তবু
বিদগ্ধ বাঙালী। যদি কৃপা করি অন্ন দেয় প্রভু,
তবেই নিশ্চিন্ত। দেখি উহাদের ক্লাবে সিনেমায়
ক্রীড়াক্ষেত্রে হোটেলেতে কে বলিবে খেতে নাহি পায় ?
কবি, ওরা বড় দুঃখী। বর্ষা নগরীর তরে নহে,
নহে কেরানীর তরে। বাঁধিয়া মারিলে সবই সহে,
তাই নবমেঘোদয়ে হেথা হোথা হতে করি চুরি
দু ছত্র কবিতা লেখে ; দুটো দিন খাইয়া খিচুড়ি,—
দু পাত্র চা খেয়ে ভুলে ধোপার হিসাব কোনমতে।
উহাদের ছেড়ে দেওয়া ভাল। ভাসমান সেতুপথে
পার হয়ে ভাগীরথী যাই চল গ্রামে পুনরায়।
প্রকৃতির স্নেহকোলে দেহমন জুড়াবে ত্বরায়।

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিক্টেটর

দুইজনে প্রথম পরিচয় হইল কলেজের সিঁড়িতে।

ছেলেটি উপরে উঠিতেছিল, মেয়েটি চলিয়াছিল নীচে। পরস্পরের পাশ কাটাইয়া যাইবার সময়ে মেয়েটির হাত হইতে ছোট্ট একখানি নোটখাতা পড়িয়া গেল।

মেয়েটি দেখিতে পাইল না। ছেলেটি পাইল। হেঁট হইয়া খাতাটি তুলিয়া লইল। পিছনে চাহিয়া দেখিল, মেয়েটি অনেকটা নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। চেঁচাইলে সেটা ভাল দেখায় না। অগত্যা ছেলেটিও পিছন পিছন নামিয়া গেল। কাছে গিয়া কহিল, এক্স্‌কিউজ্ মি, আপনার খাতাটা। সিঁড়িতে প'ড়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি হাত পাতিয়া খাতাটা লইয়া বলিল, থ্যাঙ্ক্‌স্।

স্ফুলিঙ্গ হইতে আগুন। সাক্ষাৎ হইতে আলাপ।

মেয়েটি বলিল, কিন্তু আমার ভাল লাগছে না, যাই বলুন। এ রকম ক'রে আলাপ হওয়াটা পুরোনো হয়ে গেছে। যেন চার পয়সা দামের সাপ্তাহিকের গল্প।

ছেলেটি কহিল, ক্ষতি কি ?

মেয়েটি কহিল, পচা ধ্যাধ্যেড়ে প্লটের হিরোইন হতে ভাল লাগে না আমার। গা-ঘিনঘিন করে।

ছেলেটি কহিল, পচা প্লট হয়, সে লেখক বুঝবে। সুনাম হোক দুর্নাম হোক, হবে তার। আমাদের তো কাজ হয়ে গেল।

মেয়েটি কহিল, কি কাজ আবার ?

ছেলেটি কহিল, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ। সেটা ঘটিয়ে দিয়েছেন ব'লে লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মেয়েটি ঠোঁট উলটাইয়া কহিল, ওটাও পুরোনো কথা হ'ল। অবশ্য যা সুরু গল্পের, কতই বা আর হবে!

ছেলেটি কহিল, গল্পের দোষ দেবেন না। আমার তো ভালই লাগছে।

মেয়েটি কহিল, সে আপনারা এমনি একটু হ্যাংলা ব'লে। নইলে গল্পের আরম্ভ এমন কিছু ব্রাইট হয় নি।

ছেলেটি কহিল, হবে।

মেয়েটি কহিল, আর ধন্যবাদ যেগুলো লেখককে দিয়ে অপচয় করলেন, আসলে সে পাওনা ছিল আমার।

ছেলেটি কহিল, কারণ?

মেয়েটি কহিল, কারণ, পরিচয় আমাদের তিনি করিয়ে দেন নি।

ছেলেটি কহিল, আপনি বলবেন, দৈবাৎ? কিন্তু ঠিক ঐখানটিতে এসে যদি আপনার নোটবই না প'ড়ে যেত, হয়তো দুজনের পরিচয় কোন দিনই হ'ত না।

মেয়েটি কহিল, ধ'রে নিলাম তাই। তাতে হ'ল কি?

ছেলেটি কহিল, লেখকের মহত্ব প্রমাণ হ'ল। ঠিক জায়গায় এবং সময়টি বুঝে নোটবুকটা যাতে পড়ে, সে ব্যবস্থা তো তিনিই করেছেন?

মেয়েটি কহিল, মোটেই না। করেছি আমি। নোটবুক আমার, লেখকের নয়। আমার ইচ্ছে না হ'লে সে পড়তে পারে কখনও?

ছেলেটি কহিল, তার মানে?

মেয়েটি কহিল, মানে যদি বলি, খাতাটা আমি নিজেই ফেলে দিয়েছিলাম?

ছেলেটি কহিল, ইচ্ছে ক'রে?

মেয়েটি কহিল, যদি বলি, হ্যাঁ?

ছেলেটি কহিল, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে ফেলবেন কেন?

মেয়েটি কহিল, যদি বলি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যেই?

ছেলেটি কহিল, কেন?

মেয়েটি কহিল, যদি বলি, অঙ্ক বুঝে নোব ব'লে? শুনেছি, আপনি খুব ভাল অঙ্ক জানেন। ডক্টর সেন বলেছেন। তাই।

ছেলেটি কহিল, বিশ্বাস হবে না।

মেয়েটি কহিল, বেশ, তা হ'লে আমিই মিথ্যে বলছি।

ছেলেটি কহিল, না না, তা বলি নি। কিন্তু আলাপ করবার জন্যে খাতা ফেলবেন কেন?

মেয়েটি কহিল, তাই নিয়ম।

ছেলেটি কহিল, খাতা ফেলা?

মেয়েটি কহিল, ঠিক খাতা ব'লে নয়। আইডেন্‌টিফাই করা যায় এমন কোন একটা জিনিস। মেমসায়েবরা রুমাল ফেলে দেয়। সংস্কৃত বইয়ে পড়েন নি?

ছেলেটি কহিল, আমার সায়ান্স।

মেয়েটি কহিল, ও। প্রাচীন ভারতে রাজকন্যারা লীলাকমল ফেলে দিতেন। তার চাইতে অবশ্য নোটবুকে সুবিধে বেশি।

ছেলেটি কহিল, কেন?

মেয়েটি কহিল, লীলাকমলের অনেক হাঙ্গাম। তার বোঁটাটা দাঁতে কেটে বোঝাতে হবে আমি দন্তবাট রাজার কন্যা, ফুলটা মুখে বুলিয়ে বোঝাতে হবে আমার নাম কমলা, ফুলটাকে খাড়া ক'রে ধ'রে একবার নেড়ে বোঝাতে হবে এক নম্বর পদ্মপুকুর রোডে থাকি, সূর্যের দিকে

তাকিয়ে বোঝাতে হবে রবিবারে আসবেন আমাদের বাড়িতে, পশ্চিম-মুখো হয়ে ফুলটাকে চারবার ঘুরিয়ে বোঝাতে হবে বিকেল চারটেয়।

ছেলেটি কহিল, এই সব ছিল নাকি তখন?

মেয়েটি কহিল, নোটবুকে হাঙ্গামা নেই। নামটি ঠিকানাটি লিখে দিলাম, প'ড়ে নিলেই হ'ল। লীলাকমলের সঙ্কেত আবার রাজপুত্তুরদের হোঁৎকা মাথায় ঠিক ঢুকত না সব সময়—মন্ত্রীপুত্রকে দিয়ে মানে করিয়ে নিতে হ'ত। মন্ত্রীপুত্রটি হাতের কাছে না থাকলেই রাজপুত্তুর চিত—টেস্টের আগে মেড-ঈজির মতন।

ছেলেটি কহিল, যাকগে। আলাপ তো হ'ল। তারপর?

মেয়েটি কহিল, তারপর আজ শুক্কুরবার। আমার ক্লাস দুটো বেজে পনরোয়, ছুটি হয়েছে। পালাই।

আগুন হইতে শিখা। আলাপ হইতে পরিচয়।

সোমবার আবার দেখা হইল। সেই সিঁড়িতে।

মেয়েটি কহিল, গেলেন না যে বড়?

ছেলেটি কহিল, কোথায়?

মেয়েটি কহিল, বা রে মেমরি! এই মন নিয়ে পাস করেন কি ক'রে? সেদিন ব'লে গেলাম না, রোববারে যাবেন?

ছেলেটি কহিল, কখন আবার বললেন?

মেয়েটি কহিল, আপনার কিচ্ছু হবে না।

ছেলেটি মাথা চুলকাইয়া কহিল, ওঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখুন, একদম ভুলে গেছি।

মেয়েটি কহিল, মিছে কথা। বোঝেনই নি মোটে। সব রাজপুত্তুরই কি বোকা হয় পৃথিবীতে?

ছেলেটি কহিল, অন্তত গল্পের রাজপুত্তুররা হয়।

মেয়েটি কহিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাক, কাল ছুটি আছে। যাবেন তো? ঠিকানা মনে আছে?

ছেলেটি কহিল, হ্যাঁ।

কথাটা মিথ্যা। ঠিকানা তাহার মনে ছিল না। মনে হইল, নোটবইটাতে নিশ্চয়ই লেখা ছিল, সে দেখে নাই। কিন্তু এখন আর ঠিকানা চাহিতে যাওয়া যায় না। অগত্যা অফিসে গিয়া সে রেসিডেন্স-ফর্মের ফাইলটা দেখিতে চাহিল। বলিল, একটি ক্লাসফ্রেণ্ডের ঠিকানা দেখা দরকার। হেডক্লার্ক একটা ফাইল বাহির করিয়া দিলেন। ছেলেটি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে খালি ছেলেদের ফর্মগুলা আছে। ঢোঁক গিলিয়া বলিল, এতে তো নেই। আর ফাইল আছে?

বুড়া হেডক্লার্ক অনেক কালের লোক। অনেক ছেলের বাবা-কাকাকেও এইখানেই পড়িতে দেখিয়াছেন। চশমার উপর দিয়া চাহিয়া বলিলেন, মেয়েদের ফাইল দেওয়া হয় না। কার ঠিকানা চাই?

ছেলেটি নাম বলিতে পারিল না, রক্তবর্ণ হইয়া পলাইয়া আসিল।

দুই দিন পরে আবার দেখা হইল। ছেলেটি তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চাহিয়া সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু অলক্ষ্যে পলায়নের পক্ষে সিঁড়ি প্রশস্ত স্থান নয়।

মেয়েটি কহিল, থাক থাক, লজ্জা পাবার দরকার নেই। আপনি যাবেন না, আমি জানতাম।

ছেলেটি হাসিতে গিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ করিল, তাহার অর্থ বোঝা দুষ্কর। বুঝিবার চেষ্টাও অবশ্য মেয়েটি করিল না। কহিল, ক্লাস আছে?

ছেলেটির হঠাৎ কি মনে হইল ; কহিল, না। আপনার ?

মেয়েটি কহিল, আমারও নেই।

ছেলেটি কহিল, তা হ'লে চলুন না, কোথাও গিয়ে বসি।

মেয়েটি কহিল, হঠাৎ ?

ছেলেটি কহিল, হঠাৎ নয়। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। কদিন থেকেই ভাবছি বলব।

মেয়েটি কহিল, বুঝেছি। তাই যান নি। কিন্তু এখন যাব কোথায় ?

ছেলেটি বলিল, যেখানে হোক। পার্কে ?

মেয়েটি কহিল, এই রদ্দুরে! বাপ রে!

ছেলেটি কহিল, ছায়াও আছে।

মেয়েটি কহিল, লোকে নিন্দে করবে।

ছেলেটি কহিল, তবে ?

মেয়েটি কহিল, চলুন, রাস্তায়ই বেরিয়ে পড়ি।

দুপুরবেলা, ট্রাম নির্জন। পাশাপাশি সীটে দুইজনে বসিল।

মেয়েটি কহিল, এবার বলুন, কথাটা কি ?

ছেলেটি কহিল, কথাটা হচ্ছে, পরিচয় তো হ'ল। কিন্তু এর শেষটা দাঁড়াবে কি ?

মেয়েটি কহিল, শেষ যে একটা দাঁড়াতেই হবে, তার কি মানে আছে! পৃথিবীতে চলতে রোজ কত মানুষের সঙ্গেই পরিচয় হয়, দুদিন তাদের মনে থাকে, আবার ভুলে যাই। বিশেষ ক'রে 'শেষ' কজনের বেলায় হয় ? স্কুলে কলেজেই যত জনের সঙ্গে পড়েছি, তার মধ্যে সবাইকে কি মনে আছে ?

ছেলেটি কহিল, তাদের কথা আলাদা।

মেয়েটি কহিল, তাদের কথা আলাদা নয়, বরং সেইটেই স্বাভাবিক। সহজও। বরং বলুন, আমাদের কথা আলাদা। তাই তো ?

ছেলেটি কহিল, বেশ, তাই না হয় হ'ল। কিন্তু সত্যি বলুন না, আপনি ভেবেছেন কিছু ?

মেয়েটি কহিল, বাবা, অত ভাবে কে ব'সে ব'সে!

ছেলেটি কহিল, কিন্তু না ভাবলে তো হবে না। সত্যি বলুন না, এর শেষ হবে কি ক'রে ?

মেয়েটি কহিল, যদ্দুর দেখছি, কিচ্ছু না ক'রে।

ছেলেটি কহিল, তার মানে ?

মেয়েটি কহিল, মানে, আমরা ইলোপও করব না, বিয়েও করব না, সন্ন্যাসও নোব না, যক্ষ্মা হয়েও মরব না। কলেজে আসব যাব, ক্লাস করব, পরীক্ষা দোব, পাস ক'রে বেরোবার পরে আর কারু কথা কারু মনে থাকবে না।

ছেলেটি কহিল, কক্ষনো নয়। আপনি মনে না রাখতে পারেন, কিন্তু আমি—

মেয়েটি কহিল, থাক থাক, হয়েছে। আপনার মেমরি খুব ভাল সে জানি। প্রমাণ পেয়েছি।

ছেলেটি কহিল, আপনি তামাশা করছেন। কিন্তু আমি সত্যি বলছি আপনাকে—

মেয়েটি কহিল, কি আপদ, আমিই কি মিথ্যে বলছি! বরং আমি যেটা বলছি, সেইটেই হবার চান্স ষোল আনা।

ছেলেটি কহিল, কেন ?

মেয়েটি কহিল, তার প্রথম কারণ, সেইটেই সচরাচর ঘ'টে থাকে।

ছেলেটি কহিল, বলতে চান তার এক্সেপ্‌শন কোথাও হয় না?

মেয়েটি কহিল, গল্পে, সেও সস্তা পত্রিকার গল্পে। সে রকম খেলো গল্পের খেলো নায়িকা হবার শখ আমার মোটেই নেই। এই হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ।

ছেলেটি কহিল, কিন্তু খেলো বলছেন, এ রকম গল্প তো রবিবাবু নিজেও লিখেছেন।

মেয়েটি কহিল, কিন্তু তৃতীয় কারণ, এ গল্পটা রবিবাবু লিখছেন না। যে লোকটি লিখছে, তার অন্য বিদ্যে থাক না থাক, রোমান্স লেখবার বিদ্যে মোটেই জানা নেই।

ছেলেটি কহিল, কি ক'রে বুঝলেন?

মেয়েটি কহিল, গতিক দেখে। আঙ্কেকের ওপর গল্প লেখা হয়ে গেল, এর মধ্যে একটিও রোমান্টিক কথা আমাদের কাউকে দিয়ে বলিয়েছে? বলাবেও না, দেখবেন।

ছেলেটি কহিল, বলাবে না, ইয়ার্কি? বলাবে না তো এ রকম ক'রে গল্প আরম্ভ করবার মানে? বেশ তো ছিলাম দুজনে, আমি কলেজে আসতাম যেতাম, আপনি কলেজে আসতেন যেতেন, কি দরকার ছিল তার দুজনের এমন ক'রে দেখা করিয়ে দেবার? দেখা করিয়ে, সব করিয়ে, এখন বলছেন—

মেয়েটি কহিল, চুপ চুপ। সবাই চেয়ে আছে।

ছেলেটি কহিল, থাকগে। ট্রাম কেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোক চেয়ে থাক, আমার যে কথা সত্য মনে হয়, সে কথা আমি বলবই। কারুকে আমি ভয় করি না। একটা কথা জানেন তো, বাপ-মাও যদি ছেলেকে খুন করে, তাদের ফাঁসি হয়? আমাদের প্রথম সৃষ্টি লেখক ক'রে থাকতে পারে, কিন্তু তার নিজের খেয়াল মাফিক আমাদের জীবনকে ভেঙে মুচড়ে

খেলা করতে সে পারে না, সে অধিকার তার নেই। এ কি অত্যাচার! গল্পের সুরু না হয় তিনিই করেছেন, তাই ব'লে—

মেয়েটি কহিল, সারলে। অতবড় প্যারাগ্রাফ একদমে বলতে নেই, পাঠক পড়ে না। সংক্ষেপ করুন।

ছেলেটি কহিল, Be serious, please। গল্পের সুরু লেখক করেছেন ব'লে আমাদের হাঁটতে হবে বসতে হবে তাঁর হুকুমে, কথা বলতে হবে তাঁর ইচ্ছেমত?

মেয়েটি কহিল, বলা যায় না কিছুই। হয়তো এ কথাগুলোও আমাদের তিনিই বলাচ্ছেন আসলে।

ছেলেটি কহিল, বলব না সে কথা। আমিও রিভোল্ট করলাম।

মেয়েটি কহিল, আপনি তা হ'লে বলতে চান কি?

ছেলেটি কহিল, বলতে চাই—

লেডিজ সীট।

ছেলেটি অগত্যা সীট ছাড়িয়া দূরে সরিয়া বসিল। কথাটা আর তখন বলা হইল না।

পরদিন বলা হইল, লেকের ধারে সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় বসিয়া।

মেয়েটি কহিল, কি যেন আপনি বলতে যাচ্ছিলেন কাল?

ছেলেটি কহিল, বলতে যাচ্ছিলাম, লেখকের ডিক্টেটরশিপ মানতে আমার আপত্তি আছে।

মেয়েটি কহিল, কিন্তু না মেনে উপায় নেই, যখন ছাপার অক্ষরে বেরুতে হবে তার কলম বেয়েই।

ছেলেটি কহিল, কিন্তু সব গল্পের ক্যারেক্টাররা একসঙ্গে যদি রিভোল্ট করে, তবে নিশ্চয়ই এর বিহিতও করা যায়।

মেয়েটি কহিল, যদি। দেশ স্বাধীন করবার জন্যেই সব একসঙ্গে দাঁড়াতে পারলে না, তা গল্পের পরিণতির জন্যে। আপনিও যেমন।

ছেলেটি কহিল, কিন্তু পাঠকরা ?

মেয়েটি কহিল, তাদের কথা জানি না। কোন্‌টা তাদের ভাল লাগে, কোন্‌টা লাগে না, সে স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও জানেন না। এই গল্পকেই হয়তো কেউ বলবে ভাল, কেউ ছুঁড়ে ফেলে দেবে খাটের তলায়। কিন্তু সমাজ-সংস্কার এখন থাক। আমাদের কথা বলুন। গল্পের শেষ কি ভাবে হয় আপনার ইচ্ছে ?

ছেলেটি কি বলিতে গিয়া বিষম খাইল। কান লাল হইয়া উঠিল ; ঢোক গিলিয়া কহিল, আপনার কি ইচ্ছে আগে বলুন।

মেয়েটি মনে মনে কহিল, ভূত। মুখে কহিল, আমার কথা তো বলেইছি, সস্তা প্লটে আমার আপত্তি আছে।

ছেলেটি বিবর্ণ মুখে কহিল, সস্তা প্লট বলছেন কাকে ?

মেয়েটি কহিল, যে কোন রোমান্টিক পরিণতিকে, সে বিয়েই হোক, আর যক্ষ্মাই হোক।

ছেলেটি কহিল, তবে ?

মেয়েটি কহিল, কিচ্ছু না, আমরা এমনি থাকব। এমনি একসঙ্গে পড়ব, গল্প করব, হয়তো বেড়াতেও আসব, তারপর আবার দূরে স'রে গেলেই সব ভুলেও যাব। মোট কথা, আর যাই হোক, লাভে আমরা পড়ব না।

ছেলেটি কহিল, কিন্তু পাঠকরা কি বলবে ?

মেয়েটি কহিল, কিছুই বলবে না। পাঠকরা ভাল ছেলে—গল্প পায়, পড়ে, আর ভুলে যায়। মনেও রাখে না, সে নিয়ে মতামতও দেয় না।

ছেলেটি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাথার উপরে চাঁদের আলো, তাহাকে ঘিরিয়া হালকা সাদা মেঘের স্রোত, সম্মুখে লেকের গভীর কালো জল—সমস্তই বৃথা বহিয়া যাইতেছে। এমন সময়টি যে কথাগুলা বলিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলা যাইতেছে না।

অনেকক্ষণ পরে মেয়েটি কহিল, কি ভাবছেন এত ?

ছেলেটি কহিল, কিছু না। তারপর কহিল, ভাবছি, এই যদি হয়, তবে লেখক আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে কেন ?

মেয়েটি হাসিল, কহিল, আপনার রাগ কিছুতেই যাচ্ছে না। যদি বলি, লেখক পরিচয় করিয়ে দেয় নি, আমরাই পরিচয় ক'রে ফেলেছি ? বা আমিই নিজে পরিচয় ক'রে নিয়েছি ?

ছেলেটি কহিল, আগেও তাই বলেছিলেন বটে। কিন্তু কেন করলেন ?

মেয়েটি কহিল, যদি বলি, এমনিই ?

ছেলেটি কথা কহিল না।

মেয়েটি কহিল, তা হ'লে আমাদের এই প্যাক্টই ঠিক হ'ল তো—আমরা কিছু করব না ?

ছেলেটি অন্যমনে কহিল, হ্যাঁ।

মেয়েটি কহিল, অনার ব্রাইট ?

ছেলেটি কহিল, অনার ব্রাইট।

স্ফুলিঙ্গ হইতে আগুন। আগুন হইতে শিখা। শিখা হইতে দাবানল।

ইহার অনেকদিন পরের কথা। অনেকবার সাক্ষাতেরও পরের। আবার দুইজনে লেকের ধারে বসিয়া ছিল। সেদিনও সন্ধ্যা, কিন্তু

চাঁদ নাই। আকাশে ঘনকৃষ্ণ মেঘের রাশি, নীচে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার। বৃষ্টি আসন্ন; লেক প্রায় জনহীন।

মেয়েটি কহিল, ভারী চমৎকার লাগছে অন্ধকারটা। শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এমনি কালোই ছিলেন, না হ'লে শ্রীরাধার মুণ্ডু ঘুরত না।

ছেলেটি কহিল, হবে। ওসব বুঝি না বিশেষ।

মেয়েটি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিল, "গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে—গরজে গগনে!"

ছেলেটি কহিল, কমলা, একটা কথা বলব?

মেয়েটি কহিল, নাম ধ'রে ডাকলেন যে?

ছেলেটি কহিল, রাগ করলে?

মেয়েটি কহিল, না, রাগ কেন করব, আপনি লম্বায় অনেক বড়। কিন্তু লোকে নিন্দে করবে।

ছেলেটি বলিতে চাহিল, করুকগে। কিন্তু বলিল না। তাহার মনে আঘাত লাগিল। শুধু 'লম্বায় বড়' বলিয়া?

আবার চাহিয়া দেখিল। অন্ধকার বড় বেশি, কমলার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না। সে মুখে কিসের ছটা খেলিতেছে—হাসি, না কৌতুক; বর্ষণ, না বিদ্যুৎ; কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

আবার ডাকিল, কমলা!

কমলা কহিল, কি?

যেন কত দূর দূরান্তর হইতে স্বরটা ভাসিয়া আসিল। কমলা কাছেই বসিয়া আছে, তবু কমলা কাছে নাই। অসীম অন্ধকারের মধ্যে কমলা ডুবিয়া গিয়াছে।

ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর কহিল, কি ভাবছ?

কমলা উত্তর দিল না।

ছেলেটি আবার ডাকিল, কমলা!

কমলা আবার কহিল, কি?

ছেলেটি কহিল, কি ভাবছ?

কমলা হঠাৎ কহিল, ভয় করছে।

ভয় করছে? কেন?

কি জানি। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি নামবে। যদি নামে, কি করব?

অদ্ভুত ছেলেমানুষী সুর তাহার গলায়। এ গলা ছেলেটি কোন দিন শোনে নাই। আকাশচারিণী বিদ্যুৎশিখা যেন অকস্মাৎ পুষ্পভারনতা বল্লরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, মাটিতে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

ছেলেটি ধীরে ধীরে একখানি হাত তুলিয়া তাহার পিঠে রাখিল। কহিল, তাতে ভয় কিসের?

কমলা তেমনই অবশ গলায় কহিল, সত্যি ভয় করছে।

ছেলেটি কহিল, বাড়ি যাবে?

কমলা কহিল, না।

ছেলেটি হাত আরও একটু বাড়াইয়া কমলার পিঠটা বাহুতে জড়াইয়া লইল—ভীরু লতাবল্লরীকে মহীরুহের আশ্রয়। কহিল, কেন, ভয় পাচ্ছ কেন? বৃষ্টি এলেই তো মজা, প্রাণ ভ'রে ভেজা যাবে।

কমলা কহিল, না, যাবে না।

তার মানে?

কি জানি।

ছেলেটি হাসিল। কহিল, যত ছেলেমানুষি! দেখি, ঠিক হয়ে ব'স।

ঘাড়ের কাছটা টনটন করিতেছিল, কমলাকে একটু পাশে ঘুরাইয়া ছেলেটি হাতটাকে স্বচ্ছন্দ করিতে চাহিল।

কমলা সঙ্গে সঙ্গে দেহের সমস্তখানি ভার এলাইয়া দিল তাহার বাহুর

উপরে ; দিয়া আরও কাত হইয়া একেবারে তাহার দেহেই ভর দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িল।

ছেলেটি আপত্তি করিল না। কেবল একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া দুইজনেরই অবস্থানটাকে সহজ করিয়া লইল। হাতটাও কমলার বাহুর উপরে একটু অনাবশ্যক জোরেই চাপিয়া বসিল কি ?

আমি তাহা বলিতে পারি না। বলিতে পারিত এক কমলা নিজে। সে কিছু বলিল না। নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া অন্ধকারের মধ্যেই চাহিয়া রহিল।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের গর্জন। কমলা কাঁপিয়া উঠিল। ছেলেটি হাতের মুঠি আরও একটু নিবিড় করিল। কহিল, ভয় নেই। কমলা, চল, বাড়ি যাই।

কমলা কহিল, না।

ছেলেটি কহিল, তবে থাক ব'সে।

কমলা হঠাৎ কহিল, যদি মাথায় পড়ে ?

ছেলেটি কহিল, ম'রে যাব।

কমলা কহিল, দুজনে একসঙ্গে ? যাঃ, লোকে নিন্দে করবে।

আবার বিদ্যুৎ চমকাইল। ছেলেটি কহিল, করুকগে। বলিয়া সহসা অন্য হাতে কমলার মুখখানি নিজের দিকে ঘুরাইয়া আনিল।

কমলা নড়িল না। প্রায় অস্পষ্ট স্বরে কহিল, কি ?

ছেলেটি কথা কহিল না। নিঃশব্দে সেই মুখের উপরে নত হইয়া পড়িল।

আবার বিদ্যুৎ চমকাইল। একটা তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ আকাশ চিরিয়া কানে আসিয়া বাজিল। ট্রেন আসিতেছে।

ছেলেটির আনত মুখ কয়েকটি আঙুলে আসিয়া ঠেকিল। কমলার হাত। কমলা কহিল, যাঃ।

ছেলেটি উত্তর দিল না।

কমলা কহিল, ছাড়ুন।—বলিয়া উঠিয়া বসিতে গেল।

ছেলেটি শব্দহীন স্বরে কহিল, কেন ?

কমলা হঠাৎ হাসিল। কহিল, উঁহু। প্যাক্ট মনে নেই ?

ছেলেটি কহিল, আছে।

কমলা কহিল, তবে ?

ছেলেটি চুপ করিয়া রহিল।

কমলা কহিল, চলুন, বাড়ি যাই।

ছেলেটি বলিতে পারিত, এখন নয়, আর একটু থাক। বলিল না। বলিল, চল।

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটি কহিল, আচ্ছা, এই অন্ধকারে যদি কেউ লেকে প'ড়ে যায় ?

কমলা কহিল, পরদিন খবরের কাগজে ফোটো ছাপে। চলুন।

রাস্তায় আসিয়া উঠিয়া কমলা কহিল, জানেন, লেখক তা হ'লে কিছুতেই এ গল্প ছাপতেন না। যাচ্ছেতাই লোক।

ছেলেটি কথা কহিল না।

পার্কের কোণে আসিয়া দুইজনে বাসে উঠিল। ডবল-ডেকারের দোতলায়।

আবার পাশাপাশি সীটে। যে কমলা নিভৃত অন্ধকারে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, শহরের আলোকের মধ্যে আসিবামাত্র সে আবার হারাইয়া গিয়াছে। পাশের সীটে যে মেয়েটি বসিয়া আছে, সে সেই কমলা নয় ; নিত্য যে মেয়েটি পুঁথিপত্র লইয়া কলেজে যায় আসে, সেই মেয়েটি মাত্র। কমলা বলিয়া কেহ নাই। কেহ ছিল কি ?

তবু ছেলেটি মুখভার করিয়া বসিয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, কাল ডক্টর সেন কি যে গোটকতক অঙ্ক পড়িয়ে গেলেন ক্লাসে, এক অক্ষরও তার বুঝলাম না! বুঝিয়ে দেবেন একটু সময় ক'রে?

ছেলেটি কহিল, দোব।

মেয়েটি কহিল, কটা বাজল?

ছেলেটি ঘড়ি দেখিল। কহিল, পৌনে আট।

মেয়েটি কহিল, বকুনি খেতে হবে আজ বাড়ি গিয়ে। হ্যাঁ, শুনুন, আমাদের পাড়ায় একটা প্লে হচ্ছে, চ্যারিটি। টিকিট বেচে দেবেন?

ছেলেটি কহিল, আচ্ছা।

মেয়েটি কহিল, কাল কলেজে টিকিটের বই দিয়ে দোব আপনাকে। আর ইয়ে হয়েছে জানেন—

ছেলেটি উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আমি নাবব।

মেয়েটি কহিল, এত আগে?

ছেলেটি কহিল, হ্যাঁ।

বলিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে নামিয়া চলিয়া গেল।

স্ফুলিঙ্গ হইতে আগুন। আগুন হইতে শিখা। শিখা হইতে দাবানল। কিন্তু দাবানলের পরে কি? ইন্দ্রপ্রস্থ? না ভস্মস্তূপ? কেহ বলিতে পারে না।

ছেলেটি নামিয়া গেল। একবারও পিছনে ফিরিয়া তাকাইল না।

কমলা নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল কি? তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না।

কিন্তু বাসের অন্য যাত্রীরা পারিত। তাহারা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

পাঠকও।

লেখকও।

সম্বুদ্ধ

বন্য ও বন্যা

স্নান করিতে যাইতেছিলাম। মাথায় একটা প্রচলিত ফুলেল তেল মাখি। শিশির ছিপিটা খুলিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বাঁ হাতে ঢালিতে যাইব, আন্দাজের অতিরিক্ত খানিকটা হড়হড় করিয়া হাতের তেলোয় পড়িয়া গেল। লক্ষ্য করিয়া দেখি, লাল ঘন তেলটায় ফিকে রঙের চাকা চাকা দাগ, এদিকে অন্য দিনের চেয়েও হাতে যেন বেশি ঠাণ্ডা বলিয়া বোধ হইতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইল। তেল বাহির করিয়া লইয়া কেহ জল ঢালিয়া রাখিয়াছে নাকি?

শিশিটা তুলিয়া ধরিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছি, ঠিক তাহাই। একটু আধটু নয়, প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ জল। কাল কিনিয়াছি শিশিটা, এক দিনের খরচে সামান্য একটু খালি হইয়াছিল, প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়; আজ দেখিতেছি, প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সাবাড়! কাহার এ কীর্তি?

আমার ঘর বাড়ির বাহিরে, অন্দর-বাড়ির কাহারও সঙ্গে সংস্রব নাই। ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে দৌরাত্ম্য করে, বিশেষ করিয়া ছবি। কিন্তু মাথার তেল লইতে সাহসও করিবে না, প্রয়োজনও নাই। তবু দলটিকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। কেহ জামার ছেঁড়াটুকু ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া, কেহ কযুটে পেয়ারাসুদ্ধ হাতটা হাফ-প্যাণ্টের পকেটে সাঁদ করাইয়া, কেহ চুন-হলুদ-লাগানো মচকানো পায়ে না খোঁড়াইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে ঘরের সামনে আসিয়া জড়ো হইল। আমার কাছে ডাক পড়িবার মত সবারই কিছু না কিছু একটা খুঁত আছেই বলিয়া, সবারই সবার পিছনে দাঁড়াইবার জন্য একটু ঠেলাঠেলি—অবশ্য বিচারকের দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিয়া।

তেলের শিশিটা সামনে তুলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম, কার কাজ এ? সত্যি কথা বলবে।

গোপলার বুকের বাঁ দিকটা কি করিয়া ছড়িয়া গিয়াছে, বোতামহীন কামিজে সেখানটা ঢাকিবার চেষ্টা করিতে করিতে সামনে ঠেলিয়া আসিয়া বলিল, আমি করেছি মেজকা, আর এর জন্যে দুঃখিত।

ওটা ধূর্তের শিরোমণি। বালক জর্জ ওয়াশিংটনের সত্যবাদিতার গল্প শোনা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই এই বাঁধা গৎ আওড়াইয়া গোড়াতেই হাঙ্গাম মিটাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ভাষাটিও ব্যবহার করে সাজানো, যেমন গল্পে শুনিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করেছিস?

গোপলা থতমত খাইয়া শিশিটার দিকে একটু হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া পিছু হটিতে হটিতে ভিড়ে ঢুকিয়া পড়িল।

সকলকে অপরাধটা বুঝাইয়া দিলাম। বলিলাম, এই শিশিটার মধ্যে আদ্ধেক তেল আদ্ধেক জল—তোমরাই কেউ করেছ এই কাণ্ডটি।

একটু মিথ্যা রচনা করিয়া বলিলাম, ছবি, ঠিক তোমার কাজ এ, তখন খেলাঘরের মাছ ভাজবার জন্যে 'তেল নিয়ে আয়, তেল নিয়ে আয়' ক'রে চেঁচাচ্ছিলে।

ছবি আলাদা দাঁড়াইয়া ছিল, ভয়-করাদের দলে ওর জায়গা নয়। বলিল, ব'য়ে গেছে তোমার তেল নিতে আমার।

গটগট করিয়া চলিয়া গেল এবং নেবুতলা হইতে একটি মাটির খুরি আনিয়া আমার সামনে বসাইয়া দিয়া বলিল, ব'য়ে গেছে তোমার তেল নিতে। এই দেখ।

সত্যই দেখি, খুব পাতলা করিয়া এক খুরি গোবর-গোলা। অমন সংগতিপন্ন গৃহিণীকে চুরির অপবাদ দিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

মণ্টু বছর আষ্টেক যাইতে না যাইতে চশমা ধরিয়াছে, অল্পভাষী এবং গলার স্বরটাও গম্ভীর। সেইজন্য বাড়িতে তাহাকে প্রফেসার বলিয়া ডাকা হয়। ছবি ভয়ের আবহাওয়াটা কতকটা নষ্ট করিয়া দেওয়ায় সাহস পাইয়া বলিল, আর মাথায় মাখবার তেলে তো মাছ ভাজা হয়ও না।

গোপলাও আগাইয়া আসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল; এই রকম অপ্রিয় সত্য কিছু একটা হইতে পারে—আশঙ্কা করিয়া বলিলাম, যা, বেরো সব; খবরদার, কখন দেখেছি আমার তেলে হাত দিতে তো—

শিশির জলীয়াংশটা সন্তর্পণে ফেলিয়া দিয়া, সাবানের বাক্সটা তুলিতে হাতে যেন বেশিরকম হালকা ঠেকিল। ডালা খুলিয়া অভ্যন্তরস্থ সাবান দেখিয়া অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে হইল। বোধ হয় আধখানাও সাবান নাই। সোজা কাটিয়া লওয়া নয়; কে সূক্ষ্ম নিপুণতার সহিত চারিদিক হইতে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া চাঁচিয়া সাবানটাকে নিঃশেষ করিয়া আনিয়াছে। ওজন কমিয়াছে, কিন্তু আকৃতি হুবহু সেইরকম আছে।

কে এ যাদুকর?

নাওয়া মাথায় উঠিল। ঈজি-চেয়ারটায় গা ঢালিয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। নানা দিক দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম, জানাজানি হইলে চোর সাবধান হইয়া যাইবে। আবার ছেলেমেয়েগুলাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। ছবিকে পুরোবর্তিনী করিয়া সবাই আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, আমি সে তেল চুরির কথা টের পেয়েছি; চাকরবাকরদের বলবি নি, বুঝলি?

সবাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছি।

আমার চোখের আড়াল হইতে না হইতেই উহাদের মধ্যে একটা যেন হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিলাম, ওদের বারণ

করাটা ঠিক হয় নাই—কে কোন্ চাকরকে আগে সংবাদটা দিবে, সেই লইয়া চঞ্চলতা রেষারেষি পড়িয়া গিয়াছে। আবার ডাকিলাম।

চাকরদের ডাকাডাকি খোঁজখুঁজি করতে লেগেছিলি কেন?

সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। পাপড়ি নিজের অন্তরের ইচ্ছা এবং আমার বারণের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়া বলিল, বলব না ব'লে।

সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া—উগ্র চোখ বুলাইয়া বলিলাম, এই শুনে রাখ, কোন চাকর যদি টের পায়, কার কাছে টের পেয়েছে জিজ্ঞেস ক'রে নিয়ে তার পিঠে ঐ আস্ত বেতটা ভাঙব।

বাড়ির অন্য কেহ টের পাইলেই বা লাভ কি? শুধু গঞ্জনা অথবা বিদ্রূপ। বলিলাম, শুধু চাকর নয়, অন্য কেউও টের পাবে না।

এতবড় একটা সংবাদ একেবারেই কাহাকেও না জানাইতে পারার যন্ত্রণার কথা ভাবিয়া সকলে মুহ্যমান হইয়া আর একবার পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। গোপলা আর মনের ভাবটা চাপিতে পারিল না, স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তা হ'লেও ঐ ব্যবস্থা?

বলিলাম, ঠিক ঐ ব্যবস্থা।

সকলে একবার আড়চোখে আমার বেড়াইবার ছড়িটার পানে চাহিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

২

তক্কে তক্কে রহিলাম এবং সত্য কথা বলিতে কি, অবশিষ্ট তেল এবং সাবানটুকু ভোগে লাগিল।

কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, ঘরে যেন সময়মত ঝাঁট পড়ে

না, আসবাবপত্র ঝাড়া-ঝোড়া হয় না, এমন কি রাত্রে শুইতে যাইবার সময় রোজই দেখি বিছানা গোটানো। ঘুমের চোখে তাড়াতাড়ি টানিয়া ফেলিয়া কোন রকমে শুইয়া পড়ি। মনে করি, সকালে উঠিয়া তুলিব; কথাটা আবার ভুলিয়া যাই।

প্রায় পাঁচ ছয় দিন দুর্ভোগের পর আহারের সময় একদিন চাকরদের প্রসঙ্গ ওঠায় কথাটা মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, আর আমার ঘরেরও তো দুর্দশা ক'রে রেখেছে, বাসদেওয়াটা কটা দিনের ছুটি নিয়েছে, এরা না দেয় ঘরে ঝাঁট, না পাতে বিছানা।

মা বলিলেন, তোর ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি যায় ব'লে যখন তখন ঘরে ঢুকতে ওদের বারণ ক'রে দিয়েছিলাম, তা ব'লে—

আমি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, জিনিসপত্র চুরি হয়েছে তোমায় কে বললে?

মা যেন একটু থতমত খাইয়া গেলেন। আমার ভগ্নী বলিল, ওমা, তোমার ঘর থেকে তেল চুরি ক'রে শিশিতে জল ঢেলে রেখেছিল, এ কথা পাড়ায় কার অজানা আছে? বেহুঁশ অসাবধানী ব'লে তো তোমার বদনাম র'টে গেছে সমস্ত পাড়াটায়।

সামনে গোপাল যাইতেছিল, ডাক দিলাম, গোপলা, এদিকে আয়।

মা বলিলেন, থাক বাপু, এ নিয়ে আর মারধর করে না। আর, মারবিই বা কাকে? ও কি একা বলেছে? যাদের যাদের বারণ করেছিলি, সবাই এক এক ক'রে এসে চুপিচুপি আমায় ব'লে গেছে আর তোকে বলতে বারণ ক'রে গেছে। আহা, ওরা কি পেটে কথা রাখতে পারে! সে চোরের মত চারদিকে চাইতে চাইতে এসে বলার যদি ধরন দেখতিস!

মা হাসিতে লাগিলেন।

একটু পরে বলিলেন, আর একটু চোখ চেয়ে থাকিস। এত চুরিই বা যায় কেন জিনিস? যখন বাইরে যাবি, ঘরে চাবি দিয়ে গেলেই পারিস তো।

বলিলাম, আপিসে যাওয়ার সময় তো দিয়ে যাই চাবি। অন্য সময় দিই না, তার মানে বাসদেওয়া ছোঁড়াটা থাকে—

মা একটু ঝাঁঝিয়াই বলিলেন, মস্তবড় সাধুপুরুষ, ও তো চুরি করতে জানে না! ওই ছোঁড়াটার ওপর অতি-বিশ্বাসেই তোকে একদিন ভাল ক'রে পস্তাতে হবে; ছোটলোক ওরা, ওদের হাতে যথাসর্বস্ব কখনও ছেড়ে দেয় অমন ক'রে মানুষে?

হাত থামাইয়া বলিলাম, মা, লোক আমিও একটু আধটু চিনি। ও ছোঁড়াটার আর সব দোষই আছে, কিন্তু চোর নয়। আজ দু বছর থেকে বাইরের সব পাট ওই করছে, কিন্তু আমার কথা ছেড়ে দাও, কেউ বলুক যে, কারুর কিছু একটা চুরি গেছে—একটা কানা কড়ি। আর তেলের কথা বলছ, ও চুরি ক'রেও যদি একটু আধটু তেল কখন গায়ে মাথায় মাখে তো সে আমার ভাগ্যি ব'লেই মনে করব মা।

কেন যে মনে করিব ভাগ্য বলিয়া, তাহা বলিতেছি।

অত্যন্ত নোংরা ছোঁড়াটা। বছরে মাত্র চারিটা দিন স্নান করে, নন্দ মহারাজের মেলার দিন, তিলাসঁক্রাৎ অর্থাৎ পৌষ-পার্বণের আগের দিন, ছট অর্থাৎ কার্তিক মাসের ষষ্ঠীর দিন, আর হোলির দিন মেলা রঙ, গোবর, কাদামাটি মাথার পর বাধ্য হইয়া। এর অতিরিক্ত আমি দুই এক বার অন্য চাকরদের দিয়া জবরদস্তি স্নান করাইয়াছি, কিন্তু অভ্যাসের অভাবে জ্বরে পড়িয়া আমার কাজের ক্ষতি করে বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।

পরিষ্কার কাপড়-চোপড় দিয়া দেখিয়াছি, ওর গায়ে উঠিলে, চুম্বকে

যেমন লোহা টানে, ঠিক সেই ভাবে চারিদিককার ময়লা টানিতে থাকে। এদিক দিয়াও হাল ছাড়িয়া দিয়াছি।

বাদশা-কুড়ে। আমার ঘরের সামনে বারান্দাটিতে বসিয়া থাকে এবং একটা কিছু ফরমাশ করিলেই প্রথমে আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া আড়মোড়া ভাঙিয়া লয়, তাহাতে সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে জল বাহির হইয়া আসে। খোকা ডাক্তার, বলে, ওটা ঠিক ক্রন্দনের অশ্রু নয়। কি একটা গ্রন্থির ডাক্তারী নাম করিয়া বলে, সেইটাতে অত্যধিক চাপ লাগিয়া অনেকের অহেতুকভাবেই ঐ রকম হয়। সজল নয়নে বাসদেওয়া উঠিয়া আসে এবং ফরমাশটা শুনিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তামিল করিতে যায়। অধিকাংশ সময়েই কাজটা পণ্ড করিয়া বসে।

তবু রাখিয়াছি—চুরি কাহাকে বলে জানে না। বাসদেওয়ার পূর্বে পাঁচটি চাকরের হাতে কিছু নয় তো গোটা পঞ্চাশ টাকার জিনিস খোয়াইয়া ছোঁড়াটাকে রাখিয়াছি। আজ প্রায় দুই বৎসর আছে, নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়াছি—জামা-কাপড়ের বাক্স খুলিয়া রাখিয়া, টেবিলে খোলা মানিব্যাগ ভুলিয়া গিয়া; শৌখিন জিনিসপত্রের উপর দিয়াও হইয়াছে যাচাই, আংটি, সোনার বোতাম, ওর বয়সের ছেলেকে লুব্ধ করে এই রকম ধরনের খেলনা-জাতীয় কয়েকটা জিনিসও বাড়ি হইতে আনিয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া রাখিয়াছি, চুরি দূরের কথা, একটু ঠাঁই-নাড়াও হয় নাই। তৃণবৎ পরিহার করিয়া গিয়াছে। চাকরের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য আমি দেখি নাই।

সবাই বলে, এটাও ওর আলস্যেরই একটা দিক,—ও চুরি করার হাঙ্গামাও পোহাইতে চায় না।

যাক, সে সব তর্কের কথা তুলিতে চাই না। মোট কথা, বাসদেওয়া

চুরি করে নাই, করিবেও না কখনও—বৈরাগ্যেই হউক বা আলস্যেই হউক।

কিন্তু কথা হইতেছে, চাকর—যাহার উপর এতটা নির্ভর করিতে হয়—এত উগ্র রকম সাধু না হইয়া মাঝে মাঝে মাথার তেলটা-আসটা সরাইয়া একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার চেষ্টা করে, বেশ একটু স্মার্ট হয় সেটা কি বাঞ্ছনীয় নয়, একটা সৌভাগ্য নয়? সে তো চুরি করিতেছে না, আমার জিনিস লইয়া নিজেকে আরও ভালভাবে আমারই সেবার উপযোগী করিতেছে। সেটা সে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া করিবে, এটা আশা করি কোন্ বিবেচনায়?

৩

চুরি না করিলেও অন্য চাকরদের সঙ্গে ও ছোঁড়াটাকেও বেশ ভাল করিয়া একচোট ধমকাইয়া দিলাম। ঘরের চার্জ যখন ওরই উপর, তখন জবাবদিহিটা ওরই তো?

কাঁদিতে লাগিল; হাই তোলার সজলতা নয়, খাঁটি কান্না। কষ্ট হইল; ময়লা, বুনো, হাঁদাগোবিন্দ গোছের মানুষটা, ওর পশুর মত নিরীহ নির্বিকার মনের কোথায় যে চোট লাগিয়াছে! বড় কষ্ট হইল। সত্যই তো ও ফুলেল তেল লইয়া কি করিবে? মাথার মাঝখানে একগোছা জটপড়া টিকি, তেলের সাধ্য নাই তাহার অন্দরমহলে প্রবেশ করে। বাকিটায় তেলের প্রয়োজন নাই—মই দেওয়া মাঠের মত পরিষ্কার। বাসদেওয়ার মাথায় কখনও চুলের বালাই দেখিলাম না; একটু কালচে হইয়া আসে মাথাটা, অমনই কেহ মারয়া বসে, আত্মীয়ই হোক, কিম্বা গ্রাম-সম্পর্কেরই কেহ হোক; আবার মাথাটি যেকে সেই। কাঁধের উপর যাহার এই রকম একটা অভিশপ্ত মস্তক, সে তেল চুরি করিবে কিসের জন্য? রাখিবে কোথায়?

আরও একটা কথা। চুরি যেদিন হয়, বাসদেওয়া সেদিন ছিল না। তাহার আগের দিনই বিকাল হইতে ছুটি লইয়া কোথায় গিয়াছিল। ধমক দিবার জন্য যখন ডাকিলাম, হাই তুলিয়া সজল চোখে আসিয়া দাঁড়াইল। ধমক খাইয়া একটি কথা বলিল না; নিস্পন্দভাবে গালমন্দগুলা বোবার মত শুনিয়া গেল। নিরীহ বোকা মানুষ যেমন চাহিয়া থাকে, সেই রকম অপলক বিহ্বল দৃষ্টি, দরবিগলিত ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে। খোকা তাহার হৃদয়হীন ডাক্তারী ভাষায় যাহাই বলুক, কষ্ট হয় অত চোখের জল দেখিলে।

কয়েকদিন গেল। তেল-সাবানের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈচিত্র্য-হীন জীবন আবার নিজের বাঁধা পথে চলিতেছে। আমি ঘরে বসিয়া লিখি, বাসদেওয়া বারান্দায় ঠিক সামনেটিতে বসিয়া ঢুলিতে থাকে। অভাব কম, প্রত্যেক জিনিসই হাতের কাছে, ওকে ডাকিবার বড় একটা দরকারই হয় না। কালেভদ্রে ডাক পড়িলে হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া কাজটা পণ্ড করিয়া দেয়। একটু বৈচিত্র্য আসে, একটু বিরক্তি, বকাবকি। তাহার পর আবার পূর্ববৎ।

ইহার মধ্যে হঠাৎ একদিন বৈচিত্র্য বড় ঘোরালো হইয়া উঠিল। সকালবেলা মুখ ধুইতে যাইব, দেখি, মাজনের টিউবটা নাই। বাস-দেওয়া তখনও তাহার বাড়ি হইতে আসে নাই, অন্যান্য চাকরদের জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলে গঙ্গামুখো হইয়া দুই হাত উঁচাইয়া শপথ করিল, তাহারা গত দুই দিন যাবৎ আমার ঘরের মধ্যে যায় নাই, এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ কিছু জানে না। গঙ্গা লইয়া শপথ না করিলেও অবিশ্বাসের কথা নয় বড় একটা, দাঁতের মাজন লইয়া করিবেই বা কি

উহারা? আনকোরা নূতন টিউব হইলেও না হয় বুঝিতাম, বিক্রয় করিয়া দুটো পয়সা হাতে আসিবে;—প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি খালি তোবড়ানো একটা টিউব। মাথা যেন গুলাইয়া আসিতে লাগিল। এ যে ডাহা আরব্য উপন্যাসের কাণ্ড দেখিতেছি!

কিন্তু তখনও অনেক বাকি।

কয়েকটা প্রয়োজনে অফিস হইতে টাইপ-রাইটারটা কয়েকদিন হইল বাড়িতে আনিয়া রাখিয়াছি। মাজনের শোকটা কিছু শমিত হইলে একটা চিঠি টাইপ করিতে যাইব, চক্ষু একেবারে চড়কগাছ! স্পুলসুদ্ধ সমস্ত ফিতা একেবারে লোপাট! কালই নূতন স্পুল কিনিয়া আনিয়াছি।

কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও একটা উল্লাস অনুভব করিলাম। চকিত বিদ্যুতালোকে হঠাৎ পথ দেখিতে পাইলে দুর্যোগঘন অন্ধকারে যেমন একটা আনন্দ হয়, অনেকটা সেই রকম। ফিতা যাক, কিন্তু চোর ধরা পড়িয়াছে।

বাড়ির মধ্যে গিয়া বলিলাম, রেবিয়া কোথায়?

গলার স্বর এবং মুখের ভাব দেখিয়া একটা গুরুতর কিছুর প্রত্যাশায় ছেলেমেয়েগুলা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন গিয়া রেবিয়াকে ডাকিয়া আনিল। মা প্রভৃতি অন্যান্য দুই এক জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ রেবিয়াকে?

সংক্ষেপে বলিলাম, কিনারা হয়েছে।

রেবিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছুঁড়ীটার বয়স আন্দাজ নয় বৎসর হইবে। রোগা ডিগডিগে; মিশ কালো; ঢেঙা; ছোট খোকাটাকে ধরিবার জন্য মাস দুয়েক হইল রাখা হইয়াছে। পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে, কিন্তু লক্ষ্য করিতেছি, বাঙালী-বাড়ির ভাত পেটে

পড়িয়া মেয়েটা তরতর করিয়া শৌখিন হইয়া উঠিতেছে। তেল, সাবান, ফিতা—সব ওরই কাণ্ড। সাবান আর ফিতার কথাটা আর তুলিলাম না, বলিলাম, কেউ একবার দেখ তো শুঁকে, ও বেটীর মাথায় কিসের গন্ধ।

বড়দের মধ্যে কেহ রাজি হইল না। মা বলিলেন, রক্ষে কর, এইখান থেকেই ট্যাকা যাচ্ছে না, মাথার কাছে নাক নিয়ে গেলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। কেন, কি ব্যাপার?

বলিলাম, ওই তেল চুরি করেছে আমার।

মা বিস্মিত দৃষ্টিতে রেবিয়ার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কি রে রেবিয়া?

রেবিয়া আকাশ হইতে পড়িল একেবারে। এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে মার অভিজ্ঞতা খুব নিবিড়। বলিলেন, তা হ'লে তুই নিশ্চয়ই নিয়েছিস; তোদের পদ্ধতিই হচ্ছে, যে যত চোর সে তত বোকা সাজবে।

আমায় প্রশ্ন করিলেন, আরও কিছু গেছে চুরি?

অগোছালো অসাবধান বলিয়া একটা বদনাম আছেই, সম্প্রতি বাড়িয়াছেও; চোরাই মাল বাহির হইবে কি না ঠিক নাই, মিছামিছি বাড়াই কেন বদনামটা? বলিলাম, রামঃ, করলেই হ'ল চুরি? সে কি রকম ফাঁকতালে খানিকটা তেল সরিয়ে ফেলেছিল। না, তাই বলতে এসেছিলাম; ও হারামজাদী ভাববে, দিব্যি চোখে ধুলো দিয়ে দিয়ে সরিয়ে ফেললাম, বাবুরা জানতেও পারলে না। খবরদার, খোকাকে নিয়ে যাবার ছুতো ক'রে যদি কখন আবার ঢুকেছিস আমার ঘরে—

মেয়েটা ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া ছিল, হঠাৎ ময়লা আঁচলটা

তুলিয়া লইয়া ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মাকে বলিলাম, দেখলে তো? সমস্ত ঢঙটি শিখেছে। পাকা হয়ে উঠেছে হারামজাদী। তোমরা বাড়ির মধ্যে সবাই যে রকম অসাবধান, আমি না ব'লে দিলে টেরই পেতে না, বাড়ির মধ্যে একটা চোর গজিয়ে উঠছে। সরাও বেটীকে।

* * *

সরাইতে হইল না। তাহার পরের দিন টের পাওয়া গেল, রাত থাকিতেই উঠিয়া নিজের কাপড়-চোপড় লইয়া রেবিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। বাড়িতে খুব একচোট খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল। নিত্যব্যবহার্য থালা-ঘটি জামা-কাপড় সব জড়ো করিয়া মিলাইয়া লওয়া হইল। সব মিলিয়া গেল। মা বলিলেন, বোধ হয় ছিল না চোর মেয়েটা রে, মিছিমিছি গঞ্জনা খেয়ে গেল।

হাসিয়া বলিলাম, ব'য়ে গেছে ওর থালা-ঘটির বোঝা বইতে। মেয়েদের তেল, সাবান, মাথার ফিতে, আলতা, চিরুনি সব ঠিক আছে কি না দেখতে বল তো।

সবাই খোঁজ করিয়া আসিয়া বলিল, সব ঠিকই আছে।

একটু অপ্রতিভ হইলাম। সামলাইয়া লইয়া মার দিকে চাহিয়া আবার হাসিয়া বলিলাম, তা তো থাকবেই; চুরি গেলে তোমরা সত্যি কথা বলবার পাত্র কিনা!

৪

যাহা হউক, কিছু যে লইয়া যায় নাই—এ সামান্য কথাটা কেহ মনে করিয়া রাখিল না। চোর যে আমার চোখে ধূলা দিতে পারে নাই,

ধরা পড়িয়াছিল এবং বেগতিক দেখিয়া পিটটান দিয়াছে—এই কথাটাই টিকিয়া গেল। বরাতে একটু গোয়েন্দাগিরির যশ লেখা ছিল আর কি।

দিন দশেক পরের কথা। কয়দিন হইতে মনটা বেশ প্রসন্ন আছে। না থাকাই আশ্চর্য। মাথায় খাঁটি তেল মাখিতেছি, যতটা সাবানের দাম দিয়াছি, নিজের গায়েই উঠিতেছে। সুগন্ধি কলিনস টুথ-পেস্টও অন্য কাহারও দন্তপংক্তিতে হাস্য ফুটাইতেছে না। আরও একটা কারণ এই যে, বাসদেওয়ার উপর হইতে নিজের এবং অন্য সকলের সন্দেহ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। ছোঁড়াটা সম্বন্ধে আমার একটা দুর্বলতা আছে, একটা নিরীহ মানুষের অপবাদ হইতেছিল বলিয়া আমি মনে মনে একটু ক্লিষ্ট ছিলাম। এক সময় যে বকিয়াছিলাম, অযথাই তাহার গ্লানিটা মিটাইয়া দিবার জন্য আজকাল একটু মাঝে মাঝে কারণে অকারণে ডাকিয়া দুটা কথা কই। চোখে জল গড়াইতে থাকে, কষ্ট হয় দেখিলে।

তাহার পর আবার একদিন স্নানের জন্য তেল লইতে যাইব, তেল নাই। এবারে আবার শিশি পর্যন্ত নাই। কাগজের ঠোঙাটা খালি পড়িয়া আছে। সাবানের ডিবাটাও শূন্যগর্ভ। চিরুনি নাই। বাসদেওয়াকে ডাক দিলাম। বারান্দায় বসিয়া ছিল, আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে উঠিয়া আসিল। অত্যন্ত রাগ হইল, ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আপাদমস্তক চাবকাইয়া দিই। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলাম, আবার আমার তেল সাবান চুরি গেছে, চিরুনি পর্যন্ত। তোর কাজ। আর তো রেবিয়া নেই যে, তার ঘাড়ে দোষ চাপানো চলবে।

চোখে জল জমিয়াই ছিল, একটা হাই তুলিতে গিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। গলায় আরও একটু ধমকের রুক্ষতা ফুটাইয়া বলিলাম, চুপ ক'রে রইলি যে? উত্তর দে।

উত্তর কিছুই দিল না, বেত্রাহত অবোধ পশুর মত দীন নয়নে মুখের পানে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। অতখানি উপচাইয়া পড়িবার পরও জল ছলছল করিতেছে চোখে। নূতন ক্ষতির জ্বালা সত্ত্বেও মনটা কেমন যেন মোচড় দিয়া উঠে, সন্দেহ হয়, খোকা যা বলে সত্যই কি তাই? এতখানি জল একটা শিরার উপর চাপের পরিণাম মাত্র? না, নিরীহের একমাত্র সম্বল ব্যথার অশ্রু?

কিছু বলি না, ভাবি, দেখাই যাক না, আরও দুই একটা দিন।

অত অপেক্ষা করিতে হয় না। দর্জি আসিয়া উপস্থিত হয়। ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম; দুয়ারের জন্য পর্দা কিনিয়া আনিয়াছি, সেলাই করিয়া তাহাতে রিং ফিট করিয়া দিতে হইবে। রুলির আকারে পাঁচটা গিল্টি-করা পিতলের রিং কিনিয়া আনিয়াছি।

কাপড় মাপিয়া বুঝাইয়া দিলাম; রিং দিতে যাইব, রিং নাই।

বাসদেওয়াকে ডাকিলাম না; কি রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িয়াছি, না ডাকা পর্যন্ত রাগ থাকিবে, সামনে আসিলেই মমতা আসিবে। আরও দুই চারি দিন পর্যবেক্ষণ করিয়া সন্দেহটা—

একটু যেন এখানে ওখানে খুঁজিবার চেষ্টা করিয়া, সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া দর্জিটাকে বলিলাম, ও, আনাই হয় নি যে কিনে রিংগুলো। এতক্ষণে মনে পড়েছে। তুই এখন যা, বিকেলে একবার আসিস।

আহার করিবার সময় মা বলিলেন, তুই যেন খুব কি একটা ভাবছিস, ব্যাপার কি বল তো?

ভাবিতেছিলাম, শৌখিন দাঁতের মাজনও লয়, টাইপ-রাইটারের

ফিতাও লয়, আবার পর্দার রিংও লয়, এমন অভিনব চোরের উদ্ভব হইল কোথা হইতে?

কিন্তু গোয়েন্দাগিরির জন্য একবার যশ লইয়াছি, এই নূতনতর অভিজ্ঞতার কথা আর মুখ ফুটিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

অফিসের প্যান্ট-শার্ট পরিয়া টাই পরিতে গিয়া দেখি বিলাতী সোনার টাই-পিনটা নাই।

রাগের চোটে বোধ হয় পূর্ব সংকল্প ভুলিয়া বাসদেওয়াকে ডাক দিয়া ফেলিতাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া গেলাম।

সেখানে গিয়া একটু পরে মাথাটা ঠাণ্ডা হইলে ভাবিয়া দেখিলাম, কি অন্যায় কাজটাই না করিতে যাইতেছিলাম। মেজাজের যে রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, যদি সামনে আসিয়া দাঁড়াইত বাসদেওয়া, তো ওকে আর আস্ত রাখিতাম না। অথচ নেহাৎ সর্বদা সামনে থাকার দরুন সবচেয়ে বেশি সন্দেহভাজন হইয়া পড়িলেও ওর আসল দোষটা কি? এসব শৌখিন জিনিস লইয়া ও করিবে কি? বিক্রয় করিয়া পয়সা করিবে? তাহা হইলে রিস্টওয়াচ, কলম—এইগুলার তো আগে যাইবার কথা।

সুস্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিতে গিয়া আরও একটা কথা মনে পড়িল, খুব সঙ্গত একটা কথা। হাতের কাছে পাইয়া এই ছোঁড়াটার উপরই সব সন্দেহ ক্রমে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই বোধ হয় আসল অপরাধী চোখে ধুলা দেওয়ার আরও সুযোগ পাইতেছে। যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই কথাটার যৌক্তিকতা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম। কয়েক রকম কেশ-তৈল, দুই তিন বাক্স সাবান, আরও কয়েকটা শৌখিন দ্রব্য কিনিয়া

কোনটা টেবিলে, কোনটা আলমারির মাথায়, কোনটা কুলুঙ্গিতে, কোনটা বা ঘড়ির ব্র্যাকেটে রাখিয়া দিলাম একটু হেলাফেলা করিয়া—চার ছড়াইয়া রাখার মত আর কি।

কর্মস্থানে যাইবার সময় ঘরে আর চাবি দিয়া গেলাম না, বাসদেওয়াকে বলিলাম, একটু একটু নজর রাখিস, তবে ঠিক পাহারা-দেওয়া-গোছের নয়। গোয়েন্দাগিরিতে তাহাকেও দলে টানিলাম আর কি।

তাহার পর বাহ্যিক উদাসীনতার সঙ্গে ভিতরে ভিতরে ইস্তক বুড়ী দাসীটার গতিবিধির উপর পর্যন্ত সতর্ক নজর রাখিতে লাগিলাম। বাসদেওয়াকে বলিলাম, যে কেউ এসে ঘোরাফেরা করুক না কেন, একটু আড়ালে স'রে গিয়ে নজর রাখবি।

ফল পাওয়া গেল নিতান্ত অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে।

একদিন সকাল সকাল কর্মস্থান হইতে ফিরিতেছি, দেখি, ঝি মাগী আমার ঘরের বারান্দা হইতে নামিয়া হনহন করিয়া অন্দর-বাড়ির দিকে যাইতেছে। ঘরে তালা দিয়া তো যাইই নাই, আজ হঠাৎ অতর্কিতে আসিয়া পড়িব ঠিক ছিল বলিয়া শিকলও দিয়া যাই নাই, হাট আদুড় হইয়া আছে। অন্যান্য দিন বাসদেওয়া বারান্দার থামে ঠেস দিয়া ঢোলে, আজ সেও নাই।

অত্যন্ত কৌতূহল হইল। ঝিয়ের মুখটা পাশ হইতে যতটুকু লক্ষ্য করিতে পারিলাম, খুব প্রসন্ন যেন।

নিষুতি দুপুরবেলা, বাসদেওয়া পর্যন্ত নাই, ঝি আমার ঘরের দিক হইতে প্রসন্ন মনে তাড়াতাড়ি অন্দর-বাড়ির দিকে চলিয়াছে—ব্যাপারখানা কি? ঘরের দিকে না গিয়া বেশ দূর হইতে অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম। পায়ে ক্রেপ-সোলের জুতাই ব্যবহার

করিতেছি কয়দিন থেকে—এই কাজের জন্যই; অসুবিধা হইল না। ঝি স্ফূর্তির চোটে এত নিশ্চিন্ত যে, একবার ঘুরিয়াও দেখিল না। অবশ্য আমি বেশ দূরেই ছিলাম।

বাড়ির ভিতরে যাইতে হইলে দুই দিকে দুইটা ঘর পড়ে, তাহার মাঝখান দিয়া একটা গলি-গোছের, সেইটাই একটু বাঁকিয়া উঠানে গিয়া পড়িয়াছে। গলির মধ্যে পা দিতেই একটা উগ্র গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিল যেন, নাকটা সতর্কই ছিল, দুই বার নিশ্বাস টানিতেই বুঝিলাম, আমার দাঁতের মাজন—কলিনস টুথ-পেস্টের ঝাঁঝালো গন্ধ।

কি রকম একটা অদ্ভুত উল্লাস,—ধরিয়াছি! কেন জানি না, আপনিই পা দুইটা যেন একটু দাঁড়াইয়া পড়িল—বোধ হয় 'অটোমেটিক অ্যাক্শন' অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত স্নায়বিক ক্রিয়া, যাহার বশে শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপাইবার পূর্বে বাঘ হঠাৎ নিজেকে একটু গুটাইয়া লয়। মুহূর্তমাত্র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরে পা চালাইয়া দিলাম।

তারপর গলির মোড়টা ঘুরিয়া উঠানে পড়িয়া একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

দেখি, মেয়েছেলেরা যে যেদিকে সুবিধা পাইতেছে, ত্বরিত পদে সরিয়া পড়িতেছে। ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজ করিলাম;—আমি মনে করিয়াছি, আমার অনুগমনটা ঝি টের পায় নাই, মেয়েছেলেদের যে পিছনেও দুইটা করিয়া চক্ষু থাকে, সেটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। টের পাইয়াছিল ঝি, আর আমি প্রবেশ করিবার পূর্বেই সকলকে চাপা গলায় বা ইশারায় জানাইয়া দিয়াছে। একটা কি জটলা হইতেছিল, হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে আবার যে সব গুলাইয়া যায়; ঝি আমার ঘর হইতে একটা কিছু চুরি করিয়া আনিতেছে—এ অনুমানটা মিথ্যা তাহা হইলে! অথচ গন্ধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আরও, শুধু

কলিনস দাঁতের মাজনের নয়, একবার কলিনসের, একবার আমার ফুলেল তেলের, একবার যেন আমার ব্যবহারের সাবানের, এক এক বার সব মিশিয়া যাইতেছে—আমার ঘরে মাঝে মাঝে যেমন একটা মিশ্র গন্ধ উঠে।

কিন্তু লোক কোথায়? ঝি তো আমি প্রবেশ করিবার পূর্বেই বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে। খুব বেশি রকম অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত রাগ হইল, খুব কড়া গলায় ডাক দিলাম, বন্‌সীকে মায়!

আমার সামনেই, বারান্দার কোণের জোড়া থামটার ওদিকে ঠুং করিয়া একটু শব্দ হইল। অগ্রসর হইতেই একেবারে থ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

একটি প্রায় বছর এগারোর মেয়ে ভয়ে জড়সড় হইয়া প্রায় থামের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। ফুটফুটে মেয়েটি। মাথার ব্রহ্মতলে কলসীর কানার মত এদেশী খোঁপা, কপালের চুলগুলা কি একটা চটচটে মসলা মাখাইয়া উপর দিকে টানা, মাঝখানে একগাদা মেটে সিঁদুর, কপালের মাঝখানে খুব বড় একটি টিকুলি, চোখে কাজল—কনে-বউ।

কনে-বউয়ের খোঁপায় আমার টাইপ-রাইটারের ফিতে, খোঁপার সামনে ঠিক মাঝখানটায় আমার চোদ্দ ক্যারেট সোনার টাই-পিনটা ঝিকঝিক করিতেছে, গালার চুড়ির সঙ্গে এ হাতে দুইটি ও হাতে দুইটি গিল্টি-করা পিতলের বালা—আমার পর্দার রিং, কোন ভুল নাই তাহাতে। সামনে আসিতে জবজবে করিয়া চোবানো মাথা হইতে আমার ফুলেল তেলের গন্ধ ভুরভুর করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, আমার সাবানের গন্ধও পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট। আর দাঁতের মাজনের মিঠে গন্ধ, সেটা এত স্পষ্ট হয় কি করিয়া? কোন্ সেই সকালে দাঁত মাজিয়াছে!

নাকের খাঁজের কাছে একটা সাদা দাগ দেখিয়া ব্যাপারটার কিনারা হইল; আমার দাঁতের মাজনটার পদোন্নতি হইয়াছে, সেটা হইয়াছে

ফেস-ক্রীম। সমস্ত মুখটা এই নবপ্রবর্তিত বদন-প্রসাধনে চর্চিত হইয়া যেন জলজল করিতেছে।

আমার ভগ্নী প্রথমে সাহস করিয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল, বলিল, তোমার বাসদেওয়ার বউ, মেজদা। কি চমৎকারটি! নতুন বাপের বাড়ি থেকে এসেছে, বাসদেওয়া 'গওনা' ক'রে নিয়ে এসেছে।

সমস্ত শরীর পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইতেছিল। নিজেকে খুব সংযত করিয়া নীরবে দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

অন্যান্য সকলেও ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বোন বলিল, বাঁদরের গলায় মোতির মালা হয়েছে! পোড়াকপালীকে ঐ বুনোর পাশে কেমন মানায় দেখবার জন্যে ঝিকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম ছোঁড়াকে, তা কোনমতেই এল না, কোথায় যে গিয়ে লুকিয়েছে!

বড় বোন বলিল, তা হোক বুনো, কিন্তু যত্ন-আত্তি আছে বাপু, সুখে রাখবে। এর মধ্যেই মাথার জন্যে শৌখিন ফিতে কিনে দিয়েছে, নীচের হাতে গিলটির বালা দিয়েছে, ব্যাভার জানুক না জানুক চমৎকার একটি সেফটি-পিন দিয়েছে—একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়েই তো?

নিষ্ফল আক্রোশে প্রায় চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে আমার।

ছোট বোন বলিতেছে, সে যশটুকু দিতে হয় বইকি। মাথার জন্যে তেলও কিনে দিয়েছে। তোমার তেলের মত কতকটা গন্ধ নয় মেজদা?

বলিলাম, মিছে বকিস নি; আমার তেল ও কোথায় পাবে?

এই বাসদেওয়ার হইয়াই বাড়ির সকলের সঙ্গে সেদিন পর্যন্ত বচসা হইয়া গিয়াছে। গোয়েন্দাগিরির যশ লইয়া নিরীহ রেবিয়াকে তাড়াইয়াছি, তাহার অভিশাপটা মাথার উপর। অন্তরে অন্তরে যতই দগ্ধ হই না কেন, শুধু ঐ তেল নয়, ও ফিতাও যে আমার টাইপ-রাইটারের, ও বালাও যে আমার পর্দার, ও সেফটি-পিনও যে আমারই কণ্ঠভূষণ—এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার কি আর পথ রাখিয়াছি?

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রাতর্ভ্রমণ

১

প্রেম দুই প্রকার—আবশ্যিক এবং ঐচ্ছিক। এই দুই প্রকার প্রেমের বিরোধ এক দিকে যেমন সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির মূল, তেমনই যুগযুগান্ত ধরিয়া এই বিরোধই সর্বপ্রকার সাহিত্য, আর্ট, এমন কি ধর্মবুদ্ধির মূলেও প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে।

মানুষ সাধারণত কর্মক্ষেত্রে আবশ্যিক এবং ধর্মক্ষেত্রে ঐচ্ছিক প্রেমের পক্ষপাতী। বর্তমান যুগে সামাজিক ক্ষেত্রেও ঐচ্ছিকতার প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে। বিবাহের পূর্ববর্তী প্রেম ঐচ্ছিক এবং পরবর্তী প্রেম আবশ্যিক। ইহাই ঐচ্ছিকপন্থী এবং আবশ্যিকপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মূল কারণ, অথচ বিবাহের পর ঐচ্ছিক এবং আবশ্যিক প্রেমের প্রভেদ যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই সামান্য সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিলেই এই বিরোধের কারণ অন্তর্হিত হইতে পারে।

যাহা হউক, লেক রোডের মিঃ বাসু ঐচ্ছিকপন্থী। সম্প্রতি বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া ঐচ্ছিক মতে বিবাহ করিয়াছেন এবং লেক রোডে বাসা করিয়াছেন। পিতা ধর্মচর্চা এবং শেয়ার-চর্চা করিয়া দিনাতিপাত করেন। মাতাঠাকুরাণী দান করেন, পূজা করেন, গৃহস্থালী দেখেন এবং কনে-বউয়ের মত সাজিয়া-গুজিয়া সিনেমায় যান।

নিকটেই লেক। লোকমুখে শুনা যায়, একবার লেক ঘুরিয়া আসিলেই মনে স্ফূর্তি হয়, শরীরে বল হয়, রক্ত-চলাচল ভাল হয়, লিভার-ফাংশন উন্নত হয়, ঘর্মনিঃসরণহেতু রোমকূপগুলি পরিষ্কৃত হয়, পেশীগুলি সবল হয়, ইউরিক অ্যাসিড বিনষ্ট হয়, মেদ ও চর্বি দমিয়া যায়, দৈর্ঘ্য

বাড়িয়া যায়, অগ্নিমান্দ্য তিরোহিত হয়, রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়, পাকা চুল কাঁচা হয়, টাকে কেশোদ্গম হয়, লোলচর্ম কোমল হয়, দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়, কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হয় এবং দেহের কান্তি ও লাবণ্য শতগুণ বর্ধিত হয়।

সুতরাং মিঃ বাসু সস্ত্রীক লেকভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন।

একদিনের কথা। বাসুদম্পতী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বাসু সাহেবের পরনে হাফ-শার্ট, হাফ-প্যান্ট, হাত-ঘড়ি, মোটা মোজা, ক্যান্‌ভাসের জুতা, আর হাতে একগাছি চেরিকাঠের ছড়ি। মিসেসের পরনে আঁটসাঁট করিয়া জড়ানো হালকা বেগুনী রঙের মাদুরা শাড়ি, ভয়লের ছিটের ব্লাউজ, পায়ে গোড়ালি-খোলা স্ট্র্যাপ-দেওয়া কালো বার্নিশ-করা স্লিপার, কানে ছোট্ট দুইটি দুল, গলায় সরু লকেট-হার, হাতে একখানি রঙিন রুমাল, কপালে একটি ছোট্ট সিন্দূরের টিপ।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া লেক রোড দিয়া আসিয়া ল্যান্সডাউন রোড এক্‌স্টেন্‌শন দিয়া সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হইয়া আসিতেই মিসেস বলিলেন, দেখ, আমার শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই, তোমার সঙ্গে অত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না।

মিঃ বাসু বলিলেন, তবে চল, একটু আস্তে আস্তেই যাওয়া যাক।

আস্তে হাঁটলে তো তোমার হাঁটাই হয় না।

তা হ'লে চল, আজ বরং বাড়ি ফিরে যাই।

না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। তুমি ডান দিক দিয়ে জোরে হেঁটে যাও, আর আমি বাঁ দিক দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটি। আবার এখানে এসে দুজনে একসঙ্গে ফিরলেই হবে। তুমি এসে আমার জন্যে একটু অপেক্ষা ক'র।

বেশ, সেই ভাল।

এই কথার পর মিসেস ক্লক-ওয়াইজ এবং মিস্টার কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ লেক ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন।

২

লেক ক্লাবের বাঁ দিক দিয়া মিসেস আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছেন, ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, উদীয়মান সূর্যের ঈষৎ-রক্তাভ কিরণ মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে আর সেই কিরণে কানের দুল দুইটি ও হাতের হীরার আংটিটি চিকচিক করিতেছে। ক্লাবের সীমানা পার হইতেই সম্মুখে একটি আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়া মিসেস হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি ঐচ্ছিকপন্থী। ভদ্রলোক হাফপ্যাণ্ট-হাফশার্ট-শোলাহ্যাট-সমন্বিত এবং মন্থরগতি, দ্রুতভাষী, মৃদুহাসী ও মুগ্ধদৃষ্টি। ইনিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি?

হ্যাঁ।

নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি তো দেখছি বিবাহিতা। কই, একখানা নিমন্ত্রণ-পত্রও তো পেলাম না!

আপনার এখনকার ঠিকানাটা ঠিক জানা ছিল না।

জানা থাকলে নিমন্ত্রণ করতেন?

নিশ্চয়ই। আপনি বুঝি এখনও বিয়ে করেন নি?

এ যাত্রা ওটা বাকিই থেকে গেল।

কেন বলুন তো?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে জিজ্ঞেস করতে পারছেন?

যাকগে। আপনি বুঝি রোজই বেড়ান?

প্রায়ই। কিন্তু আপনি একা যে?

ক্ষতি কি?

রোজই কি একা আসেন?

না। আজও একা নই। উনি ঐদিক দিয়ে ঘুরে আসছেন।

আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয়ই দোব। চলুন, আমরা এদিক দিয়ে এগিয়ে যাই, পথেই ওঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি দুবার ঘুরেছি, আর পারছি না। চলুন, বরঞ্চ ঐ বেঞ্চিটায় একটু বসি, যতক্ষণ না মিস্টার এসে পৌছোন।

তার চেয়ে বরং আস্তে আস্তে একটু এগোই, কি বলেন?

ও, বুঝেছি। আপনার স্বামী বুঝি—

না না, সেকি! তিনি আবার কি মনে করবেন? চলুন, তবে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া তালগাছের তলায় একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং মিসেস ক্রমাগত, হাঁ, না, হুঁ, উঁহু, বেশ, ও আচ্ছা, সেকি, নিশ্চয়ই, কক্ষনো না, যান, তাই নাকি, ছিঃ আবার, বটে, তাই তো, থাকগে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিয়া যাইতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, বাতাস কমিতে লাগিল, মিসেস ঘামিতে লাগিলেন, মাথার কাপড় কাঁধের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, মিসেস চঞ্চল হইতে আরম্ভ করিলেন, এবং উভয়ে পূর্বদিকে মিঃ বাসুর উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

৩

কাউন্টার-ক্লক-ওয়াইজ্‌গামী মিঃ বাসু ছোট এবং বড় লেকের মাঝের পুল পার হইয়া মাড়োয়ারী ক্লাবের পাশ দিয়া একটু অগ্রসর হইতেই জনৈকা আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলার সম্মুখীন হইলেন। মহিলাটিই প্রথম কথা বলিলেন, এই যে, আপনি!

হ্যাঁ, নমস্কার।

নমস্কার।

আপনি বুঝি এই অঞ্চলেই থাকেন?

হ্যাঁ। আপনি বিলেত থেকে ফিরলেন কবে?

এই তো মাত্র বছরখানেক হবে। আপনি—মানে—কিছু মনে করবেন না—এখনও—

হ্যাঁ, এখনও আমি একাই আছি, আর তাই থাকব।

কেন বলুন তো?

তাও আবার জিজ্ঞেস করছেন, মানে—জিজ্ঞেস করতে পারছেন? যাকগে, আপনি—

আমার কথা আর বলবেন না। জালে জড়িয়ে পড়েছি।

বেশ তো। কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেবেন না?

নিশ্চয়ই। তিনি লেকের ওপাশ দিয়ে এদিকেই আসছেন। চলুন, আমরা এগোই, সামনেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

আমি অনেক হেঁটেছি। আর পারছি না। বরঞ্চ এখানে একটা বেঞ্চিতে বসা যাক। উনি তো একটু পরেই এসে পড়বেন।

না, বরং আমরাও এগোই, মানে—

ও, বুঝেছি। আপনার স্ত্রী বুঝি—

না না, সেকি! তিনি কিছু মনে করবেন না। চলুন, ঐ আমতলার একটা বেঞ্চিতে একটু বসাই যাক।

উভয়ে গিয়া বেঞ্চিতে উপবিষ্ট হইলেন। আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলা অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, আর মিঃ বাসু হাঁ, না, আচ্ছা, বেশ তো, কিন্তু, নিশ্চয়ই, যান, উঁহু, যাকগে, কক্ষনো না, তাই নাকি, ইস, বটে, প্রভৃতি স্বল্পাক্ষর শব্দ দ্বারা উত্তর দিতে লাগিলেন।

সময় কাটিতে লাগিল, বেলা বাড়িতে লাগিল, রৌদ্র উঠিতে লাগিল, মিঃ বাসু ঘামিতে লাগিলেন, বার বার ছড়ি ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং উভয়ে সতৃষ্ণ নয়নে পূর্বদিকে মিসেসের উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ বাসু অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, নাঃ, একবার উঠে দেখা যাক, কেন এত দেরি হচ্ছে।

আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটি বলিলেন, কি লাভ? যদি আমাদের বিপরীত দিক দিয়ে আসেন, যেমন আসবার কথা, তা হ'লে তো এখানে ব'সেই দেখা হবে। আর আমরা যেদিক দিয়ে যাব, তিনিও যদি সেই দিকেই ঘোরেন, তবে তো সারাদিনেও দেখা হবে না। সুতরাং এখানে ব'সে অপেক্ষা করাই ভাল।

সুতরাং তাঁহারা বসিয়াই রহিলেন।

৪

যখন মিঃ বাসু আধ-যুবতী আধ-প্রৌঢ়া মহিলাটির সহিত আমতলায় এবং মিসেস আধ-যুবা আধ-প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সহিত তালতলায় বসিয়া

ঘামিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের লেক রোডের বাড়িতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। ছেলে-বউকে এত বেলাতেও ফিরিতে না দেখিয়া পিতা এবং মাতা উভয়েই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত বিবিধ লৈকিক ঘটনা মনে করিয়া আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঝি বলিল, গত রাত্রে বউদিদির মুখখানা ভার-ভার দেখাচ্ছিল। পুরাতন চাকর বলিল, গত রাত্রে শুইতে যাইবার আগে দাদাবাবুর মুখখানা খুব শুকনো দেখাচ্ছিল। কি সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি—

থানায় খবর গেল। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল। কলিকাতায় যে সব আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হইল। ছেলের শ্বশুর-বাড়ি-সম্পর্কিত যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে খবর পাঠানো হইল।

বেলা দশটার মধ্যে মিঃ বাসুর বাড়ি লোকে ভরিয়া গেল। বিভিন্ন পুরুষ ও নারী বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করিতে লাগিলেন। আধুনিকপন্থী জনৈক কুটুম্ব বলিলেন, যত সব ছেলে-ছোকরার কাণ্ড! বেরিয়েছে কোথায় ট্যাক্সি ক'রে বেড়াতে। খাবার সময় হ'লেই সুড়সুড় ক'রে বাড়ি ঢুকবে। শুধু শুধু এত সব হাঙ্গামা! বাগবাজারের বনেদী-ঘরের জনৈকা মহিলা একসঙ্গে চারটি পান এবং এক আউন্স দোক্তা গালে পুরিয়া দিয়া বলিলেন, যখন বালিগঞ্জে বাড়ি করে, তখনই পই পই ক'রে মানা করেছিলাম, শুনলে তো না!

সাড়ে দশটার সময়ে লেক রোড হইতে অভিযান সুরু হইল। প্রথমে তিনখানা ছয়-সিলিণ্ডার মোটর-গাড়ি; তারপরে একখানা অ্যামবুল্যান্স; তারপরে একখানা ট্যাক্সিতে পুলিসের লোক; তারপরে ডাক্তারের গাড়ি; তারপরে একখানা গাড়িতে একটি লেডি ডাক্তার, দুইটি নার্স ও দুইটি ঝি; তারপর একখানি গাড়িতে একখানি প্রকাণ্ড

জাল এবং তিনটি বলিষ্ঠ জেলে; তারপরে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফার; সর্বশেষে নারীরক্ষা-মণ্ডলীর জনৈক প্রতিনিধি এবং তাঁহার সহকর্মিণী।

সাদার্ন অ্যাভেনিউ পার হইয়া অভিযানটি দ্বিধাবিভক্ত হইল। এক ভাগ ক্লক-ওয়াইজ এবং অপর ভাগ কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজ যাত্রা করিল।

একটু পরেই ক্লক-ওয়াইজগামী একখানি মোটর-গাড়ি হইতে বাগবাজারের বনেদী মহিলাটি বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের শৈলী, কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

ওদিকে কাউণ্টার-ক্লক-ওয়াইজগামী একখানি গাড়ি হইতে মিঃ বাসুর মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, ওই যে আমাদের খোকা! কিন্তু সঙ্গে ওটি কে?

৫

লেক রোডের বাড়িখানিতে আজ সারাদিন সমাগত ও সমাগতা-দিগের হৈ-হৈ রৈ-রৈ চলিতে লাগিল। বন্ধু, বান্ধবী, আত্মীয়, আত্মীয়া, প্রতিবেশী প্রভৃতির আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য, কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, ভর্ৎসনা, উপদেশ প্রভৃতির বন্যায় বাড়িখানি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল, এবং তন্মধ্যে খোকা ও শৈলী গৃহ হইতে গৃহান্তরে ছুটিয়া এবং পলাইয়া কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিল।

রাত্রে মিঃ বাসু বলিলেন, আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি, শুনি? বেলা সাড়ে দশটা পর্যন্ত লেকের ধারে বেঞ্চিতে ব'সে না থেকে বাড়ি চ'লে এলেই তো পারতে! তা হ'লে এই হুলস্থুলটা হ'ত না।

মিসেস বলিলেন, তোমারই বা আক্কেলটা কি? অতক্ষণ পর্যন্ত আমতলায় ব'সে না থেকে একটু দেখলেই পারতে, স্ত্রীটির কি হ'ল! তুমিও তো বেশ নিশ্চিন্তই ছিলে।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ভীষণ চটিলেন, অথচ কেহই কাহাকেও যুক্তি দ্বারা পরাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং চটিয়াই রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, কণ্টকেনৈব কণ্টকম্, মানব-মনের আদিম শত্রুটি দ্বিতীয় শত্রুটিকে পরাভূত করিয়া ফেলিল।

খোকা গম্ভীর ঐচ্ছিক স্বরে বলিলেন, আমার ইচ্ছে, আমরা এক পথেই চলি।

শৈলী একান্ত বিনীত ও অনুগত আবশ্যিক সুরে বলিলেন, আমারও।

"ভাস্কর"

শারদীয়

এসেছে শরৎকাল নীল আকাশের ভাল
রোদ্দুরে ঝলকায় স্বর্ণ,
দিগ্বিজয়ের গান ধ্বনিছে জুড়ি বিমান
বধির হতেছে দুই কর্ণ!
ঝরিছে শেফালীকুল ফুটিতেছে কাশফুল
মন পথে হতে চায় পান্থ,
বোমা আর বন্দুকে জয়যাত্রার সুখে
বাহিরিছে মানুষের প্রাণ তো!
অকালবোধনে পূজা কে করিবে দশভুজা—
ভরে নীলপদ্মের ভাণ্ড,
কেবা রাম, কে রাবণ, বুঝে নে অবোধ মন,
হারাস নে যেন জ্ঞানকাণ্ড।

পরস্ব

বৃদ্ধ নীলকণ্ঠ মুখুজ্জের মেজাজ ভাল ছিল না। থাকার কথাও নয়। আগের দিন সন্ধ্যায় অভ্যাসমত পার্কে পায়চারি করিবার সময় একটা মাতাল হড়হড় করিয়া গায়ে খানিকটা বমি করিয়া দেয়। শুধু তাহাই নয়, লোকটাকে কয়েক ঘা লাঠি বসাইয়া দিবার পর সে বাংলা ও হিন্দী মিশ্রিত অপরূপ ভাষায় যে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহা পুনরুচ্চারণের যোগ্য মোটেই নয়।

তাহার পরে পুরা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। বমনসিক্ত কাপড় ও জামা ধোপা-বাড়ি গিয়াছে, তিনিও স্নান করিয়া খানিকটা শুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মেজাজটা এখনও পর্য্যন্ত স্বাভাবিক টেম্পারেচারে পৌঁছায় নাই।

যে ঠিকা চাকরটা কাজকর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া যায়, সে বেচারা অকারণে খানিকটা গালাগালি খাইয়াছে। রান্না সেই করে। ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য হওয়া এমন কিছু গুরুতর অপরাধ নয়, যে কারণে তাহার পিতৃপুরুষ গঞ্জনা খাইতে পারে। সে মুখে বিশেষ কিছু বলে নাই, কিন্তু মনে মনে ঠিক করিয়াছে, পরদিন হইতে আর আসিবে না।

নীলকণ্ঠবাবুর তিন কুলে কেহ আছে বলিয়া কেহ জানে না। এককালে টাকা পয়সা ছিল, এখন বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই। কিছু গিয়াছে উকিলের পকেটে, কিছু একটি ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় জুয়াচোর মালিকদের পকেটে।

তবু যাহা আছে, তাহা একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। বালিগঞ্জে ছোট খাটো একখানা বাড়ি আছে, একটা কাপড়ের কলের শেয়ার হইতে

ভদ্ররকম একটা মুনাফা বাণ্মাসিক পাওয়া যায়। কাজেই অভাব বলিয়া কিছু নাই।

যাহা আছে, তাহাকে কৃপণতা বলিয়া অভিহিত করিলে দোষ হয় না। বাজে খরচ তিনি করেন না, চাকরবাকরের বাহুল্য অকারণ বাহুল্য বলিয়াই মনে করেন।

অন্য দিন রাত দশটার আগেই তিনি ঘুমাইয়া পড়েন, আজ বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, কালকের মাতাল বেটাকে হাতের কাছে পাইলে আরও কয়েক ঘা বসাইয়া দেওয়া চলিত। মারের চোটে হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে তবে রাগ খানিকটা যায়।

তিনি নিজে জীবনে কখনও মদ স্পর্শ করেন নাই, মাতালকে তিনি বর্ষাকালের বৃহদাকার কোলাব্যাঙের মত ঘৃণা করেন। আর তাঁহারই গায়ে কিনা—

নাঃ! অকারণে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত কাটাইয়া দিলে শরীর-খারাপ হইবে। পঁচাত্তর বছর বয়সের পক্ষে তিনি দিব্য শক্ত আছেন, কিন্তু তাই বলিয়া শরীরের উপর অত্যাচার করা চলে না।

একটু তন্দ্রা আসিতেছে। সহসা অস্পষ্ট আওয়াজ হইল, ধপ। চোখ খুলিলেন না। চোখ খুলিলে তন্দ্রার ঘোরটুকু কাটিয়া যাইবে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে বাকি রাতটা সাধ্যসাধনা করিতে হইবে। কিসের আওয়াজ? বিড়াল? না, বোধ হয় পাশের বাড়িতে। দরকার কি চোখ খোলার?

কিন্তু পরপর খসখস, খচখচ, মড়মড়, এমন কতকগুলি শব্দ হইয়া গেল যে, ইচ্ছা করিলেও চোখ বন্ধ করিয়া রাখা চলে না। নীলকণ্ঠবাবু চোখ খুলিলেন।

ঘরে অস্পষ্ট অন্ধকার। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা গেল, আলনার পাশে একটা ছায়ামূর্ত্তি দাঁড়াইয়া তাঁহার জামার পকেট হাতড়াইতেছে।

বয়স হইলেও নীলকণ্ঠের সামর্থ্য ছিল, উপরন্তু উপস্থিতবুদ্ধি ছিল। তিনি হাঁউমাউ করিয়া লোক জড়ো করিবার চেষ্টাও করিলেন না, চাদর মুড়ি দিয়া (সাধারণত এ অবস্থায় লোকে যাহা করিয়া থাকে) নিরাপদ হওয়ারও প্রয়াস পাইলেন না।

লোকটা ছোটখাটো, বিনা চশমাতেও এটুকু বোঝা যাইতেছে, এবং পিছন ফিরিয়া রহিয়াছে। অতএব—

বিড়ালের মত নিঃশব্দে নীলকণ্ঠ বিছানার পাশ হইতে আবলুস কাঠের লাঠিটা তুলিয়া লইলেন, এবং চোর ফিরিবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড বিক্রমে সেটিকে চোরের উপরে নামাইয়া আনিলেন। চোর একবার গাঁক করিয়া ভূতলশায়ী হইল। নীলকণ্ঠ আলো জ্বালিলেন।

মাথায় মারিবার, অথবা এতটা জোরে আঘাত করার ইচ্ছা বোধ হয় নীলকণ্ঠের ছিল না। লোকটা মরিয়া গেল না তো? নীলকণ্ঠ চশমাটা এপাশ ওপাশ ও বালিশের তলায় খুঁজিলেন, পাইলেন না। অগত্যা অনেকটা আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া ঘরের কোণ হইতে কালো রঙের জলের কুজাটা আনিয়া চোরের মাথায় উপুড় করিয়া দিলেন।

কাজ হইল। একটু পরেই চোর মিটমিট করিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। ব্রহ্মতালুটা নৈনিতাল আলুর মত ফুলিয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ লোক হইলে এই সময় ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিত, আ—মি কো—থায়? কিন্তু চোরেরা ঠিক সাধারণ মানুষ নহে, টিকেট-কলেক্টর এবং ডিক্টেটরদের মতই অসাধারণ, কাজেই উপস্থিত এ ধরনের কোন

প্রশ্ন শোনা গেল না। চুপচাপ নির্জীবের মত পড়িয়া থাকাই বুদ্ধির কাজ ঠিক করিয়া সে একটিও কথা কহিল না।

কথা বলিলেন নীলকণ্ঠ। শ্লেষজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, তারপর? কি মনে ক'রে?

চোরের নৈরাশ্যের অবধি ছিল না। দেখাই যাইতেছে, সে বাড়ি ভুল করিয়াছে। এত করিয়া তিন দিন ধরিয়া যোগাড়যন্ত্র করিয়া এমন ঠিকে ভুল! নাঃ, পাশাপাশি তিন চার খানা বাড়ি এক রকম থাকিলে রাতের অন্ধকারে ভুল না হয় কার? আর শা—র ঠিকেদারগুলাও কি একটু মৌলিকত্ব দেখাইতে পারে না? শা— একেবারে এক রকম প্ল্যানে পাশাপাশি শা— এতগুলা বাড়ি তৈয়ারি করিয়া বসিল!

অথচ চোর বেচারা বহুকষ্টে পাকা খবর সংগ্রহ করিয়াছিল। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেহ থাকিবে না, শুধু গোটা তিনেক মেয়েমানুষ। প্রায় আধ বাণ্ডিল বিড়ি খরচ করিয়া সে চাকরের কাছ হইতে খবর লইয়াছে। আর মজা এই যে, তাহারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। আর সে এক সাতকেলে বুড়ার হাতের লাঠির ঘা খাইয়া ভির্মি খাইয়া পড়িয়া আছে। বরাত-খারাপ ইহাকেই বলে!

নীলকণ্ঠ উত্তর না পাইয়া বলিলেন, কি রে ব্যাটা, বোবা কালা নাকি?

চোর নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল, আজ্ঞে না তো।

বাঃ, এই তো বেশ কথা ফুটেছে দেখছি! তারপরে, এত রাতে কি পথ ভুলে নারকেলগাছে চড়েছ নাকি?

চুরি-ব্যবসায়ে ধরা না পড়া পর্য্যন্ত কি কি করা উচিত, তাহার একটা বিশেষ পাঠ আছে। কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলে যে কি করিতে হয়—

চোর বলিল, আজ্ঞে, সেসব তো জানেনই।

কথাটার মধ্যে বেয়াদবির মাত্রাধিক্য ছিল, কিন্তু নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে

সেটা লক্ষ্য করিলেন না। সহসা সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, বাপু, তোমার গলার স্বর তো আমার চেনা। চশমাটা ছাই গেল কোথায়?

চোর সভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে হাসিল। চশমা বহুক্ষণ পূর্ব্বে তাহার হাফ-শার্টের পকেটে আশ্রয় লইয়াছে। অবশ্য রোল্ডগোল্ড হইতে পারে, কিন্তু সোনা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

এক এক জন লোকের গলার স্বর মনে করিয়া রাখার ক্ষমতা অসাধারণ। হঠাৎ নীলকণ্ঠ বলিলেন, ওরে বেটা, তুই তো সেই মাতাল হারামজাদা, কাল আমার গায়ে বমি ক'রে দিয়েছিলি। দাঁড়া, তোকে আমি খুন করব।

চোর সবেগে এবং সবিনয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল, দোহাই আপনার হুজুর, বিশ্বেস করুন, জীবনে এক ফোঁটা মদ কোন দিন ছুঁই নি। আপনি লোক ভুল করেছেন হুজুর।

হুজুর কিন্তু সে কথা মোটেই বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, ওঃ, প্যারীচরণ সরকার আর কি! আচ্ছা, আমার কাছে মাতলামোর ভাল ওষুধ আছে।

চোর গলার স্বর করুণতর করিয়া বলিল, না হুজুর, নেহাৎ পরিবার ছেলেপুলে না খেয়ে মরছে ব'লেই না এ পথে এসেছি। তা ব'লে মদ! ঘৃণায়, লজ্জায়, চোরের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া আসিল।

নীলকণ্ঠ ইতিপূর্ব্বে কোন দিন চোর ধরেন নাই। কাজেই এই মিথ্যাবাদী মাতাল চোরটাকে লইয়া কি করিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। লোকটা এদিকে আবার বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। যাক, ভারী লাঠিটা হাতের কাছেই আছে, প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করা চলিবে। তিনি শুনিয়াছিলেন, চোরকে খুন করিলে ফাঁসি হয় না।

বলিলেন, তোমার বয়েস কত ?

চোর একটু ভাবিয়া উত্তর দিল, আজ্ঞে, চল্লিশ পঞ্চাশ হবে। আমার বড় ছেলেটাই তো—

নীলকণ্ঠ একটা কথাও বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু উপস্থিত চশমাটা হাতের কাছে না থাকায় ভাল করিয়া দেখার উপায় ছিল না। সে যাহাই হোক, লোকটার বয়স যে ত্রিশের বেশি উপরে নয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বলিলেন, জেল খেটেছ ?

চোর আহত কণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে ? যেন বাচস্পতি পণ্ডিতকে প্রশ্ন করা হইতেছে, তিনি আহেদ মিঞার মুর্গি চুরি করিয়া খাইয়াছেন কি না।

নীলকণ্ঠ চটিয়া বলিলেন, বাছা রে আমার ! কিস্সু জান না ! হারামজাদা ! ফাটক বোঝো ? শ্বশুর-বাড়ি ?

চোর চুপ করিয়া রহিল। নীলকণ্ঠ মৌন সম্মতি স্বীকৃতির লক্ষণ বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কবার ?

চোর ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা প্রায় বার দুত্তিন। আমার কোন দোষ ছিল না হুজুর, কুসঙ্গে মিশে—

নীলকণ্ঠ বাধা দিয়া বলিলেন, চোপরও। ঠিক ক'রে বল, কবার। পাঁচ বার ? ছ বার ?

চোর অনিচ্ছার সহিত বলিল, আজ্ঞে, ঐ রকমই হবে। কি করব হুজুর, পরিবার—

নীলকণ্ঠ এইবার ইংরেজীতে বলিলেন, shurrup ! চোর চুপ করিল।

নীলকণ্ঠ হিসাব করিয়া বলিলেন, যখন তোমার হিসেবে পাঁচ ছ বার, তখন আসলে অন্তত দশ বার। এইবার নিয়ে এগারো বার হবে।

চোর এইবার একেবারে আঁতকাইয়া উঠিল। বলিল, সর্ব্বনাশ, সে কি হুজুর ?

নীলকণ্ঠ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর ! তবে তুমি কি ভেবেছিলে, তোমায় পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজো ক'রে ফলার খেতে দোব ?

চোর সম্ভবত অদৃষ্টবাদী। সে কথা কহিল না।

নীলকণ্ঠ বলিলেন, তোর নাম কি ?

আজ্ঞে, ভজহরি।

আর কটা নাম আছে ?

চোর অবাক হইয়া বলিল, আজ্ঞে, সে কি হুজুর, নাম আবার কটা থাকবে ? তবে ডাকনাম আছে, খোকা।

নীলকণ্ঠ এইবার অতীব ধীর কণ্ঠে বলিলেন, দেখ বাপু, আমি যা যা জিজ্ঞেস করছি, যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও তো ছেড়ে দিতেও পারি। কিন্তু আগড়ুম-বাগড়ুম করলে ঠিক পুলিসে দোব। নাও, এবার ঠিক ক'রে বল, কটা নাম আছে।

চোর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা গোটাকতক আছে।

কি কি ?

ভজহরি, গোপাল, বানোয়ারী, ইউসুফ, আর—আর—বাকিগুলো মনে পড়ছে না।

যাক, ঐতেই হবে।

অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। দূরের একটা ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। অর্থাৎ সাড়ে বারোটা হইতে পারে, একটা হইতে পারে, দেড়টা হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। নীলকণ্ঠের ঘুম পাইতেছিল। ভাবিতেছিলেন, এইবারে চোরটাকে ছাড়িয়া দিলে কেমন হয়, এমন

সময় চোর বলিল, হুজুর, এবারে যাই? সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠের মত-পরিবর্ত্তন হইল। তিনি লাঠিটা দেখাইয়া চোরকে বলিলেন, খবরদার, ব'সে থাক ওখানে। চোর বসিয়াই রহিল।

কিন্তু চশমাটা না পাওয়া যাওয়ায় বড় অসুবিধা হইতেছে। চোরটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখা গেল না। তবে গলার স্বরটা—! সহসা নীলকণ্ঠ বলিলেন, এই শুয়ার, ওদিকে কি দেখছিস?

একটি টিপয়ের উপরে ভারী রূপার ফ্রেমে বাঁধানো একটি সুশ্রী বালকের ছবি। নিঃসন্দেহ চোরের দৃষ্টি ফ্রেমটার দিকে পড়িয়াছে।

চোর এক মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আজ্ঞে, ছবিটা দেখছিলাম। বেড়ে চেহারা খোকাবাবুর—দিব্যি রাজপুত্তুরের মত।

খোকাবাবুর উল্লেখে নীলকণ্ঠের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। চোরের কথার উত্তরে তাহার পিতৃপুরুষকে আপ্যায়িত না করিয়া শুধু বলিলেন, আমার নাতির ছবি, হিরণ্ময়ের। গলার স্বর ভারী।

চোর একটু কৌতূহলীভাবে বলিল, মারা গেছেন বুঝি?

গাঢ় স্বরে উত্তর আসিল, হ্যাঁ, পনরো বছর আগে। জলে ডুবে।

চোর সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, চ্‌ক্ চ্‌ক্।

বৃদ্ধ কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। দূরের ঘড়িতে আর একবার একটা, অর্থাৎ দেড়টা বাজিল। বাহিরে নিস্তব্ধ অন্ধকার। আলোকোজ্জ্বল ঘরে ততোধিক নিস্তব্ধতা।

অকস্মাৎ নীলকণ্ঠ কথা কহিলেন। হয়তো মনে ছিল না, তাঁহার শ্রোতা একজন চোর। হয়তো শ্রোতা যে আছে, সে কথাও খেয়াল ছিল না।

অনেকটা আত্মগতভাবেই বলিলেন, পনরো বছর আগে হিরণ একটা ভয়ানক অপরাধ ক'রে ফেলে। ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ। শুধু কুসঙ্গের ফলে।

চোরের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, অপরাধটা কি এবং তাহার গুরুত্ব কতখানি এবং তাহাতে মাথায় লাঠির বাড়ি খাওয়া চলে কি না। কিন্তু সাহসের অভাব থাকায় চুপ করিয়া রহিল।

বৃদ্ধ আবার বলিলেন, মা-বাপ-মরা ছেলে, আমিই মানুষ করেছিলাম। হয়তো আমি মাফ করতে পারতাম, সেই সুযোগ দিলে না।

চোর মনে মনে বলিল, সে আবার কোন্ দিশী কথা রে বাবা!

বৃদ্ধ বলিলেন, শুধু একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিল যে, সে আর ফিরবে না। ফিরলও না। সাত আট দিন পরে গঙ্গায় তার দেহ পাওয়া গেল, তার অর্দ্ধেক মাছে খেয়ে ফেলেছে—বীভৎস, চেনা যায় না।

বৃদ্ধ শিহরিয়া চুপ করিলেন।

একটি প্রাচীন হৃদয়ের অস্ফুট বেদনায় বাহিরের অন্ধকার আকুল হইয়া উঠিল।

চোর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আজ্ঞে, তখন তাঁর বয়েস কত?

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, বছর চোদ্দ।

চোর মনে মনে কি যেন খানিকটা হিসাব করিয়া বলিল, আজ্ঞে, একটা কথা বলব?

বৃদ্ধ চমক ভাঙিয়া বলিলেন, কি?

আচ্ছা, লাস তো আপনারা আন্দাজী সনাক্ত করেছিলেন। চেনা তো আর যায় নি। বলছিলাম—

অসহ্য ক্রোধে বৃদ্ধ বলিলেন, কি বলছিলে?

আজ্ঞে, হয়তো আপনারা ভুল লাস দেখেছিলেন। হয়তো তিনি বেঁচেই আছেন—

অদ্ভুত স্বরে নীলকণ্ঠ বলিলেন, কি বললে ?

চোর অবলীলাক্রমে বলিল, ধরুন, আমি যদি বলি, আমিই হিরণ—

বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া বলিলেন, কি বললি, কি বললি ?

চোর সভয়ে বলিল, আজ্ঞে, কিছু না।

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

কেন মিথ্যে কথা বললি, কেন—

আজ্ঞে, ওটা কি রকম অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে।

তোমার অভ্যেস আমি বের করব, শুয়ার, মাতাল, পাজী, মিথ্যেবাদী—

চোর নির্ব্বিকারভাবে শুনিয়া গেল।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। নীলকণ্ঠের চোখের জল তখনও শুকায় নাই, তবে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মুখ-চোখের ভাবও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

চোর উসখুস করিতেছিল। তাহার পুত্র-পরিবারের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও তাহার একটি বান্ধবী ছিল। খেঁদী নামক একটি রমণীকে কথা দিয়া আসিয়াছে, আজ রাতেই তাহাকে একটা কিছু উপহার দিয়া আসিবে। উপহারের জিনিস যোগাড় হইয়াছে, কিন্তু রাতও প্রায় কাবার হইতে চলিল।

নীলকণ্ঠ মুখ তুলিয়া বলিলেন, এবার তুমি যাও। চোর কৃতজ্ঞ চিত্তে আভূমি নত হইয়া নমস্কার করিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নীলকণ্ঠ বাধা দিয়া বলিলেন, এই, ওদিকে না।

চোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

নীলকণ্ঠ অপর দিকের দরজার সহিত সংলগ্ন ছোট্ট বারান্দাটুকু দেখাইয়া কহিলেন, যে পথ দিয়ে এসেছ, সেই পথ দিয়েই নেমে যাও।

চোর সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, এত রাতে, যদি প'ড়ে গিয়ে—

আমি পীরের দরগায় শিন্নি চড়াব।

চোর ঢোক গিলিয়া বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক নয়, মানে—বলছিলাম, এত রাতে ও রকম বেখাপ্পা রাস্তা দিয়ে নামতে দেখলে লালপগ্‌গ বেটারা বড় ছ্যাঁচড়ামো করে, তাই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া কহিলেন, সে আমি জানি না। ওঠার সময় মনে ছিল না ?

অগত্যা চোর নামিয়া গেল। দূরে টহলরত পাহারাওয়ালার দৃষ্টি এড়াইয়া প্রথমে চুলটা একটু ঠিক করিয়া হাফ-শার্টের কলারটা তুলিয়া দিল। তাহার পরে এক পাশে লুকানো জুতাজোড়া বাহির করিয়া পায়ে দিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের মত বিড়ি টানিতে টানিতে রওনা হইল।

খুনে বেটার ঘর হইতে রূপার ফ্রেম সমেত ছবিখানা বেশ সহজেই হাতানো গিয়াছে, খেঁদী খুশি হইবে, যদিও আজ রাত্রে আর সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু যে কথাটা মনে পড়িয়া চোরের, অর্থাৎ ভজহরি, ওরফে গোপাল, ওরফে বানোয়ারী, ওরফে ইউসুফ, ওরফে দাশু, ওরফে হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের হাসি আসিতেছিল, তাহা এই যে, মিথ্যা কথা বলাই যাহার পেশা, তাহাকে দিয়া সত্য কথা বলার শপথ করাইয়া লইয়া, সত্য কথা শুনিয়া নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে অতখানি চটিয়া গেলেন কেন !

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

ধর্ম্মঘট

সময়ে সময়ে মনের কলকব্জা এমন ভাবে বিগড়াইয়া যায় যে, কাজ-কর্ম্মে মন বসে না; অথচ ইহাকে সঠিক বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন কুণ্ঠা বোধ হয়। আহারে তেমন রুচি থাকে না, কিন্তু আহারে বসিলে ভোজ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও পরিণতি দেখিয়া ইহা অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ বলিয়া ভাবিতে নিজেরই কিরূপ সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, গৃহিণীর মতামত না হয় এই ক্ষেত্রে উপেক্ষাই করিলাম। খেলা বা আড্ডাদানে উৎসাহহীন, কিন্তু আরম্ভ করিলে চলিয়াও যায় কোনও প্রকারে। ভৃত্যকে বিনা কারণে, কেবল নিজ ন্যায্য অধিকার বজায় রাখিবার জন্যই, কতবার তিরস্কার করিয়াছি; কিন্তু আজ সমূহ কারণ থাকিলেও সে অভর্ৎসিত অবস্থায় দিব্য দন্তবিকাশ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রতিবেশী রামচরণ মিস্ত্রীর অনেকদিনের পাওনা আজ মিটাইয়া দিলে সে কত ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া গেল, কিন্তু আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরিয়া উঠিল কই? আবার যখন বেচারাম মুদী উহার বকেয়া পাওনার জন্য তাগাদা করিতে আসিয়া অকারণ কতকগুলা মিথ্যা ও রূঢ় বাক্য শুনাইয়া গেল, তখন "নীচ যদি উচ্চ ভাষে", "মেরেছ কলসীর কানা" প্রভৃতি ক্ষমাশীল মহাপুরুষগণের বাণী স্মরণ করিয়া তাচ্ছিল্য-ভাবে ইহা উপেক্ষাই বা করিলাম কিরূপে? এবম্বিধ মানসিক "পরিস্থিতি" নূতন নয়। কিন্তু এবার যেন ব্যবহারিক মাত্রা বহুপূর্ব্বেই ছাড়াইয়া গিয়াছে বোধ হইল। মানসিক বৃত্তির অস্থিরতা ও অনিশ্চিয়তার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এ যেন অপর কাহারও স্বর্ণালঙ্কার স্বীয় কর্ণে পরিয়াছি, কখন হেঁচকা টানে কাড়িয়া লইবে কিছুই স্থিরতা নাই। ইহাদের উপর নির্ভর করিলেও বিপদের অন্ত নাই। অথচ নির্ভর না করিয়াই বা উপায় কি? যাহার উপর লেখায় কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে তীক্ষ্ণধীশক্তিসম্পন্ন বলিয়া ধারণা ছিল, সে হঠাৎ বেকুবের মত কার্য্য করিয়া বসে কেন? আনাড়ীর মত লেখে কেন? ক্যাবলা-কান্তের মত কথা বলে কেন? এইরূপ অবস্থায় পড়িয়াই কি? গণেশ

মল্লিক বিশ বৎসর কাল সওদাগরী অফিসে লেজার-কীপারের কার্য্য করিয়া অকস্মাৎ সাহিত্যচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল কেন এবং 'মেয়ে মর্দ্দানা' নামক প্রাণান্তকর এক পঞ্চমাঙ্ক নাটক লিখিয়া উহার পাণ্ডুলিপির কোনও কোনও তথাকথিত শ্রেষ্ঠ অংশ প্রতিবেশী হিসাবে এক মাসে বিংশতি বার শুনাইয়া আমার মানসিক শান্তির মূলে পুনঃ পুনঃ সজোর কুঠারাঘাত করে কেন এবং কেহ না ছাপাইলে তিনি উহা নিজ ব্যয়েই ছাপাইবেন—এই বলিয়া আমাকে যখন তখন ভয় দেখান কেন? প্রতিবেশী রমেশ কম্পাউণ্ডার মদ গিলিয়া আসিয়া প্রায়ই উহার স্ত্রীকে ঠেঙায় কেন? বেন্দার মাসী উহার মেসোকে যখন তখন অমন করিয়া মুখখিস্তি করে কেন? সেদিন মেসের শ্যামবাবুর সহিত দেখা হইলে মানদা গ্রীবাদেশ হেলাইয়া অমন করিয়া ফিক করিয়া হাসিল কেন? বাড়ি ফিরিতে অধিক রাত্রি হইলে গৃহিণী আমার দিকেই বা অমন করিয়া তাকান কেন? সাহেব আমার সহিত হাসিয়া কথা কহিলে বাল্যবন্ধু ও অধুনা-সহকর্ম্মী ধর্ম্মদাস অমন ভাবে মুষড়াইয়া পড়ে কেন? এবং আমি স্নাবিত হইয়াছি টের পাইলে পরস্পরের মধ্যে দন্তবিকাশ-প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার জন্যই বা এত সচেষ্ট হন কেন? দুঃখীরাম অর্থশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পাস করিয়া এবং বাংলার আর্থিক সমস্যা ও তাহার সমাধান শীর্ষক ধারাবাহিক কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিয়াও নিজ অন্ন-সংস্থানের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না কেন? যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে পায় না কেন? এবং ক্বচিৎ পাইলেও ভালবাসার আর সন্ধান মিলে না কেন? সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্যদেহ-গঠন-প্রণালীতে সেই সনাতন ভাব বজায় রাখিয়াছেন কেন? দেশ কাল পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া নিউ মডেল ও নিউ ডিজাইন প্রবর্ত্তন করিলে মনুষ্যজাতিকে অকারণে যখন তখন হয়রান হইতে হইত না। প্রায় প্রত্যেক ব্যাধিরই 'গভর্মেণ্ট হইতে রেজিষ্ট্রিকৃত', 'পুরস্কার বিঘোষিত', 'আদালতের বিচারে নির্ম্মুক্ত', বহুসংখ্যক অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ থাকিতে দুষ্টবুদ্ধি মানবগণ অকারণ নানাবিধ কষ্ট পায় কেন? খাদ্য হিসাবে কোন্ দ্রব্যের পুষ্টিকারিতা কিরূপ, কোন্‌টি কি পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে সক্ষম, এবং উহাতে কোন্ কোন্

ভিটামিন কি পরিমাণে আছে—এই সকল অমূল্য তথ্য বহু উৎকট পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি যা-তা খাইয়া এতদিন টিকিয়া থাকিল কিরূপে? কি ভাবিয়া তাহারা ঐরূপ মরিয়া হইয়া উঠিল?

এবম্বিধ বহুপ্রকার জটিল প্রশ্ন ও সমস্যা মীমাংসা বা সমাধানের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতগতিতে একে একে মানসপটে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

মনে হইল, যেন মস্তিষ্কের বয়ন-বিভাগের কর্ম্মীগণ কি সব কতকগুলা অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে কিছুদিন ধরিয়া আমার মানসিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, পুনঃ পুনঃ ব্যর্থকাম হইয়া সরাসরি ধর্ম্মঘট করিবার পূর্ব্বে আজ বিশৃঙ্খলভাবে জটলা করিতেছে, আর এদিকে যে কাঁচা মাল স্তূপীকৃত হইতেছে, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই। "পরিস্থিতি"র গুরুত্ব মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিলাম এবং অনন্যোপায় হইয়া সটান চিত হইয়া শুইয়া পড়িলাম। এরূপ অবস্থায় নিরাপদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে প্রাচ্য প্রথায় অবলম্বনীয় অন্য কোনও প্রকৃষ্টতর পন্থাই খুঁজিয়া পাইলাম না।

শুইয়া না হয় পড়িলাম।

কিন্তু আজকাল হইল কি? কথায় কথায় ধর্ম্মঘট বা ধর্ম্মঘট করিবার ভীতি-প্রদর্শন! স্বামীজী বলিয়াছেন, "এটা শূদ্রশক্তির জাগরণের যুগ"। শূদ্র কাহারা? যাহারা দাস, যাহারা চেতনাহীন—অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য খাটিয়া মরে। সে হিসাবে শূদ্র-সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই—তবে? বোধ হয় দাস-সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে, এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের শূদ্রগণ, যাহারা অপরের জন্য খাটিয়াই মরে এবং মরিলেই বাঁচে, ধর্ম্মঘট উহাদেরই কর্ম্মক্লিষ্ট জীবনের একটি বিশেষ বিলাস ও ব্যসন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পচেতনের চেতনার স্ফুরণ সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করে ধর্ম্মঘটের ভিতর দিয়া, এবং ধর্ম্মঘটের গুরুত্বও নির্ভর করে এই লব্ধ চেতনার পরিমাপের উপর। প্রাথমিক শৈত্যানুভূতি ও কম্পনের প্রাথর্য্য হইতেই জ্বরের উগ্রতার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়।

বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, পদার্থ দুই প্রকার—সচেতন ও অচেতন।

কিন্তু বহুবর্ষের অভিজ্ঞতার ফলে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, একেবারে অচেতন বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। সকলেই সচেতন, পার্থক্য কেবল চেতনার তারতম্যে। আজ যাহাকে অচেতন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন, কাল সে হয়তো সুযোগ ও সুবিধা পাইলে উচ্চাঙ্গের চেতনার পরিচয় দিয়া আপনার জীবন বিষময় করিয়া তুলিতে পারে।

দৃষ্টান্ত দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তবে বিবাহকালে শ্বশুর মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত তথাকথিত সচেতন ও অচেতন কয়েকটি পদার্থের ব্যবহার আলোচনা করিলেই আমার বক্তব্য বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমটি গৃহিণীর অসংস্কৃত মূল সংস্করণ—একটি একাদশবর্ষীয়া নিবিড়বস্ত্রমণ্ডিতা বালিকা সচেতন বলিয়াই অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিলাম জড়ধর্ম্মী। প্রথম কয়েকদিন চেতনার কোনও উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য নিদর্শন পাই নাই। এমন কি, ঐ সময় উহার চলৎশক্তি সম্বন্ধেও সন্দিহান হইয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয় কর্ত্তৃক উহার সমভিব্যাহারে প্রেরিত এক পরিচারিকার সাহায্য ব্যতীত সে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতেও যেন অসমর্থ বলিয়া বোধ হইত। তারপর সেই নববধূ ক্রমবিকাশের সাধারণ নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান চেতনা লাভ করিয়া কিছুদিন হইতে গৃহিণীর স্তরে পৌছিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘট করিবেন বলিয়া মুহুর্মুহু শাসাইতেছেন; কখনও বা সত্যসত্যই সাময়িকভাবে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিতেছেন।

গৃহিণীর সমসাময়িক সময়পরিমাপক যন্ত্রটি পরিপূর্ণ চেতনালাভ করিল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে। নিয়মমত 'দম' দিয়া কয়েক বৎসর উহার নিকট আমার প্রাপ্য আদায়ের কোনও বিঘ্ন ঘটে নাই। কিন্তু বিশ্বস্রষ্টা সকল পদার্থের মধ্যেই যে চেতনার বীজ এমন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই যে উহা অঙ্কুরিত হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতে পারে, ইতিপূর্ব্বে কে ধারণা করিতে পারিয়াছিল! বেহাত হইবার আশঙ্কায় এই হেমাঙ্গিনীকে বিশেষ কারণ না ঘটিলে পর্দ্দার বাহির হইতে দিতাম না এবং বাহির করিলেও সর্ব্বদা হৃদয়সান্নিধ্যেই রাখিতাম।

সেদিন অপরাহ্ণে কি দুর্ম্মতি হইল, উহাকে লইয়া আচার্য্য বসু

মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। আচার্য্যদেব বহু গবেষণাদ্বারা বিশ্বব্যাপী এক চেতনার যে আভাস পাইয়াছিলেন, তাহাই আবেগময়ী ভাষায় অভিনব যন্ত্রাদির সাহায্যে বর্ণনা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাই যে আমার পারিবারিক জীবন এমন কণ্টকিত করিয়া তুলিবে, তাহা কে জানিত!

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম, ঘড়িটা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে; দম দিলাম—নড়িল না। বুঝিলাম, দমে ভুলিবার দিন গিয়াছে। সজোরে নাড়িয়া দিলাম, কয়েক সেকেণ্ড গজগজ করিয়া কি সব বলিল, বাস্, তারপর চুপচাপ—"পাদমেকং ন গচ্ছামি"র ভাব। সন্দেহ হইল; কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ হইলাম, যখন পরদিন প্রাতে ক্ষৌরকার্য্য করিতে গিয়া দেখিলাম, ক্ষুরটাও বিগড়াইয়াছে। ক্ষৌরকার্য্যে একেবারে গতস্পৃহ, তবে চামড়া কাটিয়া রক্তারক্তি করিতে উহার উৎসাহ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। স্পষ্টই বুঝিলাম, ঘড়িটা উহার কানে নবলব্ধ চেতনার বীজমন্ত্র দিয়া বিগড়াইয়া দিয়াছে। এমন জানিলে কে উহাদিগকে একত্রে এক ড্রয়ারে রাত্রিযাপন করিতে দিত। উহাকে মৃদুভাবে নানা প্রকারে বুঝাইয়া কর্ত্তব্য-বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করিলাম, শাসন করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা, সে গোঁ ছাড়িল না। ভবীর চেতনার সঞ্চার হইয়াছে, আর সে ভুলিবে না। একটা ব্লেড আনাইয়া কোনওমতে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিলাম।

আকাশ বাতাস সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘটের জীবাণু পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল। দম ভরিয়া নিশ্বাস লইতেও যেন ভয় হইতে লাগিল। কি জানি, কখন হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিবে! ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিগুলার সম্ভাবিত অর্থক্ষতির বিষয় চিন্তা করিয়াও শান্তি পাইলাম না। আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সামান্য তন্দ্রাকর্ষণ বোধ হইতেছিল। শীতকালে দিবানিদ্রার অপকারিতা কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, ট্রামের মান্থলিটা লইয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসি।

কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছিতেই দেখিলাম, অ্যাল্‌বার্ট হলে যেন কি

একটা সমারোহ-ব্যাপার চলিতেছে। তোরণদ্বারের উপরিভাগে একখণ্ড রঙিন বস্ত্রে বড় বড় কার্পাসাক্ষরে লেখা আছে—"নিঃ ভাঃ ক্ষুর সম্মিলনী"। সাবাস সাবাস, নিঃ ভাঃ ক্ষুর সম্মিলনী! কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কি দেখিতে হইবে কে জানে! নিঃ ভাঃ চেয়ার টেবিল, ইট, পাটকেল সম্মিলনী!

দ্বারদেশে একজন স্বেচ্ছাসেবক দেখিলাম হাতেগুলের মধ্যে মাথা রাখিয়া ঝিমাইতেছে, চুপিচুপি উহাকে পাশ কাটাইয়া সভা-গৃহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলাম। সভার কার্য্য তখন অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। মাল্যবিভূষিত সভাপতি মহাশয় তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সবেমাত্র অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিয়াছেন।

সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ!

(মহিলা! মহিলা আবার আসিল কোথা হইতে? আশ্চর্য্য! সত্যই দেখিলাম, একদল তন্বী ক্ষুরললনা নানারূপ বিচিত্র আভরণে সজ্জিত হইয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।)

আমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ শত শত সহকর্ম্মী বর্ত্তমান থাকিতে মৎসদৃশ একজন দীন হীন সমাজসেবককে সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আপনারা যে অসামান্য মহত্ত্ব ও অসীম ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আপনাদের স্নেহের দান আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু এই গুরুভার বহনের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছি। আশা করি, আপনাদের সম্মিলিত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমার এই দায়িত্বপালনে সহায়তা করিবে।

বন্ধুগণ, এতদিন আমরা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। জাতিগত, ধর্ম্মগত ও সমাজগত যে সকল সমস্যা আমাদের রুদ্ধ দ্বারে এতদিন মৃদু করাঘাত করিতেছিল, তাহা আমরা শুনিয়াও শুনি নাই। বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জড়তা ও ভীরুতা আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ সারা পৃথিবীব্যাপী যে নব চেতনার স্পন্দন সকল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, ক্ষুর-সমাজের

প্রাণবাহী শিরা সকল এই তরঙ্গাভিঘাত হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। স্বার্থের সংঘাত যেন ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়া আমাদের ক্ষৌর-জীবন বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

কোন্ সুদূর অতীতের কোন্ পুণ্য-প্রভাতে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাস আমাদেরই জাতীয় কর্ম্ম-কুশলতার গৌরবোজ্জ্বল কীর্ত্তি-কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতার ইতিহাসে আমাদের অবদান সামান্য নহে। মানুষ ক্ষুর গড়িয়াছে, না ক্ষুর মানুষ করিয়াছে—এই পুরাতন বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখি না; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মানবজাতি আমাদের সম্পর্কে যাহা কিছু করিয়াছে, তৎসমস্তই করিয়াছে নিজ প্রয়োজনের তাগিদে, স্বার্থের প্ররোচনায়—আমাদের মুখ চাহিয়া নয়।

সভ্যগণের মধ্য হইতে "হিয়ার হিয়ার", "শেম শেম" ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

বন্ধুগণ! যুগ যুগ ধরিয়া মানবজাতির জন্য জীবনপাত করিয়া আমরা কি লাভ করিয়াছি? আমাদের জাতীয় জীবনের কি উন্নতি হইয়াছে?

একজন ইঁচড়পক্ক তরুণ সভ্য মুখভঙ্গি সহকারে বলিয়া উঠিল, কসস্থ—কস্থ হইয়াছে।

কয়েকজন সভ্য "অর্ডার অর্ডার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

মানবজাতির কল্যাণে আমরা নাকি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সভ্য হইয়াছি। তর্কের খাতিরে না হয় ইহা স্বীকার করিয়াই লইলাম, না হয় মানিয়াই লইলাম যে, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কতকাংশে বাড়িয়াছে। কিন্তু বন্ধুগণ, কেবল জমার অঙ্ক দেখিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইলে চলিবে না। আমাদের দেখিতে হইবে, এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও তথাকথিত সভ্যতার বিনিময়ে আমরা কি হারাইয়াছি!

আমাদের জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। আমরা অন্তঃসারশূন্য ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের জাতীয় সত্তার অভ্যন্তরে ঘুণ

ধরিয়াছে। "হলো গ্রাউণ্ড" এই আখ্যায়ই আমাদের অগ্রগতির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। Men cannot live by bread alone—অতি উত্তম কথা। কিন্তু তাহা হইলে আমরা কেবল দিনের পর দিন কেশভূমি মসৃণ করিয়াই কি করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি? ইহা অপেক্ষা উন্নততর জীবনযাত্রাপ্রণালী ঠিক আমাদের কাম্য নয়? আমাদের মস্তিষ্কের খোরাক কই? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সুযোগ কই?

উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পাইলে যে আমরা চারুকলা ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি, ইহা বহুক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে। "সেকশন কাটিং" কার্য্যে আমাদের দক্ষতা বিশ্ববিশ্রুত। কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা সম্পর্কিত ব্যাপারে যে সামান্য কয়েকজন স্বজাতীয় তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের সুযোগ পাইয়াছেন, আমাদের বিপুল জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁহারা নগণ্য বলিলেও চলে। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আমাদের এই ক্ষুরধার প্রতিভা কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মানবগণ কর্ত্তৃক পকেট-কর্ত্তন প্রভৃতি হীন কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে। এই বিষয়ে আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে এবং নব নব কর্ম্মক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া আমাদের কর্ম্মশক্তি সেই পথে চালিত করিতে হইবে।

বন্ধুগণ, আর একটি গুরুতর বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। সম্প্রতি এক নূতন বিপদ আসিয়া আমাদের জাতীয় সত্তার মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করিতেছে। দলে দলে বিদেশী ব্লেড আসিয়া দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে এবং আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। আমাদের সমাজে বেকার-সমস্যা সম্প্রতি অতিশয় প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। ইহারও আশু প্রতিকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

কিন্তু সমস্যা যতই গুরুতর হউক না কেন এবং "পরিস্থিতি" বর্ত্তমানে যতই হতাশাব্যঞ্জক হউক না কেন, আমাদের গৌরবময় অতীতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে দৃঢ় পদে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্। ক্রমশ সকল বাধাই

অপসৃত হইবে—কেবল চাই অদম্য উৎসাহ, চাই অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়, চাই সম্মিলিত চেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি চাই আমাদের আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত সকলপ্রকার দ্বন্দ্ব ও কলহের অবসান। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিবামাত্র পশ্চিমদেশীয় কঞ্চির বাঁটের ক্ষুরশ্রেণী হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিল—

সভাপতি মহাশয় সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য সকল সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতেছেন। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্মিলিত কার্য্য তখনই সম্ভব, যখন বিভিন্ন দল ও উপদলের মধ্যে স্বার্থের একটা মোটামুটি ঐক্য থাকে। আমি অনুন্নত ক্ষুর-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণের সহিত আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও মিল নাই। বন্ধুগণ, গয়া প্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দুতীর্থক্ষেত্রসমূহে আমাদের উপর যে অবিচার ও অক্ষৌরিক অত্যাচার আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহার প্রতিকার-কল্পে বর্ণক্ষুরগণ কোনও দিন কোনও চেষ্টা করিয়াছেন কি? কাজ করিতে আমরা ভয় পাই না, লজ্জাও বোধ করি না এবং বর্ণক্ষুর-গণের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুরও নহি; কিন্তু ক্ষুরের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অধিকার আমাদের আছে এবং ক্ষৌরজীবনের সেই অপরিহার্য্য ন্যূনতম ন্যায্য অধিকারই আমরা দাবি করিতেছি। বর্ণক্ষুরগণ, যাঁহারা পৃথক সুরম্য ভবনে বাস করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের লঘু কার্য্য অধিকতর লঘু ও মোলায়েম করিবার জন্য সুগন্ধি সাবান প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যাহাদের সাময়িক ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তাঁহাদিগকে, এক জীর্ণ তেলচিটে বস্ত্রাবাসের মধ্যে, ন্যক্কারজনক আবহাওয়ায়, কাঁচি, নরুন প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির সহিত একত্রে ঠাসাঠাসিভাবে বসবাস করা যে কি কষ্টকর, তাহা বুঝাইতে যাওয়া মূঢ়তার নামান্তর মাত্র। বিলাসিতা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নহে, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও সাবান প্রভৃতির ব্যবহারের একটা মূল্য আছে।

তীর্থক্ষেত্রে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আমাদের আসিতে

হয়, উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দাড়ি ও মাথার দুর্গন্ধে আমাদের অন্নপ্রাশনের—

সভাস্থল হইতে "হিয়ার হিয়ার", "শেম শেম", "বসুন বসুন", "অর্ডার অর্ডার", "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি উত্থিত হইয়া তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিল। গান্ধীটুপি পরিহিত কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক দেখিলাম সভার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন আমার নিকটস্থ হইতেই উহাকে আমার শ্বশুর মহাশয় প্রদত্ত মদীয় ক্ষুরাবতার বলিয়া চিনিতে পারিলাম। নাঃ, ছোঁড়াটা একেবারে 'আউট' হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি। উহাকে বুঝাইয়া বাড়ি লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই সে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া আমার কণ্ঠনালীর দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ভয়ে সমস্ত শরীর হিম হইয়া গেল। পলাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কি একটা দ্রব্যে পা আটকাইয়া সশব্দে পড়িয়া গেলাম।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইতে দেখিলাম, উত্তেজনার বশে কখন পাশ-বালিশটাকে ঠেলিয়া দিয়াছি। উহা পড়িয়াছে একটা রেকাব ঢাকা জলের গ্লাসের উপর। মণ্টু নীচে মাদুরের উপর বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। আমার ট্রাম-ভ্রমণের সুযোগ লইয়া কখন সরিয়া পড়িয়াছে—উহার পুস্তক সকল জলসিক্ত, এবং গৃহিণী স্বয়ং জিজ্ঞাসু নেত্রে দণ্ডায়মান আছেন।

"বিজ্ঞানভিক্ষু"

[আমাদের "বিজ্ঞানভিক্ষু" মহাশয়ই আদি ও অকৃত্রিম। সম্প্রতি দেখিলাম, ইঁহার জাল এবং নকলে বাজার ছাইয়া গিয়াছে, পত্রিকান্তরে (দৈনিক) সপ্তাহে সপ্তাহে এক "বিজ্ঞানভিক্ষু" লিখিয়া থাকেন, ইনিও আমাদের আসল "বিজ্ঞানভিক্ষু" নহেন। মাল খরিদের সময় গ্রাহকগণ সাবধান হইবেন।—স. শ. চি]

বিচার

গভীর রাতে সমস্ত শহর ঘুমিয়ে আছে। শেষ স্পন্দনটুকুও প্রায় থেমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে দু একটা কুকুর ডাকে, পুলিস হাঁক দিয়ে যায়। দ্বিতল কামরায় এক নির্জ্জন ঘরে বিছানায় শুয়ে প্রিয়নাথ-বাবু ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন। স্ত্রী সুচারু দেবী শয্যা ছেড়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার শোনেন, কোনও উত্তর দেন না। ঘরের ভিতরে প্রিয়নাথবাবু সমানে চীৎকার ক'রে যান, খুন করেছে, খুনী। সুচারু দেবী ঘরে ঢুকে বলেন, চুপ কর। চল, শোবে চল। স্বামীর হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন।

কিছুক্ষণ পর আবার চীৎকার সুরু হয়। এইবার সুচারু দেবী ঘরে ঢুকে রীতিমত ঝাঁঝালো সুরে বলেন, একটু কি ঘুমুতেও দেবে না? রাতদিন জ্বালাতন করবে?

প্রিয়নাথবাবু চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। সুচারু দেবী নিজের ঘরে ফিরে যান। ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পরে আবার চীৎকার করেন প্রিয়নাথবাবু, আরও বিকটভাবে। সুচারু দেবী বিরক্তির সুরে বলেন, কি, হয়েছে কি তোমার? কালই তোমাকে পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করব। পাড়ার লোককে পর্য্যন্ত টিকতে দেবে না—আশ্চর্য্য!

প্রিয়নাথবাবু বলেন, চারিদিকে রহমন ঘুরে বেড়ায় চারু—খুনী রহমন, আর বলে কি জান? বলে, হুজুর, খুন আমি করি নি। পাজী, বদমাস!

সুচারু দেবী ধমক দিয়ে বললেন, যত পাগলামির উপসর্গ তোমার রাতেই বাড়ে নাকি? আমি আর পারি না সহ্য করতে, আমাকে রেহাই দাও, দোহাই তোমার।

রেহাই দিয়েছি চারু, পেন্‌শনের অর্দ্ধেক টাকার, এই তো? জানি—চ'লে যাও তুমি, যাও—যাও—বেরিয়ে যাও বলছি।—প্রিয়নাথ-বাবু হঠাৎ খুব জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন। প্রতিবেশীদের ঘরে বাতি জ্ব'লে ওঠে। সুচারু দেবী অপ্রস্তুত হয়ে সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলেন, কি হচ্ছে কি? বদ্ধ পাগল হ'লে নাকি?

এমনই ভাবে দিনের পর দিন কেটে যায়। সুচারু দেবীর অবকাশ নেই নিঃসঙ্গতার। প্রিয় বান্ধবী সবিতা দেবীর স্বামী ব্যারিস্টার বাসু প্রত্যহই সকালে আসেন সুচারু দেবীর চায়ের টেবিলের একাকিত্ব দূর করতে। দুজনে অনেকক্ষণ প্রিয়নাথবাবুর সম্বন্ধে আলাপ হয়, কোন কোন দিন ব্যক্তিগত আলাপে বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি সুচারু দেবী ভুলে যান। সম্প্রতি স্বামীর পেন্‌শন গ্রহণের পর তিনি গার্লস কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেছেন। বন্ধুবান্ধবীরা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, এটা শখ নয়, নেসেসিটি—একটা যা হোক অ্যাসোশিয়েশন তো দরকার! দিনরাত ওঁর পাগলামি শোনার পেশেন্স নেই আমার, হেল—হেল—ভেরিটেব্‌ল হেল।

নরকের জ্বালা সুচারু দেবী দূর করেন সকালে মিঃ বাসুর সঙ্গে ব্রেক্‌ফাস্টের টেবিলে, দুপুরে মেয়েদের কলেজে ইতিহাস পড়িয়ে, আর সন্ধ্যায় কোন সান্ধ্য মজলিসে গল্পগুজব ক'রে। আর প্রিয়নাথবাবু?

দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করে বাইরে। দোতলায় জানালার গরাদে ধ'রে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকেন প্রিয়নাথবাবু। কখনও কখনও দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে ওঠেন। তারপর বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকেন সিলিঙের দিকে চেয়ে। কড়িকাঠগুলো চোখের সামনে কাঁপতে থাকে, সজোরে একখানা টালি

যেন খ'সে পড়ে প্রিয়নাথবাবুর মাথায়। উঃ!—ব'লে মাথা দু হাতে চেপে ধ'রে তিনি উঠে বসেন। দেয়ালের গায়ে কে যেন হিজিবিজি আঁচড় টেনে যায়—রহমন, রহমন, বদমাস, খুনী। তারপর অট্টহাসির শব্দ হয়। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একা প্রিয়নাথবাবু ব'সে থাকেন।

প্রিয়নাথ সেন অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ। প্রায় বছরখানেক হ'ল তিনি সে পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। বিচক্ষণ বিচারক ব'লেই তাঁর খ্যাতি ছিল, এবং সে খ্যাতি তিনি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রেখেই অবসর নিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী একটি জটিল দেশদ্রোহিতার মামলার বিচার করবার পর কাগজের মারফৎ তাঁর বিচার-বুদ্ধির প্রশস্তি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তার কিছুদিন পরেই তিনি বিচারকের আসন থেকে বিদায় নেন।

অবসর-দিনের প্রশস্ত পরিসরের মধ্যে অল্পদিনেই তাঁর জীবনে এক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মানুষের সাহচর্য্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নির্জ্জনতা তাঁর প্রিয়। ঘরের চার কোণে হয় তিনি পায়চারি ক'রে বেড়ান, নয় চুপ ক'রে গুম ব'সে থাকেন। দিন দিন যেন নিজের মধ্যে তিনি অসহায়ের মত দুর্নিবার বেগে তলিয়ে যেতে লাগলেন।

বাইরে অন্ধকার নামল, ভিতরে আলো জ্বলল। ভিতরের আলো দিয়ে বাইরের এই অন্ধকার দূর করা হ'ল না। বাইরের অন্ধকারই আজ ভিতরের এই আলোর উৎস। কিন্তু এই আলোই যেন প্রিয়নাথবাবুর আজ ভাল লাগে—ভাল লাগে এই আলোয় ডুব দিয়ে থাকতে। বাইরে নিবিড় অন্ধকার ঘুমিয়ে আছে, থাক।

একা ঘরে প্রিয়নাথবাবু চুপ ক'রে ব'সে থাকেন। কখনও নির্জ্জন দুপুরে, গভীর রাত্রে জোরে চীৎকার ক'রে ওঠেন, খুনী—খুনী—খুনী। প্রতিবেশীরা করুণার সুরে বলে, জজ সাহেব পাগল হয়েছে। সুচারু দেবী রুক্ষ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। প্রিয়নাথবাবুর চোখের দুই কোণে অনিদ্রার কালো রেখা, সমস্ত মুখের উপর অর্থহীন উদাসীনতার ছাপ। ফ্যাকাশে হাসি হেসে প্রিয়নাথবাবু ডাকেন, চারু! তারপর নিজের মাথার একরাশ চুল মুঠো ক'রে ধ'রে বলেন, আচ্ছা, আমি পাগল হয়েছি, না?

তুমিই জান।

তার চেয়েও বেশি জান তুমি, আর—আর কে জান? ব্যারিস্টার বাসু। প্রিয়নাথবাবু আবার ফ্যাকাশে হাসি হাসেন। বলেন, চায়ের টেবিলে তোমরা আমাকে পাগল ব'লেই তো জাজমেণ্ট দিয়েছ—দাও নি?

প্রলাপ শোনবার সময় নেই আমার।—ব'লে সুচারু দেবী চ'লে যান। প্রিয়নাথবাবু ডাকেন, শোন, শোন, হ্যাম্‌লেট পড়েছ? কুইন অফ ডেন্‌মার্ক?

সেদিন প্রিয়নাথবাবু নীরবই ছিলেন। যথারীতি চাকরে এসে সন্ধ্যার পর খাইয়ে দিয়ে গিয়েছে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ রয়েছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘর থেকে বিকট চীৎকার শুনে সুচারু দেবীর ঘুম ভেঙে গেল। প্রিয়নাথবাবু চীৎকার করছেন, আগুন—আগুন।

প্রতিবেশীদের ভিড় জমল। দরজা ভেঙে দেখা গেল, প্রিয়নাথ-

বাবুর বীভৎস ছাল-ওঠা দগ্ধ মূর্ত্তি ঘরের কোণে প'ড়ে রয়েছে—নিস্পন্দ। প্রিয়নাথবাবু আত্মহত্যা করেছেন।

সুচারু দেবীর নজরে পড়ল, খাটের ধারে ছোট টেবিলের উপর তাঁর একখানা চিঠি। প্রিয়নাথবাবুর লেখা।

চারু,

লেখবার প্রয়োজন ছিল না, তবুও লিখছি। কয়েকটা কথাতে তোমার ভুল যদি দূর হয়, হোক। আজ আমি সত্যই বিচারক। অপরাধের শাস্তি দিতে কোন দিনই ভয় পাই নি, তাই শ্রেষ্ঠ অপরাধীর শাস্তি দিলাম এবং দিয়ে গেলাম। রহমন খুন করেছিল গরিব একজন আমলাকে, প্রাণদণ্ড দিয়েছি। আমি খুন করেছি রহমনকে, আমার প্রাণদণ্ড হ'ল। এ অপরাধের ক্ষমা নেই। রহমন গ্রামে আগুন ধরিয়েছিল, সেই আগুন আমার ঘরে লেগেছে। পাগলামি মনে হচ্ছে? দুঃখ হবে না তোমার, কারণ আমার দুঃখ নেই। আমার সবচেয়ে বড় শাস্তি হচ্ছে যে, আমার ঔরসে এবং তোমার গর্ভে আমাদের কোন সন্তান হয় নি। আমাদের জীবনের উত্তরাধিকারী কেউ নেই—এই তো শাস্তি। শুধু ভাবি, অপরাধী কে? রহমন? না, আমি? না, তুমি? এ আমার আত্মহত্যা নয়, রহমনের বিচার।

ল রিপোর্টের চার নম্বর আলমারির পিছনে আমার ১৯৩৮ সালের ডায়েরি আছে। ২২এ জানুয়ারির কয়েকটা পাতা অবসর-সময়ে প'ড়ে দেখতে পার। আমার প্রিয় পিনাল কোডখানা আমার শবের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলো।

—প্রিয়নাথ সেন

যথাস্থান থেকে ডায়েরি নিয়ে সুচারু দেবী নিজের ঘরের এক কোণে পড়তে চ'লে যান। তাঁর বুকের ভিতর দুরদুর ক'রে ওঠে। ভয়ে ভয়ে তিনি পড়তে থাকেন।

রহমনের অপরাধ গুরুতর। শুধু খুন নয়, গ্রামে যাবতীয় বিদ্রোহ ও অসন্তোষের মূল রহমন। এই অভিযোগের সপক্ষে যা প্রমাণ পেয়েছি, বিপক্ষে তার কিছুই পাই নি। একমাত্র শুধু রহমনের স্বীকারোক্তি, কিন্তু তারও কোন মূল্য নেই। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে রহমন বলেছে—

হুজুর, খুন আমি করি নি। আমার দলের কেউ দোষ করে নি। হুজুরের আইনে আমাদের সাজা হতে পারে। কিন্তু খুনী আমরা নই। জমিদারের একজন গরিব আমলাকে গ্রামের পথে খুন করতে আমরা নারাজ। আমাদের ধর্ম্মে তা বলে না হুজুর, আমাদের নালিশ তা নয়। বকেয়া খাজনা আর ঋণ মকুবের জন্যে গ্রামের সব চাষাচাষীরা ঘর ছেড়ে মাঠে বেরিয়ে এল। তাদের জব্দ করবার জন্যে জমিদার ভাড়াটে লোক দিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে। আগুন আমরা ধরাই নি হুজুর। আমাদের বউ-ছেলে-মেয়ের ওপর মাঠের মাঝখানে যখন জমিদারের সিপাই গুলি চালাল, তখন আমরা দল বেঁধে জমিদারে বাড়ি ঘেরাও ক'রে হেঁকে বললাম, বিচার চাই। জমিদার তার জবাব দিয়েছিল আমাদের ওপর বেকসুর লাঠি চালাবার হুকুম দিয়ে। অনেক চাষী ভাই-বোনদের মাথা ধুলোয় লুটিয়েছিল। তবু জমিদারের বাড়ির ইট পর্য্যন্ত আমরা ছুঁই নি। গরিব আমলাকে আমরা খুন করব কেন হুজুর? নিতাই মুহুরী গরিব লোক। তাকে খুন করেছে জমিদারের ভাড়াটে গুণ্ডা। নিতাই মুহুরীর অনাথা মেয়েকে রাত দুপুরে মুখে কাপড় বেঁধে জমিদারের সিপাইরা বাগান-

বাড়িতে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল। সাত দিন তার কোন খোঁজ ছিল না। নিতাই মুহুরীকে সিপাইরা খুন করবে শাসিয়েছিল, কথা ফাঁস করলে। মুহুরী আমাদের বিশ্বাস করত। আমি জানতে পেরে দল বেঁধে গিয়ে তাকে নিয়ে আসি। নিতাই মুহুরীকে আমরা খুন করি নি হুজুর, এ ঘটনা আমরা জানি। আমাদের প্রাণে মারবার জন্যে জমিদার তার গরিব আমলাকে খুন করেছে, চাষার ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে।

রহমন মিথ্যাবাদী। রহমনের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল। জুরিরা একমত হয়ে সকলকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন। রহমনের ফাঁসির হুকুম হ'ল। তার দলের আর দুজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হ'ল, আর বাকি তিনজনের হ'ল দশ বছর ক'রে সশ্রম কারাদণ্ড।

জমিদার রাজা শিবনারায়ণ সিংহ মহাপ্রাণ ব্যক্তি। পঞ্চাশ হাজার টাকার অগ্রিম পুরস্কার পাঠিয়েছেন। তাঁর শুধু অনুরোধ ছিল, মামলা যেন ফেঁসে না যায়। গ্রামের চাষারা রহমনের জন্যে বিদ্রোহ করেছে, রহমানের মৃত্যু ভিন্ন গ্রামে শান্তি নেই। এ আর অনুরোধ কি? তাইই তো প্রমাণিত হ'ল। পিনাল কোড প্রমাণ করেছে।

চারুর উৎসাহও তো উপেক্ষণীয় নয়! চারু বলে, দু দিন পরে অবসর নিয়ে শহরে একখানা বাড়ি করবে—একলা জীবন—আমার কথাও তো ভাবতে হয়! সত্যিই তো, অর্থ আমার চাইই।

সুচারু দেবীর হাত থেকে ডায়েরিখানা প'ড়ে গেল, শরীর ঝিমঝিম ক'রে উঠল। উঠে গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

প্রিয়নাথবাবুর শব-পরীক্ষা শেষ হয়েছে। করোনার সাহেব রায় দিয়েছেন, প্রিয়নাথবাবু সাময়িক উন্মাদনার বশে স্পিরিট ঢেলে সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। রায় নিয়ে মিঃ বাসু মর্গে এলেন। মর্গে সুচারু দেবী এসেছেন, সঙ্গে তাঁর প্রিয় বান্ধবী সবিতা দেবী। আরও

অনেক বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এসেছেন। কারও হাতে ফুলের মালা, কারও ফুলের তোড়া। মর্গের ভিতর থেকে প্রিয়নাথবাবুর মৃতদেহ ধ'রে এনে খাটে শোয়ানো হয়েছে। আপাদমস্তক চাদর দিয়ে ঢাকা।

মুখ খুলে দিতেই সুচারু দেবী শিউরে উঠলেন। দগ্ধ কপালের কোণে বহুদিন আগেকার একটা কাটার দাগ এখনও স্পষ্ট রয়েছে, আগুনে পোড়ে নি। সুচারু দেবীর মনে পড়ল—

প্রিয়নাথবাবু একবার গ্রামের মধ্যে কৃষক-বিদ্রোহ তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। তাঁর চলন্ত মোটর গ্রামের চাষাচাষীরা দল বেঁধে আক্রমণ করে। সিপাই-বরকন্দাজের লাঠিতে আক্রমণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ছোট একটি চাষার ছেলে দূর থেকে কাস্তে ছুড়ে মেরেছিল। প্রিয়নাথবাবুর কপাল থেকে কাস্তের সেই কাটা দাগ আজও মুছে যায় নি। আগুনে পুড়ে ছাই হবার আগে মুছবে না।

শ্রীবিনয় ঘোষ

গ্রহণ

বোমা পড়ে পেট্রোল-ট্যাঙ্কে,
যত পড়ে তত পোড়ে উপরে শকুনি ওড়ে
টান ধ'রে যায় যত ব্যাঙ্কে।
প্রেয়সী, হুকুম কর মোক্ষ—
নয়ন-বিমান তব বোমা ছাড়ে অভিনব,
হিয়া-তেলখনি করি লক্ষ্য!
জ্বলিতেছে দাউ দাউ— পোড়ে আলু, তাই ফাউ,
পাগলের তাহাই তো ভক্ষ্য!

বিপন্ন শ্রীপতি

আবার আশ্বিন আসে, সবাই আনন্দে ভাসে,
আমার পরাণে নাহি সুখ—
সদাই সে করে ধুকপুক।
গত সনে আফগান দয়া করি রাখে মান
কাশ্মীরী আলোয়ান দিয়া ;
চারুদেহে অলস্টার, সুকোমল মফলার
পরায়ে সে চলি গেছে মিঞা।
লাঠি হাতে সে পাঠান কবে আসে—ভাবি প্রাণ
রক্তশূন্য মোর।
রিনিদ্র রজনী যাপি, স্বপ্নে মূর্ত্তি হেরি কাঁপি—
বসিয়াছে চাপি মোর দোর।
রাই তুলে নেছে হাতে সিল্কের মোজা ;
হাই তুলে বলি তাঁরে— কটি যে বঙ্কিম হা রে,
ঋণভারে হতে নারি সোজা।

টেনিসে 'এক্সপার্ট' প্রিয়া,
এবার পাহাড়ে গিয়া
চ্যাম্পিয়ন হতে হবে তাঁকে।
বহু ভক্ত যাবে সাথে,
সবারি র‍্যাকেট হাতে।
আপন অবস্থা কহি কাকে ?

"শ্রীমতী মিনতি রাখ, খানিক সমঝি থাক,
প্রাণ মোর ক্রমে কণ্ঠাগত।
তুয়া-লাগি কি না পারি, "কাবুলী" সহিতে নারি,
হানা দিলে শুকায় রকত।
মিছা আজি-কালি করি গোঁয়ানু দিবা-শর্ব্বরী,
দ্রুত যে অতীত বারো মাসা।
এবে কি কহব তায়, স্মরি যে শিহরে কায়,
আব হামে নাহি কোন আশা।"

শুনই শ্রীমতী কয়, "প্রেম না বি-মূলে হয়,
আগে না ভাবলি কেন বঁধু ?
শুধাও মধুপ কাছে— হুলের বেদন আছে,
পিয়ইতে চাহ যদি মধু।"
এই কথা কহি পিয়া শ্রীপদে স্লিপার দিয়া
বসিল গুছাতে সুটকেস,
শ্রীপতির ছুটে ভাবাবেশ।

বিংশ শতাব্দীর 'চ্যাপ'—
কৃষ্ণ শিরে গান্ধী-ক্যাপ,
বলে, "রাই, শুন পুণ্যকথা,
অচিরে ঘুচাব তব ব্যথা।
দিন কয় কর লো সবুর,
বুদ্ধিদোষে হয়েছি ফতুর।

মথুরার রাজপাট হয়ে গেছে লুট,
খ'সে গেছে সে 'রয়াল-স্যুট'।
'লিট্‌ল' অহিংস হও কাজে প্রাণে বাক্যে,
'লহনা' মিটাই আগে,—আর সব থাকগে।
মোটর গিয়াছে 'সেলে'
ভাগ্যে ফিরায়ে পেলে,—
স্বয়ং 'ড্রাইভ' ক'রে পাহাড়েতে যেও,
রেস্তোরাঁয় পূর্ব্ববৎ শ্রেষ্ঠ 'ডিশ' খেও।
আহা, রহ রহ।" শুনিল না প্রিয়া,
উপস্থিত পিত্রালয়ে গিয়া।

বন্ধু কয়, শুন কৃষ্ণ, নব যুগ তব সৃষ্ট,
এবে পাবে 'ডিভোর্সে'র পত্র।
কবির মিনতি রাখ, কোর্টে কভু যেও নাকো,
তাহে শুধু বাড়ব অনর্থ।
এ নহে অদ্ভুত কথা— নব-বৃন্দাবন-প্রথা,
তুহার লীলায় বলিহারী।
ওঁরাই প্রকৃত গিরিধারী।

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বখাত সলিলে ডুবে মরি

বাঙালী হিন্দুর বড় দুঃসময় যাইতেছে। বাংলা দেশে হিন্দুরা সংখ্যায় কিছু অল্প বলিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তাহাদের কোন হাত নাই; যদিও প্রজাসাধারণের মতামতের উপরেই বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়, তথাপি এই প্রজাসাধারণের যে সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাঁহারাই সকল কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইয়াছেন। স্বাধীন রাষ্ট্রের ইহাই নাকি মূলনীতি, ইহারই নাম পপুলার গবর্মেণ্ট। আমরা রাজনীতির কিছুই বুঝি না, আমাদের এই আলোচনাও রাজনৈতিক আলোচনা নয়। অতিশয় সরল সহজ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতেছি, তাহাই এ প্রসঙ্গে বলিব। আমরা দেখিতেছি, বাংলা দেশের অধিবাসীগণ ধর্ম্ম ও সমাজের প্রাচীর দ্বারা দুই ভাগে সম্পূর্ণ পৃথক; এবং ইহাও দেখিতেছি যে, তাঁহাদের এক ভাগ—ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়—জাতি বা নেশন হিসাবেও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব এইরূপ শাসনতন্ত্রকে সমগ্র অধিবাসীগণের সমানাধিকারতন্ত্র বলা যায় না। এক জাতির উপরে অপর জাতির প্রভুত্ব বলিলেই যথার্থ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমরা রাজনীতি বুঝি না, রাজনৈতিক আন্দোলন হইতেও আমাদের পত্রিকা যথাসাধ্য দূরে থাকিবার চেষ্টাই করে। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থার ফলে হিন্দুদিগের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা হিন্দু বলিয়াই আমাদের না ভাবিয়া উপায় নাই। সম্প্রতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুর যেটুকু ন্যায্য প্রাধান্য ছিল, তাহাও শেষ হইতে চলিল। এই বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, কারণ, বাঙালী জাতির (মুসলমান বাঙালী বা হিন্দুস্থানী নহেন, তাঁহারা দেশ

ও জাতি নির্ব্বিশেষে 'মুসলিম'—ইহাই স্থির করিয়াছেন) অস্তিত্বই এক হিসাবে বিপন্ন হইয়াছে।

* * *

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব সংকোচ করিয়া, অথবা সেই কর্ত্তৃত্ব কার্য্যত নস্যাৎ করিয়া, নূতন আইনে, বাংলা দেশের স্কুল ও পাঠশালাগুলির পরিচালনা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির প্রাধান্যযুক্ত বাংলা গবর্মেণ্ট নিজের হাতে তুলিয়া লইতেছেন। এ বিষয়ে কিছু বলিবার আগে এমন দুই চারি কথা বলা সঙ্গত হইবে, যাহা আমাদের নেতৃবর্গেরও ভাল লাগিবে না। বাংলা দেশে স্কুল-কলেজের শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, অন্যান্য স্বাধীন দেশের সমাজে তাহা বুঝায় না। এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চাকুরি লাভ, এবং সেজন্য পুঁথিগত বিদ্যার একটা আদর্শ ছাড়া আর কোন আদর্শ বা নীতি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে কখনও ছিল না। এ শিক্ষাও গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ একরূপ অশিক্ষায় পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার চূড়ান্ত নিদর্শন—কতকগুলি ছোট বড় ডিগ্রী লাভ; এই ডিগ্রী লাভ করিলেও শতকরা ৯০ জনেরও অধিক প্রায় অশিক্ষিতই থাকে। গুছাইয়া দুই ছত্র লিখিবার শক্তিও তাহাদের হয় নাই দেখা যায়। ইহা যে সত্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিবে, মুখে না করিলেও মনে মনে করিবে; কেবল দুইটি দল তাহা স্বীকার করিবে না। এক, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালক; দুই, যাঁহারা এই ব্যবস্থার বলে প্রভুত্ব করিতেছেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর বিদ্যাবত্তার যে সুনাম ভারতবর্ষে ছিল, তাহা আজ আর নাই; বাঙালী-সমাজেও বি. এ. এম. এ. পাস-করা ব্যক্তিগণের এককালে যে সম্মান ছিল, সে সম্মান আর নাই; এককালে ভাল করিয়া এণ্ট্রান্স পাস করিয়া চাকুরিতে যে উন্নতিলাভ হইতে পারিত, নানা বিভাগে বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রের প্রমাণ দিয়া তাঁহারা যে উচ্চতর পদে আরোহণ করিতেন, আজ এম. এ. পাস করিয়াও সে যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া দুর্ঘট। ইহা স্মরণ করিয়া আধুনিক পদ্ধতির ফলাফল তুলনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বাংলা দেশে শিক্ষার কি অবস্থা ঘটিয়াছে। সেকালে যাঁহারা হেডমাস্টারি করিয়াছেন এবং এখনও

জীবিত আছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য দিবেন। এইরূপ যে কেন হইল ও হইতে পারিল—শিক্ষা হইতে শিক্ষানীতিকে দূর করিয়া অন্য নীতির জয় হইল, সে ইতিহাস এক্ষণে উদ্ঘাটিত করিয়া লাভ নাই। জাতির এখন মৃত্যুদশা উপস্থিত—নিজের পাপেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে—এতদিন ক্ষুদ্র সুবিধা লাভের জন্য যে অসত্য ও অধর্ম্মকে আমরা সকলেই প্রশ্রয় দিয়াছি, এখনও অন্তরে তাহার অতি-লোভন রূপ বিরাজ করিতেছে, তাই সত্য কথা এখনও ভাল লাগিবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে—বাঙালী-সন্তানের শক্তি ও প্রতিভা স্ফুরণের যে একমাত্র ক্ষেত্র এ যুগে আমরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম—সেই ক্ষেত্রে, আমরা যে ভাবে যে অমঙ্গল ইদানীং রোপণ করিয়াছিলাম, তাহারই রন্ধ্রপথে যদি আজ শনি প্রবেশ করে, তবে সেজন্য কাহাকে দায়ী করিব? একদিন যে কারণে এই মিথ্যা শাসনকর্ত্তাদের সম্মতি লাভ করিয়াছিল—অর্থাৎ আমাদের এই আত্মহত্যা নিবারণের কোন চেষ্টাই তাঁহারা করেন নাই, আজও সেই কারণে এই মিথ্যাকে দূর করিবার অজুহাতে যে আর এক বিধির প্রণয়নে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন; তাহার বিরুদ্ধে বলিবার কি আছে? সেদিনও তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, আজও তাহাই করিতেছেন—তাঁহাদের মূল নীতির ব্যতিক্রম হয় নাই, কেবল আইন-পরিবর্ত্তন হইতেছে মাত্র। সেদিন তো খুশি হইয়াছিলে, আজ খুশি হইতে পার না কেন?

* * *

জানি, খুশি না হইবার অন্য কারণ আছে—শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল বা মন্দ হউক, সে ভাবনা আমাদের কালও ছিল না, আজও নাই। আমাদের কর্ত্তাদের হাতে শিক্ষানীতি কূটরাজনীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রীতিমত একটা রাজ্য এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য একটি দল ও দলপতির রাজশক্তি অটুট রাখাই শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল অভিপ্রায় হইয়াছিল। দেশের স্কুল ও কলেজগুলি এক রকমের জমিদারি—সদরে খাজনা পাঠানোই তাহাদের মুখ্য কাজ—কর্ত্তাদের একমাত্র লক্ষ্য, কিসে এই খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যাহাতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট নামক বাদশাহী দরবারের পাত্র-মিত্র ও অর্থী-প্রত্যর্থীর ব্যয় সঙ্কুলান হয়, এবং ময়ূর-

সিংহাসনটির জোলুস বাড়ে। এক দিকে ছিল এই, আর এক দিকে একটি ব্যাপার আপনি গড়িয়া উঠিয়াছিল; এই ফ্যাক্টরি হইতে যে রাশি রাশি গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছিল, তাহাদের জীবিকার জন্য অসংখ্য অল্প-মূল্যের মাস্টারি-পদ সৃষ্টি হওয়াও প্রয়োজন; তাই সস্তা পাস-লোভী ছাত্রের যখন গাঁদি লাগিয়া গেল, সেই অনুপাতে স্কুলের সংখ্যাও বাড়িয়া চলিল; খাজনাও যেমন বাড়িল, তেমনই মাছের তেলে মাছ ভাজা হইতে লাগিল। ইহার ফলে, এক দিকে যেমন অর্দ্ধশিক্ষিত দীন-দরিদ্র চাকুরিজীবীই হইল আমাদের বংশধরগণের শিক্ষক, তেমনই অপর দিকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, আয়ুক্ষয় ও ধনক্ষয় করিয়া, দলে দলে যাহারা পথে ঘাটে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তাহারা দেহে ও মনে শক্তিহীন; শুধু তাহাই নয়, অল্পবিদ্যার বিষ পান করিয়া প্রমত্ত ও চরিত্রহীন। বাংলা সাময়িক-পত্রিকায় যে অসংখ্য বালখিল্য কবি ও সাহিত্যিকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং ভাব ভাষা ও অর্থের অন্ত্যেষ্টি-সাধন করিয়া যাহারা দলে দলে চীৎকার করিতেছে, তাহারাও এই শিক্ষারই সাক্ষাৎ ফল; পূর্ব্বে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহাতে এমন কুষ্মাণ্ড কখনও ফলে নাই। প্রায় দুই পুরুষ ধরিয়া এই সর্ব্বনাশ চোখে দেখিয়াও আমরা তাহার প্রতিকার চিন্তা করি নাই, ভয় পাই নাই; বরং এই শিক্ষাপদ্ধতিরই জয়গান করিয়াছি। পুত্রকে একটা যন্ত্রের এক প্রান্তে কেবল একবার প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলেই অপর প্রান্তে সে পাস-মার্কা হইয়া অনর্গল বাহির হইয়া আসে—ইহার চেয়ে সুখের বিষয়, আনন্দের বিষয় কি আছে? পাস-মার্কা হওয়াই পরমার্থ এবং তাহা এত সহজ হইয়াছে! অতএব দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করাই স্বাভাবিক। তারপর চাকরির বাজারে ঠেলাঠেলি, আর্ত্তনাদ ও কলরব; ছেলে যে মানুষ হয় নাই, বরং যেটুকু স্বাস্থ্য, শক্তি, বুদ্ধি ও চরিত্র ছিল, তাহাও নষ্ট করিয়াছে—সে চিন্তা কেহ করে না। দুই পুরুষ ধরিয়া ইহাই চলিয়াছে এবং অবস্থা ক্রমশ সঙিন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কর্ত্তাদের কূটবুদ্ধি হার মানে নাই; জমিদারি ভালই চলিতেছিল—প্রচুর ধন ও জন বলে, পাত্র-মিত্র-মন্ত্রী-কোটাল-সহযোগে এবং জাতীয়তা-বাদী সংবাদপত্রগুলির দলবদ্ধ সহায়তায়, এ পর্য্যন্ত সে কার্য্যে বিশেষ

বিঘ্ন ঘটিতে পারে নাই; শত্রুপক্ষ দুর্গ-আক্রমণের চেষ্টা করিলেও এ পর্য্যন্ত তাহার দ্বার ভাঙিতে পারে নাই।

* * *

আজ সেই দ্বার ভাঙিয়া পড়িতেছে। প্রাকৃতিক জগতের মত ধর্ম্ম-জগতেও কার্য্যকারণের কর্ম্মফল অলঙ্ঘনীয়; এ কথা পাদ্রীর কথা নয়, এবং পুরাতন হইলেও অতি সত্য কথা। গুমট অতিশয় হইলে ঝড় হয়; অসত্য ও অন্যায় দীর্ঘদিন ধরিয়া পুঞ্জীভূত হইলে আপনিই আপনার উত্তাপে ফাটিয়া যায়; আমরা ইহা বিশ্বাস করি, এবং করি বলিয়াই এত কথা লিখিতেছি; কারণ, ইহাও বিশ্বাস করি যে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপমোচন হয়। পাপ আমরাই—হিন্দুরাই করিয়াছি, কারণ, যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও চাতুর্য্যশক্তি পাপের পক্ষে প্রয়োজন, এবং যে পদ ও প্রতিপত্তি তাহাকে নিরঙ্কুশ করিয়া তোলে—বাংলা দেশে তাহা আমাদেরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, তাই এক্ষণে আমাদিগকেই সেই পাপের মূল্য—wages of sin দিতে হইবে। যাহারা এ ব্রতে নূতন ব্রতী হইতেছে, তাহাদের ভাগ্য স্বতন্ত্র; তাহারা এক্ষণে অগ্নিভক্ষণের আনন্দেই অজ্ঞান—অঙ্গার-বিরেচনের দিন এখনই আসিবে না। কিন্তু সে চিন্তা আমাদের নহে। আমাদের এখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুচি হইতে হইবে; যদি তাহা না পারি, তবে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

* * *

সেই প্রায়শ্চিত্তের কথাই বলিব। শিক্ষা-সংস্কারের ফলে হিন্দুর যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে মূলে শিক্ষাসঙ্কট নয়, অর্থাৎ শিক্ষার উৎকর্ষ-অপকর্ষই আমাদের ভাবনার বিষয় নয়—সাক্ষাৎ সঙ্কট অন্যবিধ, ইহাই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। এক দিকে অনেকের জীবিকা এবং অপর দিকে কতকগুলির প্রভুত্ব সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। শিক্ষা নয়, অন্নই এক্ষণে একমাত্র সমস্যা—শিক্ষা কখনই আমাদের একটা প্রধান সমস্যা ছিল না। এই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে, হিন্দুর—অর্থাৎ বাঙালীর অন্নসংস্থানের যে আর একটি পথ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও রুদ্ধপ্রায় হইবে; উপযুক্ত সংখ্যায় শিক্ষকপদে নিয়োগের বাধা, পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা ও বিক্রেতা রূপে অর্থোপার্জ্জনের পথরোধ, এবং শিক্ষকের সংখ্যাই অতি-

মাত্রায় হ্রাস হইয়া যাওয়ায় অকস্মাৎ পদচ্যুতি—এই সকলই হিন্দুসমাজের স্কন্ধে অতিশয় অতর্কিত ও দারুণ আঘাতের মত বাজিবে। ইহা শিক্ষা-সঙ্কট না হইলেও আমি এই দিকটাকে ছোট করিয়া দেখিতেছি না, বরং ইহার মধ্যেই ঘোরতর অশান্তির বীজ নিহিত আছে বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমি মুখ্যত শিক্ষাসঙ্কটের কথাই বলিতেছি; রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা আমার প্রসঙ্গের বহির্ভূত। প্রথমেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে—শিক্ষার যে নূতন ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে নিছক শিক্ষার দিক দিয়া আমাদের ক্ষতি কতটুকু হইবে। যে শিক্ষা এতদিন চলিতেছিল, তাহা অপেক্ষাও কি শিক্ষার অবনতি হইবে? শিক্ষার যে আমূল সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ক্ষমতা থাকিলেও কি আমরা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম? অর্থাভাবই একমাত্র বাধা নয়, অকাঙ্ক্ষার অভাবই সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে আর একটি জিনিস হিন্দুসন্তানের পক্ষে প্রয়োজন ছিল, এখনও আছে—তাহার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বজায় রাখা। ইহাও কি আমরা চাহিয়াছিলাম? আমরা দলে দলে 'পাস' করাইতে চাহিয়াছিলাম; ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, চরিত্র, স্বাস্থ্য—এ সকলের কোনটাকেই আমরা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করি নাই। দুই পুরুষ পূর্ব্বে বাঙালী হিন্দুর যেটুকু আত্মজ্ঞান ছিল—স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বধর্ম্মের যেটুকু পরিচয় সে রাখিত—আজিকার বাঙালী-সন্তানের সে জ্ঞান আছে? হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-প্রথা, ইতিহাস, ধর্ম্মতত্ত্ব, এমন কি রামায়ণ-মহাভারতের কথা আজিকার কলেজী ছোকরার দলে কয়জন জানে? বরং আমরাই কি গত ২৫।৩০ বৎসর যাবৎ হিন্দুর শিক্ষা হইতে সেই সংস্কার মুছিয়া ফেলিয়া সর্ব্বসংস্কারমুক্ত প্রগতি-পন্থার জয়ঘোষণা করি নাই? পূর্ব্বে স্কুলেও যেটুকু সংস্কৃত পড়া হইত, তাহাও অনাবশ্যক মনে করি নাই? বাংলা দেশে সংস্কৃত কলেজের অবস্থা কি হইয়াছে? এ সকলের জন্য দায়ী কাহারা? অতএব আজ যে হিন্দু-সংস্কৃতির কথা তুলিয়া আপত্তি করিবেন—সে অধিকার আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষের নাই। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিয়া কি হইবে?

* * *

অতএব কোন দিক দিয়াই সত্যকার শিক্ষাসঙ্কট ঘটে নাই এবং প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোন মাথাব্যথা নাই বলিয়াই কেবল শিক্ষার নামে আর কেহ সাড়া দিবে না। স্কুল-পাঠশালার ছাত্র-জীবনে আমাদের ছেলেরা এখন যে তপস্যা করিয়া থাকে—যে পাঠ্য ও পাঠন, যে পরীক্ষা ও পাস, শিক্ষকের যে অবস্থা এবং স্কুল-পরিচালনের যে কৌশল তাহারা আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে, তাহাতে বড় হইয়া শিক্ষার সম্বন্ধে কোন আদর্শনিষ্ঠা বা ধর্ম্মজ্ঞান তাহাদের আর থাকে না। আজ ইহাই সবচেয়ে বড় বিপদের কথা, কারণ খাঁটি শিক্ষার আগ্রহ আর কোথাও নাই বলিয়া কেহ তেমন করিয়া শিক্ষারই জন্য সন্ত্রস্ত বোধ করিবে না; এখনও তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে—বিনা হাঙ্গামে শিক্ষার নামটুকু মাত্র বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা যতটুকু সম্ভব বৈষয়িক সুবিধা করিয়া লওয়া। নীতিধর্ম্ম, আদর্শ, সংস্কৃতি—কিছুরই জন্য তাহাদের কোন উদ্বেগ নাই—হিন্দু হইয়া মরা অপেক্ষা, অহিন্দু হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার প্রলোভনই অধিক; কারণ হিন্দুদের মধ্যেই যাহারা ধনী, মানী, শিক্ষিত ও পদস্থ, তাহারা হিন্দুত্বের নামে হাসে, হিন্দু অপেক্ষা অহিন্দুর সহিতই তাহারা সামাজিকতা রক্ষা করিতে চায়; সমাজ যখন এমনই, তখন হিন্দু হইয়া লাভ কি?

* * *

লাভ নাই বটে, তথাপি একটা চিন্তা করিতেই হইবে—শিক্ষা চুলায় যাক, সংস্কৃতিকে বাঁচাইতেই হইবে। শিক্ষার সাক্ষাৎ প্রয়োজন যখন আর নাই—তাহাতে অন্ন যখন আর হইবে না, অথচ শিক্ষার ঠাট একটা বজায় রাখিতে হইবে; উচ্চতম পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিলেও চাকরির প্রত্যাশা যখন বৃথা, তখন হিন্দুর ছেলে, বাঙালীর ছেলে, নিজে জাতি, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিরোধী শিক্ষা স্বীকার করিবে কেন? পেট যখন ভরিবে না, তখন জাতটা অন্তত বাঁচুক। জানি, ইহার বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় কথা আছে; কিন্তু মরিবার সময়ে বড় কথার প্রয়োজন নাই। নূতন বিধান অনুসারে পাঠ্যপুস্তকগুলি কি ধরনের হইবে, তাহার ভাষা, ভাব ও বিষয়বস্তু কোন্ সংস্কৃতিমূলক হইবে, তাহা কল্পনা করা দুরূহ নয়; ইতিমধ্যেই, এই বিধান সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই, তাহার পরিচয় আমরা মর্ম্মান্তিকরূপেই পাইতেছি—আমি বাংলা

পাঠ-সংকলনের এবং সেই সকলের লেখক বা সংকলয়িতাদের মধ্যে যে সকল নূতন পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার কথাই বলিতেছি। অতঃপর, হিন্দু মনোভাব বা হিন্দুর ধর্ম্মগত সংস্কারের কোনও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি সেই সকল পাঠ্যপুস্তকে থাকিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চিত; অথচ ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেতিহাসের প্রচুর প্রচার তাহাতে থাকিবে। ইতিহাস-পুস্তকে ঐতিহাসিক তথ্যও যদি অপর জাতির অগৌরবসূচক হয় এবং তাহা কোনখানে হিন্দুর আত্ম-প্রসাদের কারণ হয়, তবে তাহা পাঠ্য হইতে পারিবে না। বীরত্বে, ঐশ্বর্য্যে, ধর্ম্মে ও নীতির উচ্চতম আদর্শে হিন্দুর যে গৌরবান্বিত হইবার অধিকার নাই, তাহারা যে এক নিকৃষ্ট, পৌত্তলিক, চিরপরাধীন দাস-জাতি—স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ইহাও যে হিন্দুর সন্তানকে জানিতে ও শিখিতে হইবে না, এমন কথা আজিকার দিনে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; বরং ইহাই মনে হয় যে, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ার পক্ষে কোন দিকেই বাধা নাই—একবার আরম্ভ হইলে বন্ধ করে কে? এবং এক্ষণে —"হিন্দুর নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।" তারপর, বাংলা ভাষা—যে ভাষা পৃথিবীর একটি উপাদেয় আধুনিক ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যে ভাষা হিন্দু বাঙালীর প্রতিভায় এবং সংস্কৃতির প্রেরণায় এমন সাহিত্যিক শ্রী ও সুষমা লাভ করিয়াছে এবং যাহার প্রতি বর্ণে, পরতে পরতে হিন্দু-সাধনার ভাবরস ও তত্ত্বরস হিন্দুর প্রাণের সঞ্জীবনী সুধার মত ক্ষরিত হইতেছে—সেই ভাষাকে, তাহার হিন্দুত্বের জন্য, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে, মুণ্ডিত ও বিকৃত করা হইবে; বাঙালীর আত্মা তাহাতে বলহীন হইবে। পাঠ্যপুস্তকে যে সকল পাঠ সংকলন করা হইবে, তাহাও রচনার উৎকর্ষ বা শিক্ষার উপযোগিতার জন্য নহে, অতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রচুর পরিমাণে সুলভ হইলেও তৎপরিবর্ত্তে, সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে, তুলনায় অতি নিকৃষ্ট রচনা অধিকতর সংখ্যায় সংকলিত হইবে। এই যে অবস্থা, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ; ইহার যদি কোন প্রতিকার আমরা না করিতে পারি, তবে অন্নহীন কুক্কুরের মত শুধু বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টার আর প্রয়োজন নাই।

* * *

প্রতিকারের একমাত্র পন্থা—হিন্দুর শিক্ষা পৃথক করিয়া লওয়া। ইহাতে কোন রাজনৈতিক উষ্মার প্রকাশ না থাকাই ভাল। ধীর বুদ্ধি ও দৃঢ় সংকল্পের সহিত এই কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে; গবর্মেণ্টের সহিত বিবাদ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্ত্তৃত্ব-অভিমানী সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষও নয়—আপনার ভাল-মন্দ মানুষ যেমন আপনি ঠিক করিয়া লইয়া, একটা দায়িত্বজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া, কর্ত্তব্য করিয়া থাকে—সেইরূপ মনোভাব লইয়া বাঙালী হিন্দু আজ তাহার পুত্রকন্যার পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা আইনসঙ্গতভাবে দাবি করিবে। সে দাবি যদি আন্তরিক হয়, যদি তাহা সমগ্র সমাজের ঐকমত্যের দাবি হয়, তবে সে দাবি গ্রাহ্য হইবেই; যদি তাহাতে দ্বিধা বা দুর্ব্বলতা থাকে, তবে তাহা একটা রাজনৈতিক হাঙ্গামা সৃষ্টির মত হইবে, এবং তাহা অনায়াসে দাবাইয়া দেওয়া যাইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দল কাজে ও কথায় সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটা ভিন্ন জাতি; তাঁহাদের শুভাশুভ, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুর হইতে সর্ব্বাংশে পৃথক; সেই পার্থক্য তাঁহারা রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এক জাতির পক্ষে যদি ইহা সঙ্গত হয়, তবে অপরের পক্ষে হইবে না কেন? উভয়ের মধ্যে যদি কোনখানে মিল না থাকে, তবে শিক্ষার মত এত বড় একটা ব্যাপারে দুই জাতির উদ্দেশ্যের মিল হইবে কেমন করিয়া? বিশেষত যখন ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্যকে এত বড় করিয়া দেখা হইতেছে। উভয় জাতির স্বার্থ যখন এত পরস্পরবিরোধী, এবং একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের দ্বারা পীড়িত হওয়া যখন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে—সর্ব্ব বিষয়েই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির জাতি-হিসাবে বাঁচিবার এটুকু অধিকার অবশ্যই কোন গবর্মেণ্ট ন্যায়ত হরণ করিতে পারেন না। আমরা কোন সম্প্রদায়ের নিকটে এ অধিকার দাবি করিব না, দেশের গবর্মেণ্টের নিকটেই তাহা করিব। অতএব ইহা যদি মঞ্জুর না হয়, তবে তাহা সুস্পষ্ট অত্যাচার বলিয়াই গণ্য হইবে এবং তখন রাজনৈতিক যে অশান্তির সৃষ্টি হইবে, তাহার জন্য হিন্দু বাঙালী নিশ্চয়ই দায়ী হইবে না।

সংবাদ-সাহিত্য

আমরা যখন এই প্রসঙ্গ লিখিতেছি, পৃথিবীর বৃহত্তম নগর লণ্ডনের উপর তখন জার্মান বিমান-বহরের অবাধ আক্রমণ চলিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুঘরের দুইটি অংশত ধ্বংস হইয়াছে; যে কোনও মুহূর্ত্তে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি শেক্‌স্পীয়রের স্মৃতিচিহ্নও বিলুপ্ত হইতে পারে। মনে হইতেছে, পশুশক্তির দ্বারা মানবের চিরন্তন মহিমা চিরতরে খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। সুতরাং সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সুকুমার-বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশকে মমতার সহিত দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। দেহ ও প্রাণের নিগূঢ় সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য আদিম মানবের স্বাভাবিক ব্যাকুলতাকেই সত্য ও ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। আসন্ন মৃত্যুর মুখে মানুষের দীর্ঘ সহস্র শতাব্দীর সাধনা ও সাধনালব্ধ ক্রম-বিকাশ নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে হইতেছে। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব ভগবানের পুত্র যীশুর চরম মুহূর্ত্তের "তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন?"-আর্ত্তনাদকে এতকাল অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে হইত। আজ বুঝিতেছি, মর্ত্ত্যমানবের ইহাই শেষ কথা।

* * *

ঈশান ও নৈর্ঋত কোণের মেঘ ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যগগনেও সঞ্চারিত হইতেছে; ধরণীর এক প্রান্তের বেদনা-বেপথু অন্য প্রান্তেও স্বেদোদ্গম করাইতেছে, এখন আমরা কোন্ সাহিত্য করিব? পূজার প্রতীক্ষায় সমস্ত প্রকৃতির মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে হাসি এবারে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না। যাহারা চোখ বুজিয়া আসন্ন বিপদের প্রখরতা এড়াইতে চাহিতেছে অথবা যাহারা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে সাময়িক বিস্মৃতির সন্ধান করিতেছে, তাহাদিগকেও হিংসা করিতেছি না; সিনেমা, থিয়েটার, জলসা, খেলার মাঠ, হোটেল, সমুদ্রসৈকত, পর্ব্বতচূড়া—সত্যকার শান্তি কোথাও নাই। এবারে আপন প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অভাব পক্ষে নিজের পোষা পাখীটি লইয়া নিভৃত গৃহকোণে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপই সত্যকার অবকাশ-বিনোদন হইবে। যাঁহারা ছটফট করিয়া বাহিরে যাইতে চাহিতেছেন,

তাঁহাদিগকে অধিকতর অশান্তি লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। এবারে আমাদের পূজার ভূয়োদর্শন ইহাই।

* * *

এইরূপ তত্ত্ব ও উপদেশ-কথার গূঢ় কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাকে গোপনে বলিতে পারি। দুইটি কারণ আছে। এক, পূজার বাজারে কোনও রেল কোম্পানির বিজ্ঞাপন আমাদের জুটে নাই। জুটিলে বর্ত্তমান "পরিস্থিতি"তে ট্রেনে চাপিয়া বাহিরে যাওয়ার পক্ষে অনেকগুলি মারাত্মক যুক্তি উপস্থাপিত করিতে পারিতাম। দুই, আশ্বিনে 'শনিবারের চিঠি'র বৎসর শেষ হইতেছে। কার্ত্তিক সংখ্যা আর পনরো দিনের মধ্যে (৯ই আশ্বিন) বাহির হইবে। নব বর্ষের উহাই প্রথম সংখ্যা এবং ঐ সংখ্যাই ভি. পি.-তে সর্ব্বত্র প্রেরিত হইবে। গ্রাহকগণ পূজাবকাশে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে ভি. পি. ফেরত আসিয়া আমাদের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। যাচিয়া কেহ নিজের লোকসান চাহে না।

এই কারণগুলি আমাদের অবচেতন মন বিশ্লেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। চেতন মন বলিতেছে, অদূরভবিষ্যতে স্থান পরিবর্ত্তন বাধ্য হইয়াই করিতে হইবে। ডবল খরচের ফেরে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

* * *

উপহার-স্বরূপ প্রাপ্ত অনেকগুলি পুস্তক আমাদের টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়া আমাদের আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে, এ কথা গতবারেই বলিয়াছি। প্রত্যেকটির সমালোচনা করিয়া গুণাগুণ নির্দ্দেশ করিবার মত বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তা আমাদের নাই; কিন্তু পরিচয় দিবার ক্ষমতা আছে। যাঁহারা আমাদের সতর্কবাণী সত্ত্বেও পূজায় হাওয়া খাইতে বাহির হইবেন, তাঁহাদের সঙ্গে নিশ্চয় কিছু পরিমাণ পুস্তকও বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবে। আমাদের বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন তৎপূর্ব্বে আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'শনিবারের চিঠি'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া লন। একটু সহানুভূতিসম্পন্ন যাঁহারা, সঙ্গে লইবার মত অনেকগুলি ভাল ভাল বইয়ের সন্ধান সেখানে তাঁহারা পাইবেন। এই বাছাই শেষ হইলে, যদি তাঁহাদের ট্যাক ছাড়পত্র দেয়—আশ্বিন

ও কার্ত্তিকের "সংবাদ-সাহিত্যে"র শেষে মুদ্রিত "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগটি তাঁহারা দেখিবেন। অনেকগুলি পাঠ ও উপহার যোগ্য পুস্তকের পরিচয় তাঁহারা এই বিভাগেও পাইবেন। আমরা পরিচয় দিয়া দায়িত্ব-মুক্ত হইতেছি, তাঁহারা বই কিনিয়া দায়িত্বমুক্ত হইবেন। লেখক, সম্পাদক ও পাঠকের এইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেই সত্যকার সাংস্কৃতিক জীবন গড়িয়া উঠে।

—

"পাট"কে "হোলে"র মর্য্যাদা দেওয়া অথবা অস্ফুট ভ্রূণকে গোটা প্রাণীর সম্মান দেওয়ার রেওয়াজ আজকাল বড় বেশি দেখা যাইতেছে। "ছোটগল্পে"র প্রতি আমাদের অত্যধিক প্রবণতায় এরূপ ঘটিতেছে। কবিরাও এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। ১৩৪৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা (ভাদ্রে বাহির হইয়াছে) 'চতুরঙ্গে' কবি জীবনানন্দ দাশ (জীবানন্দ নহে) "ঘোড়া" কবিতায় এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ঘোড়ার ডিমে তা দিলে ঘোড়া হইতে পারে, ইহা মানিয়া লইয়াও আমরা বলিব, "ঘোড়ার ডিম"কে "ঘোড়া" বলা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। "ঘোড়ার ডিম" কবিতাটি এই—

আমরা যাই নি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় :
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্ত্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন,—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা কটা বিড়ালছানার মত—ঘুমে—যেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে ন'ড়ে গেল ওপাশের পাইস্ রেস্তর'াতে;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
... ...

ধর্ম্মত বলিতেছি, কপিরাইট অ্যাক্টের ভয়ে শেষ দুইটি লাইন বাদ দিয়া গোটা কবিতাটিই উদ্ধৃত করিয়াছি।

—

শুনিয়াছি ধ্রুবতারা নামে আমরা যে নক্ষত্রটিকে সম্মান করিয়া

থাকি, তিনি মাঝে মাঝে পাহারা বদল করেন মাত্র, অর্থাৎ ধ্রুবতারা একটি নয়, একটি সিরিজ—যিনি যখন ঘাঁটিতে থাকেন, তিনিই তখন ধ্রুবতারা। আমাদের "জলধরদাদা"ও ধ্রুবতারা-জাতীয় নাম। যিনি যখন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক থাকিবেন, তিনিই "জলধরদাদা" হইবেন। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে "জলধরদাদা" হইয়াছেন। আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে'র "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই প্রবন্ধটি ছাপা হইল কেন! যাঁহারা প্রশ্ন করিবেন, তাঁহাদিগকে অরসিক বলিব। বুদ্ধিমান পাঠক লক্ষ্য করিবেন, "জলধরদাদা" ফণীন্দ্রনাথ এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছেন—পাঁচ পাতা "স্পেস" ভরাট করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে 'ভারতবর্ষে'র কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চাকুরিতে তাঁহার আশ্চর্য্য নিষ্ঠার সার্টিফিকেটও দাখিল করিয়াছেন। আমরা তাঁহার তারিফ করিতেছি।

আমরা কিন্তু এই প্রবন্ধেই অনেক আনন্দের খোরাক পাইয়াছি। পাঠককেও ভাগ দিতেছি—

১৩৪৭ সাল। শ্রাবণের আরম্ভ। আকাশে চলেছে নিঃশব্দে মেঘের সমারোহ। সঘন বর্ষণে সমস্ত সহর হয়েছে সজল! বৃষ্টিতে ভিজে একঘেয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দিনগুলি যেন ভারী হয়ে উঠেছে।

এমনি শ্রাবণসঙ্কুল দিনে, শান্তিনিকেতন থেকে আহ্বান এসেছে—একথা 'ভারতবর্ষ'-এর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমায় জানালেন।...

[শান্তিনিকেতনে।] হাত-মুখ ধোওয়ার পর রথীবাবু আমাদের খাওয়াতে বসালেন। আমাদের জন্যে আলাদা খাবার প্রস্তুত করা হয়েছিল। বলতে বাধা নেই, কলকাতা ছাড়ার আগে আমরা প্রচুর পরিমাণে আহার করেছিলাম। কিন্তু তবুও নিমেষে প্লেট শূন্য হল। ফণীদা পরে বিনা দ্বিধায় আরও কয়েকটা রুটি নিয়ে সৎ ব্রাহ্মণের সুনাম রক্ষা করলেন]

পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, কে ইনি, যাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন হইতে আহ্বান আসিয়া থাকে, এবং রথীবাবু যাঁহাদের আলাদা খাবার প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতে বসেন! সাহিত্য, শিল্প, পলিটিক্স, কর্পোরেশন, ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড, পাট, কয়লা, লোহা, কোন বিভাগেই শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনিয়াছি বলিয়া তো মনে হয় না! কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইয়া বুঝিলাম, শোনা উচিত ছি

সাহিত্যেই শোনা উচিত ছিল। "জলধরদাদা" ফণীদাদা কোন বাজে লোককে খাতির করেন না।

* * *

গুরুদেবের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ এবং শীগগিরই চেঞ্জে যাবার কথা হচ্ছে একথা এদের মুখে শুনে দুঃখিত হলাম। কাল দেখা হবে তাঁর সঙ্গে! কি ভাবে দেখব কে জানে। শান্তিনিকেতনে আসা এই আমার প্রথম নয়। কিন্তু যতবারই এসেছি, ততবারই নব নব রঙ ধরেছে হৃদয়ের ধারে-ধারে।

[শান্তিনিকেতন সাবধান! ধারে-ধারের রঙ ভিতরে প্রবেশ করিতে কতক্ষণ!]

রাত্রি গভীরতর হ'তে লাগল···ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম সুকোমল শয্যায়। নিস্তব্ধ রাত্রি।···তারায় তারায় বাণীমুখর হয়ে উঠেছে মূক আকাশ। কোন কলরব কানে আসে না। সমস্ত শান্তিনিকেতন গভীর ঘুমে অচেতন।

[প্রভাত] প্রভাতের প্রধান আকর্ষণ বৈতালিক। শিক্ষার্থীরা যেন কাজের আগে সুমধুর সঙ্গীতে শান্তিনিকেতনকে মুগ্ধ করে। আমরাও বিস্মিত হলাম অপার আনন্দে। এ সঙ্গীত ক্ষণিকের। গান শেষ হ'ল কিন্তু মূর্ছনা মিলিয়ে যেতে চায় না। সে-সুর বাসা বাঁধল আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। গুরুদেবের সুর-সৌন্দর্য সত্যই স্মরণীয়।

গুরুদেবের কি ভাগ্য! সুর লেখকের রন্ধ্রাবাস ছাড়িয়া 'ভারতবর্ষে' বাসা বাঁধিতেছে। 'ভারতবর্ষকে' রন্ধ্র সামলাইতে বলিতেছি।

—

ব্রাহ্ম 'প্রবাসী' ক্রমশ হিন্দু হইতেছেন, ইহাতে স্বস্তিবোধ করিতেছি—হিন্দু থাকিয়া মরিলেও "বিবিধ প্রসঙ্গে" স্থান-সঙ্কুলান হইতে পারে। শ্রাবণের 'প্রবাসী'র ৪৫০ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি—

শ্রেণীটা মধ্যম, কাজেই সকলেই শয়নের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন এবং টীনাবাদাম ও পাঁপর চিবাইবার শব্দ, ময়লা কাপড়চোপড়ের ও বায়ুনিঃসরণজনিত দুর্গন্ধ এবং·····

ছতোম ঘোড়া পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন।

—

বেশি ঘাঁটাঘাঁটিতে মাণিকে ময়লা বসিতেছে, ঝাড়পোঁছ করিয়া কিছুদিন সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলে আবার জলুস দেখা যাইতে পারে। 'পরিচয়ে' "অহিংসা" দেখিতেছি; শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' "উদারচরিতা-নামের বৌ" দেখিলাম। ব্যাকরণের ভুল ধরিব এত বড় বেরসিক আমরা নই। কিন্তু এমন নাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন দিলেন? ইহা কি মাণিকস্তের রসিকতা?

'ভারতবর্ষ' মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামই দেখিয়াছেন, গল্প পড়িয়া দেখেন নাই। দেখিলে ভারতবর্ষীয় অন্তঃপুরের কথা চিন্তা করিতেন। এ অশ্লীলতা অনিবার্য্য নয়। নিতান্ত পাতা ভরাইবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর নিশীথ-শয়নঘরের গোপন সম্পর্ককে প্রকাশ্য দিবালোকে টানিয়া আনিবার মধ্যে দুঃসাহস ও বর্ব্বরতা থাকিতে পারে, কিন্তু শিল্পবুদ্ধির পরিচয় নাই। বউয়ের ননদ কুমারী কৃষ্ণার গর্ভসঞ্চারের গোপন ইঙ্গিতও অনাবশ্যক বোধ হইয়াছে। উদ্ধৃত করিব না, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে এখনও কিঞ্চিৎ আশা পোষণ করিয়া থাকি।

—

শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর 'ভারতবর্ষে'র শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় "মিটমাট" নামক যে নাটিকাটি প্রকাশ করিয়াছেন, অনবধানতাবশত তাহাতে একটি ফুটনোট যোগ করিতে ভুলিয়াছেন। ফুটনোটটি এইরূপ হইবে—"R. K. O. Radio Production কোম্পানির Bachelor Mother চিত্র অবলম্বনে লিখিত।" আমরা যামিনীবাবুর তরফ হইতেই লিখিতেছি।

—

চিত্র বিভাগ

'মডার্ন রিভিয়ু' এবং 'প্রবাসী' শিশু-সাহিত্য হিসাবে রসিক ও শিক্ষিত সমাজে খ্যাতি অথবা শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন নাই। প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিদের পাঠোপযোগী অনেক সারগর্ভ বিষয় থাকে বলিয়াই চিন্তাশীল পাঠকেরা এগুলির গ্রাহক। কিন্তু অধুনা একের পর এক শিশু-শিল্পীদের আবির্ভাবে অনুমান করিতে বাধ্য হইতেছি যে, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় জীবনের চতুর্থ পর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছেন। রসিকতা করিতেছি না। অনুমান সত্য হইলে নিতান্ত বিনীতভাবেই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই ধরনের শিল্পকলা বনাম কুকীর্ত্তির নিদর্শন প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এই সব ছবিতে আর্টের যৎসামান্য গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সমালোচনা সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন উঠে না, কারণ টেক্‌নিকাল দুর্ব্বলতা অগ্রাহ্য করিয়া এবং মনকে যথেষ্ট উদার করিয়াও

সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে কৃতকার্য্য হই নাই। আমাদের অনুরোধ এই, যদি ব্যক্তিগত কারণে এই শিল্প-নিদর্শনগুলিকে বাধ্য হইয়া পত্রস্থ করিতেও হয়, সম্পাদক মহাশয় যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক "শিশু-শিল্প বিভাগ" বা ঐজাতীয় কোনও নিদর্শন দিয়া দেন; অন্যথায় সরল পাঠকের প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় (আগস্ট ১৯৪০) "ফেরি" নামে (শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) একটি বালুকাময় চতুষ্কোণ পদার্থ (রুইতনের আকারে) রঙ দিয়া ছাপানো হইয়াছে।

কারণযুক্ত রঙের নানাপ্রকার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। শিল্পী শিশু না হইলে প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতে পারে। রঙিন চোখে শিল্পী ডাঙার উপর দাঁড় বাহিয়া নৌকা চালাইয়াছেন। নীতির গণ্ডি এবং বাস্তবের সত্য যখন বিধ্বস্ত হইয়াছে, তখন ছবিটি হয় মাতাল, নয় মড়া। যেহেতু মদ্যসম্পৃক্ত কোনও পদার্থ 'প্রবাসী' অথবা 'মডার্ন রিভিয়ু'র ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না, সেই হেতু ধরিয়া লইতেছি, ইহা মৃত। মৃত সাব্যস্ত হইলে পোস্ট মর্টেম (post mortem) পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

ছবিটি আসলে group figure composition, যাহার পূর্ণপ্রকাশ নির্ভর করে ফর্ম এবং রঙের যথাযথ সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া "স্পেস" ভরাটের উপর (filling up of the space)। "স্পেস" ভরাটের কতকগুলি নিয়ম না মানিয়া উপায় নাই, কারণ মুখ্য বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ফর্মে রিদ্‌ম এবং রঙে হারমনি না থাকিলে মুখ্য বস্তু গৌণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। Group compositionএ রঙের প্রতিধ্বনি ও রেখার নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকিলে মুখ্য বিষয় হইতে আকর্ষণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই ধরনের composition দ্বারা ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে শিল্পীর সাধনা শক্তি এবং বহু বিফলতার অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। অনেকের ধারণা ড্রইং করিতে পারিলেই শিল্পী হওয়া চলে—এই ধারণা মানিয়া লইতাম, যদি কেহ শুধু কেবল সুন্দর হরফে ক খ গ ঘ লিখিয়া কবি অথবা সাহিত্যিক হইতেন। লক্ষ্য করিয়াছি, অনেক অবুঝ শিল্পী group compositionএ "স্পেস"

ভরাটের অপরিহার্য্য নিয়মগুলি অপ্রয়োজনীয় detailএর প্রাচুর্য্যে এড়াইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহারা বোঝেন না, সমস্ত ছবিটি দেখিতে হইলে প্রথমেই কি ভাবে "স্পেস" ভরাট হইয়াছে, তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

দর্শক যখন ছবি দেখেন, তখন প্রথমেই সমস্ত ছবির রঙের বিভাগ ও রেখার সামঞ্জস্য তাঁহাকে আকর্ষণ করে—ডিটেলের প্রশ্ন উঠে যখন নাসিকার দ্বারা ছবির ঘ্রাণ লইতে হয়। Miniature ছবিতে অনেক সময় চক্ষুকে নাসিকার কর্ত্তব্য পালন করিতে হয় মানি, কিন্তু আলোচ্য ছবিটি miniatureএর কোঠায় পড়ে না; কারণ miniature ছবির treatment আলাদা। "ফেরি" ছবিটিতে পাশ্চাত্য প্রথায় বাস্তবতামূলক পরিপ্রেক্ষণ ব্যবহারের চেষ্টা স্পষ্ট বিদ্যমান, কিন্তু তাহা বিজ্ঞানসম্মত নয় —যথেচ্ছাচারিতা এবং অজ্ঞতার ফল।

আমাদের পাঠককে বুঝাইবার জন্য আমরা উক্ত রঙিন হাফটোন চিত্রটির একটা একরঙা প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম, নকলের নকলে ছবিটি থাস্তা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কম্পোজিশন বুঝিবার অসুবিধা হইবে না।

এ-পারে কতকগুলি নরনারী পাড়ির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ও বসিয়া আছে—ও-পারেরও একই অবস্থা। প্রশ্ন উঠিবে, দর্শক কোন্ পারের মানুষ দেখিবে—ছবি এ-পারের, না ও-পারের? (তীর চিহ্নিত স্থান দ্রষ্টব্য।)

শিল্পীর দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ণ হওয়ায় ও-পারের মানুষটির কার্য্যকলাপ তিনি দেখিতে পাইতেছেন। লোকটি ছাতা ও পুঁটুলি সামলাইতেছে। পুঁটুলির স্বত্বাধিকারীকে ছোট করিয়া দূরত্ব দেখানো হইয়াছে। এই দূরত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইলে geometrical perspective, aerial perspective অথবা atmosphereএর illusion থাকা দরকার। Geometrical perspective অগ্রাহ্য করিলেও atmosphereকে বাদ দেওয়া চলে না। Atmosphere মানিতে হইলে দূরের বস্তু ঝাপসা দেখায় এবং যেটুকু দেখা যায়, তাহাও প্রায় silhouetteএর আকার ধারণ করে। কিন্তু ছাতাওয়ালা মানুষটি কোন্ স্টাইলের কোর্ত্তা

পরিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি—দর্জী যে ভাল করিয়া সেলাই করে নাই, তাহাও বলিয়া দিতে হয় না, এ-পার হইতেই ধরা পড়ে। একটি ছবি আঁকিতে গিয়া তৎসহিত আর একটি ছোট ছবি ফাও পাওয়া খরিদ্দারের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা আর্ট হয় না।

এখন ছবির "স্পেস" কি ভাবে ভরাট করা হইয়াছে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বৃত্ত, সরলরেখা এবং বিন্দু চিহ্নিত স্থানগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে, চতুষ্কোণ রুইতন এবং বৃক্ষস্থিত ত্রিভুজের কোণ কি ভাবে মনুষ্যপূর্ণ বৃত্তটির উপর খাড়াইভাবে ঝুলিতেছে। বৃত্তটি চক্রাকারে আপনার গঠনের মধ্যেই শেষ হইয়াছে (ছেদ নাই); কিন্তু সরলরেখা কোণ সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত থামিতে পারে নাই। অথচ এই ভাবে সরল ও বক্র রেখার অস্তিত্ব compositionএ কোন উদ্দেশ্য পূরণ করিতেছে না—অজ্ঞতার দরুন accidentally আসিয়া পড়িয়াছে।

উদ্দেশ্যহীন রেখা অথবা রঙ যে কোন compositionএ দৃষ্টিকটু। কেন যে দৃষ্টিকটু তাহার যথার্থ কারণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই—যেমন ভগবানকে বিশ্বাস করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট হেতু নাই এবং থাকিলেও ভিন্নমতাবলম্বী তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লয় না। কিন্তু ভগবানকে যে বিশ্বাস করে, তাহার নিকট তাঁহার অস্তিত্ব অকাট্য সত্য। সুরের যত বড়ই তাল হউক, তাহার মাত্রা বুঝানো যায়, কিন্তু লয় হৃদয়ের উপলব্ধির বস্তু। ভোজ্য সুখাদ্য হইলে পাচক বলিতে পারে, কি কি মসলা ব্যবহারে, লবণাক্ত, তিক্ত, মিষ্ট ইত্যাদি স্বাদ আসিয়াছে; কিন্তু ভক্ষণের পর কোন্ জাতীয় তৃপ্তি হইল, তাহা বলিতে পারে না।

আনাড়ীর লেখার সাহিত্যে যখন স্থান নাই এবং সেই কারণে যখন তাহার প্রচারের আপত্তি থাকে, তখন ছবি সম্বন্ধেও তাহার নিজস্ব গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়া প্রচার সম্বন্ধে কঠোর হওয়া উচিত। চিত্রকলাকে 'মডার্ন রিভিয়ু'-সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বলিয়া মানেন এবং এদিক দিয়া তিনিই যে প্রথম পথপ্রদর্শক, একথা তাঁহাকে স্মরণ করিতে বলি।

শার্দ্দূল

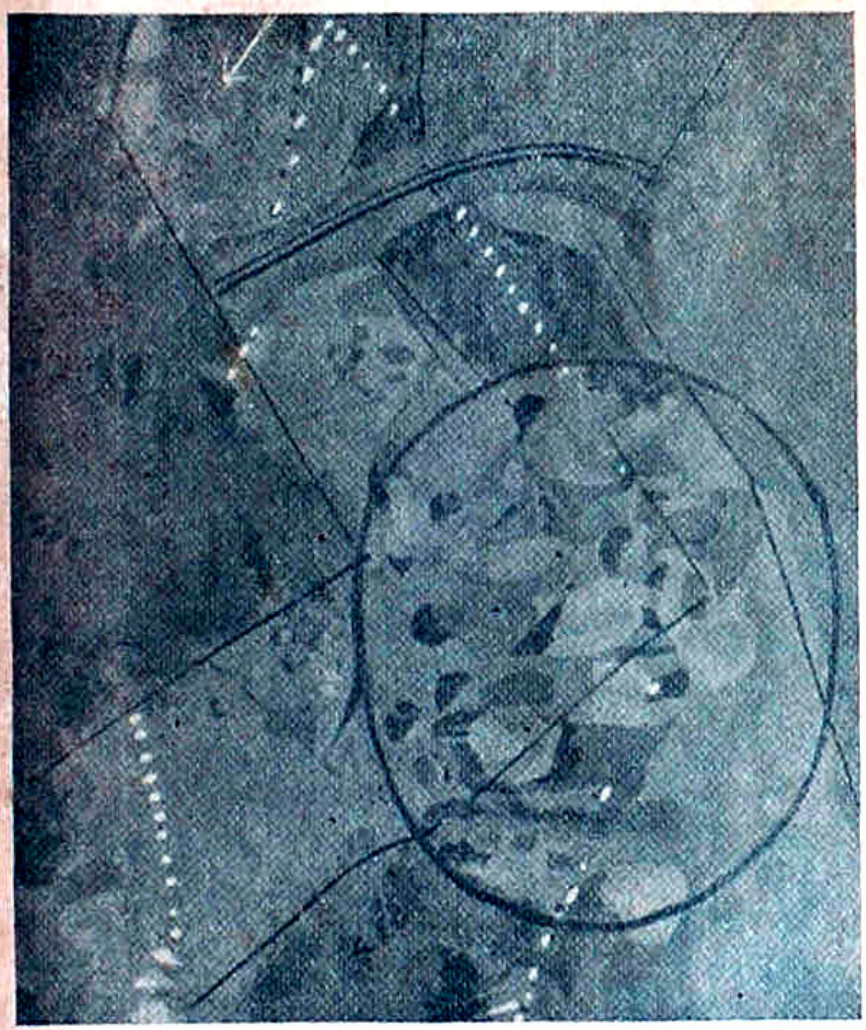

পুস্তক-পরিচয়

কাব্য

রবীন্দ্র-রচনাবলী—চতুর্থ খণ্ড। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা। মূল্য বিভিন্ন কাগজ ও বাঁধাই অনুযায়ী ৪॥০, ৫॥০, ৬৲, ১০৲।

বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ যেরূপ তৎপরতার সহিত রচনাবলীর খণ্ডগুলি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ভরসা হয়, রবীন্দ্রনাথ এই সুবৃহৎ গ্রন্থাবলীর ত্রিশ খণ্ডই স্বয়ং সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিবেন। তাঁহার পুরাতন লেখাগুলি সম্বন্ধে নূতন কৈফিয়ৎ এই রচনাবলীতে যোজিত হওয়াতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকদের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন চিত্রও আমরা রচনাবলীর দৌলতে প্রাপ্ত হইতেছি। চতুর্থ খণ্ডে কবিতা ও গান বিভাগে 'নদী' ও 'চিত্রা'; নাটক ও প্রহসন বিভাগে 'বিদায়-অভিশাপ', 'মালিনী' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা'; উপন্যাস বিভাগে 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' এবং প্রবন্ধ বিভাগে 'ভারতবর্ষ' ও 'চারিত্রপূজা' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত "গ্রন্থ-পরিচয়"টি মূল্যবান।

কুমারসম্ভব—কাব্যানুবাদ, শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল ১২৭ পৃষ্ঠা, অনুবাদ ২৪০ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা ৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০।

মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের অনেকগুলি অনুবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সকলগুলিতেই অনুবাদের আড়ষ্টতা বিদ্যমান। প্রবোধেন্দুবাবুর অনুবাদ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কাব্যের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। 'কাদম্বরী'র অনুবাদে তিনি দেশব্যাপী যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এই কাব্যানুবাদটিতে তাঁহার সে খ্যাতি বিস্তৃত হইবে। কালিদাসের এই বাংলা রূপ যে সম্ভব, এই অনুবাদ পাঠে পাঠক সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। প্রত্যেক সর্গের শেষে মূল সন্নিবিষ্ট হওয়াতে পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত রঙিন ও একরঙা চিত্রগুলি গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মলাটটি চমৎকার।

অঙ্গারপর্ণী—হাল্‌কা কাব্য। "বনফুল" প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। ১১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০।

'শনিবারের চিঠি'র পাঠকের কাছে "বনফুলে"র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার 'বনফুলের কবিতা' যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পড়িয়া আনন্দ পাইয়া

থাকেন, এই বইখানিও তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে। 'অঙ্গারপর্ণী' রূপ ও রসের দিক দিয়া 'বনফুলের কবিতা'র দ্বিতীয় খণ্ড। কাব্যে এমন লঘু হালকা হাসির কারবার বাংলা সাহিত্যে বেশি নাই। কিন্তু উপরে হাসি-হাসি ঠেকিলেও ভিতরে যে জ্বালা ও অশ্রু লুক্কায়িত আছে, সহৃদয় পাঠককে তাহা নাড়া দিবেই। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য কবিতাগুলি হালকা হইয়াও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দাবি করিবে। আবৃত্তির পক্ষে অনেকগুলি কবিতা বিশেষ উপযোগী।

কপোত-কপোতী—অনুরাধা দেবী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ৪০ পৃষ্ঠা, ১৲।

এই কাব্যটিকে আমরা দাম্পত্য বা অন্তঃপুর কাব্য আখ্যা দিতে পারি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরও উদগ্র হইয়া উঠে, এক্ষেত্রেও হইয়াছে। কপোত-কপোতীর শ্রুতিমধুর বক্‌বকমের সঙ্গে দৈহিক লীলাবিলাসও আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। অবসন্ন দ্বিপ্রহরে মন্দ লাগে না।

গল্প-উপন্যাস

কালিন্দী—উপন্যাস। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলিকাতা। মূল্য ৩৲।

ছোটগল্পে বিশ্রুতকীর্ত্তি তারাশঙ্কর যে ধীরে ধীরে উপন্যাস-রাজ্যেও অধিকার বিস্তার করিতেছেন, 'ধাত্রীদেবতা'র পরে 'কালিন্দী'র প্রকাশেই তাহা স্পষ্ট হইতেছে। রোমান্টিক উপাদানকে বর্জ্জন না করিয়াও যে আধুনিক উপন্যাস রচনা করা যায়, 'কালিন্দী' তাহার প্রমাণ। একই গ্রামের পরিবেশের মধ্যে রায় বংশ এবং চক্রবর্ত্তী বংশের ইতিহাস ও দ্বন্দ্ব এবং অহীন্দ্র ও উমার বিবাহে সে দ্বন্দ্বের সমাপ্তি—এই সূক্ষ্ম চুম্বকের উপর যে বৃহৎ কাহিনী তারাশঙ্কর রচনা করিয়াছেন, তাহাকে বাংলা সাহিত্যে অভিনব বলিতে পারি। কালিন্দী নদীর বুকে সদ্যজাগা চরের ক্রমবর্দ্ধমান সমৃদ্ধির সহিত তাল রাখিয়া গল্প অগ্রসর হইয়াছে। এই গল্পের এক দিকে দিবালোক-ভীত রামেশ্বর এবং অন্য দিকে দিবালোক-দগ্ধ সাঁওতাল কন্যা সারী—এই দুইয়ের মাঝখানে অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র। দক্ষ নাবিকের মত তারাশঙ্কর সকল চরিত্রকে লইয়াই সাফল্যের পারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মৃগয়া—উপন্যাস। 'বনফুল' প্রণীত। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

গ্রামের জমিদার শিকারে যাইবেন সপরিবারে, গ্রামসুদ্ধ লোক উৎসাহিত হইয়াছে। জমিদারেরা তিন ভাই, তাঁহাদের তিন স্ত্রী, একজনের কন্যা-জামাতা, কন্যার একজন সখী, বৃদ্ধা মাতা—প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এবং আয়োজন বিভিন্ন। কর্ম্মচারী ও রবাহূতের দলও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতলব লইয়া চলিয়াছে। "বনফুল" অপূর্ব্ব কৌশলে এই সকলকে উদ্দেশ্য এবং আয়োজন সমেত একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যাপারে যে চিরন্তন রসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে নাই। প্রসন্ন হাসি ও শাণিত ব্যঙ্গের মধ্যে যে কাব্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে। ইহাকে যুগান্তকারী উপন্যাস বলিতে পারি।

আদর্শ হিন্দু-হোটেল—উপন্যাস। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

স্রষ্টা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের রসিকদের জন্য অনেক কিছুই সৃষ্টি করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবারে তিনি রাণাঘাটের রেল-বাজারের বেচু চক্কত্তির হোটেলকে স্থায়ী আসন দিলেন। সক্ষমের হাতে পড়িলে অতি অকিঞ্চিৎকরও কিরূপ মহিমান্বিত হইতে পারে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। যাঁহারা বলেন, বাংলা দেশের আবহাওয়ার মধ্যে নভেলের উপাদান নাই, তাঁহারা 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল' পড়িবেন।

মনোরমা—গল্পের বই। শ্রীঅমলা দেবী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

আধুনিক কালের মধ্যে কোনও সাহিত্যিক ঘটনা যদি বিশেষ চমক লাগাইয়া থাকে, তাহা এই অমলা দেবীর আবির্ভাব। তাঁহাকে লইয়া অনেক জল্পনা-কল্পনা আমাদের কানে পৌঁছিয়াছে; ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, তিনি নাড়া দিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রকাশিত "ন্যাড়া" "মনোরমা" প্রভৃতি গল্প বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় আসন দাবি করিবে। এমন শোণিতরাঙা স্যাটায়ার এখন পর্য্যন্ত কোনও বঙ্গমহিলার লেখনী হইতে বাহির হয় নাই।

পৃথিবী কা'দের—গল্পের বই। শ্রীমনোজ বসু। বিশ্বনাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

যাঁহারা মনোজবাবুর 'বনমর্ম্মর', 'দেবী কিশোরী' ও 'নরবাঁধ' পড়িয়াছেন, এই গল্প-সংগ্রহটি পড়িলে তাঁহারা বিস্মিত হইবেন। মনোজবাবুর রোমান্স-মধুর লেখনী এখানে তত্ত্ব-কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। 'পৃথিবী কা'দের' নামের মধ্যেই তাঁহার তত্ত্বটি নিহিত আছে। চাঁদের আলোর গল্প-লেখক মাটির পৃথিবীর গল্প লিখিতে বসিয়া ভগবানের দরবারে নালিশ জানাইয়াছেন। তাঁহার চোখে এবারে জল নাই; অভিমানে চোখ ফাটিয়া রক্ত ঝরিয়াছে।

জল আর আগুন—গল্পের বই। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

একবার 'আনন্দবাজার' পূজা সংখ্যায় আশাপূর্ণা দেবীর "রাজুর মা" গল্পটি পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পরে তাঁহার লেখা গল্প সন্ধান করিয়া পড়িয়াছি। আমাদের ঘরোয়া জীবনের এমন সহজ প্রসন্ন প্রকাশ অন্যত্র কদাচিৎ দেখিয়াছি। এই সংগ্রহে আমাদের ভাল লাগা গল্পগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। আশাপূর্ণা দেবীর কাছে আমরা আরও অনেক আশা করিতেছি।

বিষকন্যা—গল্পের বই। শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

এ যুগে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান্সের রাজা। 'জাতিস্মর' একবার তাহা প্রমাণ করিয়াছে—'বিষকন্যা'য় তাঁহার কীর্ত্তি স্থায়ী হইল। প্রাচীনকালের যথাযথ আবহাওয়া সৃষ্টিতে শরদিন্দুবাবু অদ্বিতীয়। "চন্দন-মূর্ত্তি" ও "সেতু" গল্প দুইটি আধুনিক কালের হইলেও অতিশয় রোমান্টিক। মোটের উপর, যে যুগকে আমরা ছাড়াইয়া আসিয়াছি মনে করিয়া দুঃখ অনুভব করি, শরদিন্দু-বাবুর লেখনীগুণে সেই যুগকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা যেন ফিরিয়া পাইলাম। বড় ভাল লাগিল।

অকৃতজ্ঞ পৃথিবী—গল্পের বই। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদয়াচল কার্য্যালয়, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

নবীন লেখকের এই গল্পগুলি পড়িয়া খুশি হইলাম। গল্প বলার ওস্তাদিভঙ্গি তিনি আয়ত্ত করিয়াছেন। গল্পগুলি অনুভূতির রঙে রঙিন।

অবশ্যম্ভাবী—উপন্যাস। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। কাত্যায়নী বুক স্টল, কলিকাতা। মূল্য ২॥০।

আধুনিক কালে বাংলা উপন্যাসের নানা বিচিত্র প্রকাশ দেখিতেছি; বৈচিত্র্যের মধ্যে সমৃদ্ধি আসিতেছে। ইহা সুলক্ষণ। 'অবশ্যম্ভাবী' উপন্যাসে পশুপতিবাবু যে নূতন ভঙ্গির অবতারণা করিলেন, তাহার জন্য তিনি খ্যাতিলাভ করিবেন। এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় নায়ক গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন, লেখক এই যাত্রার সঙ্গী। নায়ক পথ চলিয়াছেন, লেখক ছায়াছবি তুলিয়া চলিয়াছেন। ঘটনা কোথাও জমাট বাঁধিতেছে না, বন্ধন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গ্রন্থী খুলিয়া যাইতেছে। এই গ্রন্থী বন্ধন ও মোচনের মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসই এই উপন্যাস। ইহা একটি মানবজীবনের কাব্যও। কাহিনীর পরিণতি অবশ্যম্ভাবী এবং চমৎকার। উপন্যাসটি সার্থক।

রাণুর তৃতীয় ভাগ—গল্পের বই। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য ২৲।

প্রথম দ্বিতীয় ভাগের "রাণু" বাংলা গল্প-সাহিত্যে অমর হইয়াছে, তৃতীয় ভাগেও সে বাংলা দেশের পাঠকের স্কন্ধে আরও খানিকটা কৃতজ্ঞতার বোঝা চাপাইল। বিভূতিবাবুর মধুর রসের একচেটিয়া কারবার; ফেনপুঞ্জের মত শুভ্র নির্ম্মল হাসির অন্তরালেও তাঁহার জীবন-প্রবাহের গভীরতা স্পষ্ট। হাসিতে হাসিতে চক্ষু অশ্রুবাষ্পাকুল হইয়া উঠে। বিভূতিবাবুর লেখনী অক্ষয় হউক।

—০—

কাব্য এবং গল্প উপন্যাস পর্য্যন্ত আসিয়া স্থানাভাব ঘটিল, অর্থাৎ প্রবন্ধাদি বিবিধ জাতীয় পুস্তকগুলির পরিচয় এবারে দেওয়া গেল না। লেখক ও প্রকাশকদের নিকট ক্ষমা চাহিয়া এবং কার্ত্তিক সংখ্যায় কাহারও ক্ষোভ রাখিব না—এই প্রতিশ্রুতি দিয়া এবারে শেষ করিতেছি। কোনও পুস্তক যদি গাদার মধ্যে পড়িয়া আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে গিয়া থাকে, তাহার জন্য আমরা দায়ী নই। যে কেহ পত্রযোগে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলে আমরা ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত আছি।

বর্ষশেষে নিবেদন

এই সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র দ্বাদশ বর্ষ শেষ হইল। কার্ত্তিক সংখ্যা ৯ই আশ্বিন (ইংরেজী ২৫এ সেপ্টেম্বর) নাগাদ বাহির হইবে। এই আশ্বিন সংখ্যায় যাঁহাদের চাঁদা শেষ হইল, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সডাক বার্ষিক মূল্য ৩।০ অথবা ষাণ্মাসিক মূল্য ১৷৵০ কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইবার পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা টাকা পাঠাইবেন না, তাঁহাদের নামে কার্ত্তিক সংখ্যা এক বৎসরের চাঁদার দাবিতে ভি. পি.তে প্রেরিত হইবে। ভি. পি.র দরুন গ্রাহকগণের অতিরিক্ত ৶০ খরচ পড়িবে। যাঁহারা আগামী বৎসর গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা দয়া করিয়া পূর্ব্বাহ্নে জানাইলে বাধিত হইব। নচেৎ ভি. পি. ফেরত হইলে আমাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কার্ত্তিক সংখ্যা বাহির হইবার সময় যদি কেহ অন্যত্র চলিয়া যান, তাঁহার নূতন ঠিকানা আমাদের জানাইলে আমরা সেইখানেই পত্রিকা পাঠাইতে পারিব। ব্রহ্মদেশবাসী গ্রাহকগণ দয়া করিয়া ৩৷৵০ মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইবেন। ভি. পি.তে পাঠাইলে ৩৷৶০ পড়িবে।

ডোয়ার্কিনের সঙ্গীতযন্ত্র

"উৎকৃষ্টতর মালমসলা" ও "উন্নততর প্রস্তুতপ্রণালী" ইহার দরুণই ডোয়ার্কিনের যন্ত্রের এত সুনাম ও আধিপত্য। অপর যন্ত্রের সহিত ইহাদের তুলনা হয় না। গুণ ও স্থায়িত্ব বিবেচনা করিলে দামও এমন কিছু বেশী নয়।

Sonora Harmonium, ডবল প্যারিস রীড, ৩ অক্টেভ, ৫ স্টপ, বাক্স সহ মূল্য ৪০৲, প্যাকিং কুলী ॥০।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

Dwarkin & Son Ltd

11, Esplanade,
Calcutta.

শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত